মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—১ বৈশাখ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ
২৪ চৈত্র, ১৮৭৯ শকাব্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৪

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা
বিনয় সরকার

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

—এক—

বৃষ্টি, বৃষ্টি। মেঘ উঠেছিল অপরাহ্ণবেলা। বৈশাখ মাস পার হয়ে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি—এতদিনে কালবৈশাখী নামল বুঝি। কালও মেঘ করেছিল, একটু বাতাস উঠে মেঘ উড়িয়ে দিল। আজকে পুরাদস্তুর ঝড়। ঝড় থেমে গেল, তবু আকাশ থমথমে হয়ে রইল মেঘে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। ছাতা আনে নি ইরা, নেইও। ছাতা কেনার সময় আসে নি এখনো। কে জানত এমন অবস্থা হবে। তবে তো পড়ানো সেরে সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ত। বেরিয়েও থাকে অন্যদিন। আজকে শোভা ঘরে ডাকল। তার কয়েকটি বান্ধবী এসেছে, তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ও গল্পগুজব হল অনেকক্ষণ ধরে। ও বাড়ির গল্প মানেই রাজনীতি। ঝি-চাকর অবধি জওহরলালের ভুল বের করে, আইসেনহাওয়ারের গুহ্য মতলব জলের মতন বলে যায়। বাড়ির ইট-কাঠ টেবিল-চেয়াররা কথা বলতে পারে না, নইলে তারাও বলত; শুনে শুনে অনেক শিখেছে। শোভার বাপ প্রতুল দত্ত ঘরের খেয়ে চিরকাল বনের মোষ তাড়িয়ে এসেছেন, ভারত স্বাধীন হবার পর, দেখা যায়, সেই মোষ তাড়ানোর বিলক্ষণ মুনাফা। বাড়িসুদ্ধ এখন রাজনীতিতে পেয়ে বসেছে।

কিন্তু ইরার গল্প তার বাপকে নিয়ে। ঘুরেফিরে কেবলই বাপের কথা নিয়ে আসে। আজকে ভারি এক খবর—বেরিয়ে আসছে, সেই সময় 'যুগচক্র' কাগজটা পেল। ট্রামে উঠে তারপর মোড়ক খুলল। বাবার সম্বর্ধনা হচ্ছে—

কিন্তু কি আশ্চর্য, বিশ্বেশ্বর সরকারের নাম এ বাড়ির এরা এই প্রথম শুনল। শোভা হেন মানুষ—রাজনীতি করুক যাই করুক, বছরের পর বছর একটা করে পাশ তো করে যাচ্ছে নিয়মমতো, সেই শোভাও।

'ভারতে ইংরাজ' বইয়ের বাবদে এই সম্বর্ধনা, সে বই চোখেই দেখে নি। দু-একজনে একটু হাঁ-হাঁ করল বটে, কিন্তু সে সব মন-রাখা কথা, আন্দাজি ঢিল ফেলার রকম দেখে বোঝা যায়। ইরা তখন কাগজখানা মেলে ধরল জাঁক করে—বিশ্বেশ্বরের এতকালের সাধনার পুরস্কার দেবার জন্য, দেখ দেখ, দেশের গণ্যমান্যেরা তাঁর জন্মদিনে মিলিত হচ্ছেন। যুগচক্রের প্রায় প্রতি সংখ্যায় বিশ্বেশ্বরের লেখা থাকে, এবারও আছে—তারই নিচে ফলাও করে খবরটা ছেপেছে। কাগজটা তখন হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। সগর্বে ইরা চেয়ে থাকে, পড়ো না খানিকটা—পড়ে বাবার ক্ষমতাটা বোঝ। এ পোড়া দেশের মানুষ নিতান্ত সহজে গুণীর মর্যাদা দিতে আসে না।

আকাশ ওদিকে মেঘের ভরা সাজাচ্ছে, কিন্তু বয়ে গেছে ইরাবতীর ঐ সব তুচ্ছ ব্যাপারে নজর দিতে। তার বাবা কত বড়, এতদিনে মানুষ চিনতে পেরেছে। দেরি হয় হোক না—আজ তা হলে এখন বাড়ি নয়, সোজা লাইব্রেরি যাবে এখান থেকে। গিয়ে বলবে, বাবা গো, সাধক মানুষ তুমি—খবরাখবর রাখো না—তোমার 'ভারতে ইংরাজ' নিয়ে দেশের লোক ধন্য-ধন্য করছে। এই এক জিনিস দেখা গেল—কাগজে কাগজে যতই লিখে যাও, বই হয়ে না বেরুলে পাঠক-কানাদের নজরে ধরে না। নিন্দেমন্দ শুনে তো বিশ্বেশ্বর হাসেন, উল্টে উপহাস করেন নিন্দুকদের—প্রশংসায় আজ কি করবেন কে জানে? প্রশংসা কে-ই বা কবে করল তাঁকে, এক ঐ যুগচক্রের স্বার্থপর সম্পাদক কৃতান্ত বিশ্বাস ছাড়া?

বৃষ্টি জোরে এসে গেল। ফাঁকা এদিকটা। লড়াইয়ের সময় মিলিটারির দখলে ছিল, এখন নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। চড়চড় করে বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু হল। জোরে—আরো জোরে পা চালাও ইরাবতী। দৌড়ও না, কে দেখছে…তা কি হয়েছে যে সোমত্ত মেয়ে দৌড়চ্ছে? নয় তো স্নান হয়ে যাবে একেবারে। দাও ছুট—ছোট্ট বয়সে চোর-পুলিশ খেল নি?

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এলো। আশ্রয় মিলল অবশেষে। মোজেয়িকের থামওয়ালা মস্ত বড় বাড়ি—উপর-নিচে সব ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ, কেমন যেন ছাড়া-বাড়ি বলে মনে হয়। সেই বাড়ির কার্নিশের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। বিষম ঝাতাস। কাপড় আঁটোসাঁটো করে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে, তবু ছাট আসছে।

শীত ধরে গেছে, কাঁপছে ইরা হি-হি করে। বৃষ্টি থামবার লক্ষণ নেই। কি করে এই অবস্থায়—মরীয়া হয়ে দিল দরজায় ঘা। মানুষ তো বটে—গৃহস্থ মানুষ, বাঘ-ভালুক নয়—সঙ্কোচের অতএব মানে হয় না। এতক্ষণ ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে এমনভাবে ভিজবার কারণ ছিল না কিছু।

একজন কেউ কি নেই এত বড় বাড়িতে? অন্তত বাড়ি-পাহারার খাতিরে? কলিং-বেল টেপে। বাজছেও ভিতরে মনে হয়। মুখে ডাকাডাকি করছে, দরজা খুলুন—দরজা খুলুন। শুনছেন, কে আছেন ঘরের ভিতরে?

সাড়াশব্দ নেই। বৃষ্টির জোর আরও বেড়েছে। ভিজে জবজবে হয়ে গেছে ইরা একেবারে। ঐ প্রান্তের একটা জানলায় শুধুমাত্র কাচের শার্সি-আঁটা। ভিজে ভিজে সেই অবধি গিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে দেখে। হ্যাঁ, মানুষ বলেই মনে হয়। ইজিচেয়ারের উপর চাদর মুড়ি দেওয়া—মানুষই তো। কিন্তু বেঁচে আছে তো মানুষটা? যা চেঁচানিটা চেঁচিয়েছে, মরা মানুষেরও নড়ে উঠবার কথা।

জলের ছাট তীরের ফলার মতো গায়ে বিঁধছে। দু'হাতে ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়, দরজা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ভেঙে পড়বার দাখিল।

এতক্ষণে ভিতরের মানুষটার সাড় হল। কে?—বলে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে দরজা খুলে দিতে দড়াম করে কবাট দু-দিকের দেয়ালে আঘাত খেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন বাতাসেরই ঝাপটায় ইরাবতী ছিটকে পড়ল ঘরের ভিতরে।

খিল আঁটুন, শিগগির—আঃ, কি করছেন? ঘর ভেসে গেল যে জলে!

আধ-অন্ধকার ঘর, আর এক জোয়ান-যুবা ছেলে। খিল আঁটে ইরা কেমন করে? অন্তত একটা আলো থাকলেও যা হোক হত। ছেলেটা বুঝল। তার ইজিচেয়ারের নাগালের মধ্যে টেবিল-ল্যাম্প—বোতাম টিপে সে আলো জ্বেলে দিল।

আলোয় অবস্থা দেখে শিউরে ওঠে: ইস, এত ভিজে গেছেন!

ইরা উড়িয়ে দিয়ে চায়: না—বেশি আর কি!

একেবারে নেয়ে উঠেছেন, আর বলছেন বেশি নয়?

ইরাবতী কিছু উষ্ণ হয়ে বলে, কি করা যাবে? কতক্ষণ ধরে ডাকছি। কাছাকাছি আর ঘরবাড়ি নেই—থাকলে তো সেখানে যেতে পারতাম।

ছোকরা অপ্রতিভ হয়েছে। আমতা-আমতা করে বলে, বাড়িতে কেউ নেই কিনা—শুধু আমি আছি হরিহরকে সম্বল করে। এই আসছি—বলে সে হতভাগা বেরিয়ে পড়ল। বন্ধের পরেই আমার একটা একজামিন, তাই তদগত হয়ে পড়াশুনো করছিলাম।

হাসিতে ফেটে পড়ে বুঝি ইরাবতী! অনেক কষ্টে সামলে নিল। পড়ছিলে তদগত হয়েই বটে! চাদরের আরামে সর্বদেহ আবৃত করে বৃষ্টির সন্ধ্যায় আলো নিভিয়ে দিয়ে পড়া। ইতিহাসের এক মোটা

বই খোলা ইজিচেয়ারের হাতার উপর। তার পাশে আধপোড়া চুরুট। সমারোহে অতএব ইতিহাস পড়া হচ্ছিল। বাবা কৈফিয়ত দিয়ে বলেন না—ইতিহাসে এমনি নিষ্ঠা বলেই এত বিদগ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিতের সমারোহ!

ছোকরা বলে, জলে-কাদায় কী অবস্থা হয়েছে আপনার! দাঁড়ান।

দুমদুম করে দোতলায় উঠে গেল। একটু পরে ফিরে এলো হাতে একটা ধুতি নিয়ে।

ধুতি ছাড়া পাওয়া গেল না। মা-বাবা দেশে গেছেন, মায়ের শাড়ি-টাড়ি হয় সেই অবধি বয়ে নিয়ে গেছেন, নয় তো আলমারিতে বন্ধ। একটাও খুঁজে পেলাম না। হরিহর থাকলে হয় তো কোন হদিস হত।

আগুন হয়ে বলল, সেই চারটের সময় এক বোতল কেরোসিন কিনতে বেরিয়েছে। এক পহর রাত হতে চলল, দেখুন দিকি, এখনো সে কেরোসিন কিনে বেড়াচ্ছে।

ইরা বলে, বৃষ্টিতে আটকে গেছে।

বৃষ্টির ছুতোয় আড্ডা জমিয়েছে কোথায়। সে যাক গে। মোটে না আসে, তাতেও ডরাই নে। মা'কে তাই বলেছিলাম—সবসুদ্ধ চললে, এটাকেই বা ফেলে যাচ্ছ কেন? কাউকে দরকার নেই। এগজামিনের পড়া যতই থাক, তার ফাঁকে ফাঁকে চালিয়ে নেবো।

সুইচ টিপে দালানের আলো জেলে দিয়ে বলে, বাড়িতে কেউ নেই—সোজা চলে যান ঐদিকে। কাদাটাদা ধুয়ে কাপড়টা ছেড়ে এসে বসুন। বৃষ্টি কখন থামবে কে জানে?

শাড়ির বা দশা, না বদলে উপায় নেই সত্যি। হাত-পাগুলোও ধোওয়ার দরকার। এই মূর্তিতে বাইরের মানুষটার সামনে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, সেই তো এক মহা লজ্জার ব্যাপার।

ফিরে এলো ফিনফিনে নরুন-পাড় ধুতি পরনে। তাতেই অপরূপ দেখাচ্ছে। বৃষ্টিস্নাত যুঁইফুলটি। জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। জল গড়াচ্ছে শার্সির গা বেয়ে। রাস্তা ভেসে গেছে, জলের আবর্ত ছুটেছে নর্দমার দিকে। থামবার লক্ষণ নেই।

ইরা বলে, একটা ছাতা-টাতা পেলে চলে যেতাম।

ছাতা না হয় পেলেন। কিন্তু এত বৃষ্টি ছাতায় মানবে না, আবার ভিজে যাবেন।

ইরা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, রাত হয়ে যাচ্ছে। লাইব্রেরি থেকে বাবাকে বাড়ি নিয়ে যাব, আমার জন্য বসে রয়েছেন।

ব্যাপার ঠিক তা নয়। বাড়ির কথা হুঁশ থাকে বড় বিশ্বেশ্বরের। ইরাই ডাকাতের মতো গিয়ে পড়ে। গিয়ে হুঙ্কার দেয়, চলো বাবা—। সামনের খোলা বই বন্ধ করে দেয়, খাতাপত্র তুলে ফেলে ব্যাগে। বিশ্বেশ্বর হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, রাগ করতে গিয়ে সামলে যান মেয়ের দিকে চেয়ে। ওরে বাবা, ওর সঙ্গে রাগে পারবে কে ত্রিভুবনের ভিতর? সাক্ষাৎ মনসা ঠাকরুন···

যাও লাইব্রেরিতে, দেখে এসো সেই সাধক মানুষটিকে। চেহারাতেও অবিকল তাই—পাকা দাড়ি, লম্বা লম্বা চুল, ছবিতে দেখা নৈমিষারণ্যের মুনিঋষিদের মতন। বাদলায় ইরাবতী গিয়ে পৌঁছতে পারে নি, ভারি মজা জমেছে আজকে তাঁর। মনের সাধে খেটে যাচ্ছেন স্তূপীকৃত বই চারিদিকে—এটা খুঁজছেন ওটা খুঁজছেন, ভাবছেন কপাল কুঞ্চিত করে। সহসা উদ্দিষ্ট কিছু পেয়ে লিখতে শুরু করে দিলেন। ছুটল কলম—পাতার পর পাতা শেষ করে চলেছেন, সবটুকু লিখে ফেলে তবে সোয়াস্তি। পুঁথিপত্রের অরণ্যে দিনরাত্রি খুঁজে খুঁজে বেড়ান হীরা-মানিকের টুকরো। টুকরো সাজিয়ে মাল্য-রচনা। তার মধ্যে

একটি বিচিত্র মাল্য শেষ করে—কি উপমা দেওয়া যায় ?—সেই মাল্য বঙ্গবাণীর কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছেন ; নাম হল তার 'জায়তে ইংরাজ'। শেষ করে তবু তৃপ্তি নেই—আরও খুঁজছেন, নতুন নতুন বস্তু জুড়ে-গেঁথে পুরানোর রদবদল করে আরও কি বাহার বাড়ানো যায়।

বাপের কথায় ইরাবতীর ঠোঁটের কোণে মধুর হাসি ফুটে ওঠে। এক বাৎসল্যের ভাব। বলে, আমার বাবা ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন। ইতিহাসে এম. এ. দিচ্ছেন তো অরুণাক্ষবাবু—আপনি নিশ্চয় তাঁকে জানবেন।

অরুণাক্ষ আশ্চর্য হয়ে বলে, নাম কি করে টের পেলেন আমার ?

ইরা মুখ টিপে হাসল।

ও, বইয়ে লেখা আছে নাম। ইতিহাসের ছাত্র—তা-ও টের পেয়েছেন বই থেকে। আমার পরিচয় তবে তো সবই আপনার জানা। বাবার নামও হয়তো জেনে এসেছেন ফটকের নেম-প্লেট থেকে।

ইরা হেসে বলে, নাম বললে আমার বাবাকেও জানবেন। পলাশির যুদ্ধ থেকে স্বাধীন-ভারত—এই দু-শ বছর নিয়ে রিসার্চ করছেন। মাস চারেক হল এক ভল্যুম বই বেরিয়েছে।

বটে। কি নাম বলুন তো আপনার বাবার ?

বিশ্বেশ্বর সরকার—জানেন ?

অরুণাক্ষ লাফিয়ে ওঠে : জানি বই কি—খুব জানি। থেমে একটু ঢোক গিলে নিয়ে আবার ফলাও করে বলে, মস্ত বড় পণ্ডিত—তাঁকে না জানে কে ? আমি তাঁর পরম ভক্ত।

মেয়েটা খুশি হয়েছে, মুখ-ভরা হাসি দেখে বুঝতে দেরি হয় না।

বাবার লেখাও অনেক বেরোয় কাগজে কাগজে। যুগচক্রের প্রায় প্রতি সংখ্যায় বাবার লেখা থাকে।

অরুণের মুখ কালো হয়ে যায় সহসা। বলে, যুগচক্র কাগজ, সম্পাদক অত্যন্ত পাজি—ও কাগজ আমরা ছুঁই না। 'যুগ' হলেও ওঁর লেখা বিস্তর পড়েছি। অনেক জিনিস মুখস্থও বোধ হয় বলতে পারি। বিশেষ করে ইতিহাসের ছাত্র যারা—ওঁর লেখা তাদের নখদর্পণে রাখতে হয়।

বিস্তর বলা হয়েছে—মুখস্থর কথা অবধি। মুখস্থ ধরতে না বসে আবার। ব্যস্ত হয়ে অরুণ উঠে দাঁড়াল।

বৃষ্টি না ধরলে যেতে পারছেন না, ভাল হয়ে বসুন। আমি চা করে আনি।

না, না—চায়ের দরকার নেই।

শীতে কাঁপছেন আপনি। নিশ্চয় দরকার। এক্ষুণি আসছি।

হেসে উঠে আবার বলে, সমস্ত পারি আমি। হরিহরকে নিয়ে আছি, বুঝতে পারছেন না, পারতে হয় সমস্ত। হীটার আছে, দশ-মিনিটের বেশি লাগবে না। আপনি বসে বসে কাগজটা ততক্ষণ দেখুন।

বলতে বলতে সরে পড়ল। সরে গিয়ে বাঁচল। খানিক পরে চা করে এনেছে কেটলি ভরে। টেবিলের বই নামিয়ে দিয়ে সামনা-সামনি বসল। একটা কাপে আগে ঢেলে ইরার দিকে এগিয়ে দিল। মুখে না তুলতেই প্রশ্ন : কেমন হয়েছে বলুন—

ভাল।

দেখুন তবে, রান্নাবান্না সমস্ত রপ্ত। হরিহরের জ্বালায় পড়ে এই তিন হপ্তায় আরো ভাল করে শিখে ফেলেছি। মায়েরা দেশে গেছেন। বিস্তর আম-কাঁঠাল হয়েছে, আমাকেও যেতে লিখছেন। কিন্তু এগজামিনের বেশি তো দেরি নেই, এ সময় দেশে পড়ে আড্ডা দেওয়া ঠিক নয়—কি বলেন?

ইরা মুখ টিপে হেসে বলল, সে তো বটেই! ফুটবলটাও এবারে ভারি জমেছে—কি বলেন?

অরুণ সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল। আচ্ছা মেয়ে—জ্যোতিষ-শাস্ত্রে দখল আছে নাকি, মুখ দেখে যাবতীয় খবর পটাপট বলে দেয়। উঁহু—কাগজের খেলার পাতাটায় দাগ দিয়ে রেখেছে, সেটা নজরে পড়েছে। তা এরা টিকটিকি-পুলিশের চাকুরি নিলে তো পারে, খাঁ করে উন্নতি হয়ে যাবে।

এবার নিজের কাপ মুখে তুলল। মুখ বিকৃত করে বলে, নোনতা-নোনতা লাগছে না?

ভালমানুষের ভাবে ইরা বলে, কই—না তো!

হুঁ, নুনই পড়েছে। তাই আপনি খাচ্ছেন না—খালি ঠোঁটে ঠেকাচ্ছেন।

চা রেখে অরুণ ভিতরে গেল। ফিরে এসে বলে, তাই—চিনি ভেবে নুন দিয়েছি। চিনি কোথায় যে রেখে গেছে হতভাগা—হয়তো বা জল ঢেলে শরবৎ করে মেরে দিয়েছে।

ইরা বলল, নুন-চা'রই দরকার ছিল আমার। ঠাণ্ডায় সর্দি লাগবে না।

নাঃ, বদনাম হয়ে গেল আপনার কাছে। কেমন চা করি দেখাতে পারলাম না। জানেন, হরিহরের জন্য এক এক সময় ইচ্ছা করে, পড়াশুনো ঘুচিয়ে দিয়ে যেদিকে দু-চোখ যায় বেরিয়ে পড়ি।

বৃষ্টি চলেছে, এ বৃষ্টি ধরবার লক্ষণ নেই। আটটা বাজে। কথাবার্তায় মন লাগছে না। বাবা সেই কখন গিয়ে বসেছেন, জলটুকুও আর পেটে পড়ে নি। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে, জোরজার করে শুইয়ে দেবে একটু। ইরা বারবার উঠে জানলার কাছে যায়। তার পরে দরজা খুলে ফেলল।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি চলি এবার।

কাদা-মাখা শাড়িটা ধুয়ে নিংড়ে টুলের উপর রেখেছিল। সেদিকে তাকাচ্ছে। অরুণ বুঝে নিয়ে বলল, ওটা থাকুক। লাইব্রেরিতে শাড়ি হাতে করে যাবেন কেমন করে? হরিহর আপনার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। দাঁড়ান, দাঁড়ান—ছাতা দিচ্ছি, খালি মাথায় যাবেন না।

ছাতা মাথায় ইরাবতী যাচ্ছে। ক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখে, অরুণও আসছে পিছু পিছু। আশ্চর্য হয়ে বলে, এ কি?

ট্রাম-রাস্তা অবধি এগিয়ে দিয়ে আসি আপনাকে—

দরকার নেই, একাই বেশ যেতে পারব। ইস, আপনি ভিজে গেলেন একেবারে।

অরুণ বলে, রক্ষে পেলাম ভিজে। সন্ধ্যেবেলা রোজ একবার চান করি। আজকে হয় নি বলে এমন গরম লাগছিল—

না, ফিরুন আপনি। বাদলায় ভিজলে অসুখ করবে।

অরুণ হেসে বলে, নতুন ছাতাটা দিলাম—ছাতা নিয়ে আমার ভারি আতঙ্ক। ধরুন, যদি হারিয়ে ফেলেন—কিম্বা ফেরত দিতে যদি মনে না থাকে। তাই ভেবেছি, ট্রামে তুলে দিয়ে একেবারে ছাতাটা হাতে নিয়ে ঘরে ফিরব।

ইরা বলে, শাড়ি রয়ে গেল যে, ছাতা ফেরত দিতেই হবে। আপনাদের ধুতি আর ছাতা এক সঙ্গে করেও শাড়ি পাল্লায় ঝুঁকবে। ভাল একটা শাড়ি গলায় বেঁধে ফাঁসি যেতেও কোন মেয়ে দৃকপাত করে না জানেন?

খিলখিল করে ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল। হাসি ছড়াতে ছড়াতে চলল যেন। বৃষ্টিজলের মধ্যে অরুণাক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। এক ছাতায় দু-জনে চলুন যাই—এমন কথাই বা বলা যায় কেমন করে? কি হয়তো ভেবে বসবে।

—দুই—

লাইব্রেরির বড় হলে ভিড় বেশি, তার মধ্যে নয়। পাশের কুঠুরিতে একটা কোণ ঠিক করা আছে, কোন রকমে দুটো নাকে-মুখে গুঁজে বিশ্বেশ্বর সেইখানে এসে বসেন। বসেন এসে ঠিক সাড়ে-দশটায়। আর উঠবেন ইরাবতী এসে জোর-জবরদস্তি করে যখন তুলে নিয়ে যাবে। না যদি আসে কোনদিন ইরা—তা অবশ্য কোনদিন হয় না—কি হবে তা হলে? রাতভোর চলবে নিশ্চয় তাঁর কাজকর্ম, লাইব্রেরির লোকজন দোর বন্ধ করবার সময় যদি তুলে না দেয়। আত্মীয়-বন্ধুরা বলে, অফিসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কি হল—এ যে আর এক চাকরি। ইরা বলে, সে চাকরিতে আরাম ছিল। এ চাকরির মনিব ভয়ানক কড়া। শীত-গ্রীষ্ম ঝড়-জল ছুটিছাটা বলে রেহাই নেই, ঘাড় তুলে একটা নিশ্বাস ফেলার ফুরসত দেয় না।

তাই। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ বিশ্বেশ্বরের কাজকর্ম। চেয়ার-টেবিলে কুলোয় না, তাঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা—মেজের উপরে জাপটে বসেন। লাইব্রেরির কর্তারা তাই একটা সতরঞ্চি দিয়ে দিয়েছেন। গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবি, পাড়হীন ধুতি পরনে। ধুতিটা হয়তো বেশিরকম ফরসা জামার তুলনায়—কে খেয়াল রাখে বাজে পোষাকআশাকের? সামনে ও ডাইনে-বাঁয়ে অসংখ্য বই গাদা করা। এক-একটার এমন অবস্থা যে খুলতে ভয় করে—বুঝি গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়বে। তবে সে আশঙ্কা নেই বিশ্বেশ্বরের হাতে। প্রাণপ্রিয় সন্তানের মুখ তুলে

ধরে দেখার মতো অতি সন্তর্পণে খোলেন পুরোনো বইয়ের এক-একটা পাতা। এটা খুললেন—নোট নিলেন একটুখানি। বন্ধ করে খুললেন আর একটা। কখনো বা দুটো তিনটে একসঙ্গে। খাতাই বা কতগুলো। কখনো এটায় টুকছেন, কখনো ওটায়। এই সব করে যাচ্ছেন অবিরাম, একটি মুহূর্ত নষ্ট হতে দেবেন না। কালস্রোত বয়ে চলেছে খরবেগে—মহামূল্য মানব-জন্মের ঘণ্টা-মিনিটগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হেলায় হারানো হবে না এর মধ্যে সিকি মিনিটও, সময়ের তিলার্ধ অপব্যয় করবেন না—এমনি একটা সতর্ক ব্যস্ততা বিশ্বেশ্বরের চোখে মুখে কাজকর্মের ধরনে।

অপব্যয় একেবারে কিছু না করে উপায় নেই, ছেলেদের হাত এড়ানো যায় না। একটি দুটি নয়—বেশ একটি দল। লাইব্রেরিতে পড়তে আসে—কাজকর্ম অন্তে চলে যাবার মুখে জিজ্ঞাসুর ভাব নিয়ে সতরঞ্চির প্রান্তে বসে। বিশ্বেশ্বর শশব্যস্ত হয়ে পড়েন : কি হে—কি বলছ তোমরা ?

একজন তার মধ্যে গম্ভীর ভূমিকা শুরু করে দিল : জোব চার্নক আর হেস্টিংস বন্ধুলোক ছিলেন, অথচ দেখা যাচ্ছে যে—

আর কোথায় যাবে। বিশ্বেশ্বর সপ্তমে চড়ে উঠলেন : সে তো বটেই। ঝান্সীর রাণী আর রাণী ভবানীতে যেমন ছিল বন্ধুত্ব। কিংবা রামায়ণের লক্ষ্মণ আর মহাভারতের অর্জুনে। বেশ, বেশ! পাহাড়-প্রমাণ বিদ্যে তোমাদের—এই বিদ্যের গবেষণা, তাই তো গণেশের ধড়ে হাতির মুণ্ডু হরদম চাপান পড়ছে।

গালি শুরু হতেই ছেলেরা হাসিমুখে চোখ টেপাটিপি করে। একটানা খেটেছে এতক্ষণ ধরে ; খাটনির পর এইবারে মজা।

পরশু—পরশুদিনই তো এই জোব চার্নকের কথা হল। মাথায় কি আছে বাপু তোমাদের ? হ্যাঁ, তোমরাই তো সব ছিলে—

বিরক্তভাবে বিশ্বেশ্বর আবার নিজের কাহিনি শুরু করেন, তুই- খারাপ করে বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে ফল কিবা ?

ছেলেরা সাফ বে-কবুল যায় : আজ্ঞে না, আমরা নই। ঐ আর কাদের বলেছিলেন। আপনাকে পেয়ে অনেকেই জো এসে জোটে।

বিশ্বেশ্বরও একবারে নিঃসংশয় নন যে এরাই সে দল। বলবার সময় চোখ বুঁজে আপন মনে বলে যান তিনি, কারা শুনছে সেটা বড় তাকিয়ে দেখেন না। সে কী বলা! সেকালের মানুষগুলো চোখের উপর দেখতে পাচ্ছেন, হাত-পা নেড়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বরঞ্চ আজকের এই কলকাতাই অলীক। চৌরঙ্গিতে কসাড় জঙ্গল, পূবের ভাদা-বাদায় নোনা জলের তরঙ্গ খেলছে—গাঙ-খাল আর প্যাচপেচে জলা যায়গা, তারই ভিতর গঙ্গার ধারে ধারে মাদার উপর বসতি। মা-কালীর থান বলে কিছু নামডাক আছে। হালিশহর থেকে চিৎপুর হয়ে একটা জঙ্গুলে পথ বড়শে অবধি— পূজাপার্বণে সেই পথ ধরে কাছাকাছি অঞ্চলের মেয়ে-পুরুষ ভবানীপুর গাঁয়ের কালীমন্দিরে আসে, ঠাকুর দেখে গঙ্গায় ছুটো ডুব দিয়ে পাপক্ষালন করে যায়। হেন জায়গায় কে ভাবতে পারে এক আজব শহরের কথা? জোব চার্নকও ভাবে নি, পালাবার মুখে নেহাত দৈববশে এসে জাহাজ বেঁধেছিল।

হুগলি ছেড়ে দলবল নিয়ে তারা পালাচ্ছে। না পালিয়ে উপায় কি? শায়েস্তা খাঁ বড্ড তড়পাচ্ছে—ঘাড় ধরে ইংরেজগুলোকে যে-অক জলে ছুঁড়ে দেবে; পারে তো সাঁতরে গিয়ে দেশেঘরে উঠুক, তাতে শায়েস্তা খাঁর আপত্তি নেই। দু-মাস ছ-মাস দেরি আছে ওদের এসে পড়বার; ঢাকা থেকে এদ্দূর আসবে তো তোড়জোড় করে! কিন্তু হুগলির দোকানিরা কষ্ট করেছে এদিকে, ইংরেজের কাছে কেউ

কোন জিনিস বেচবে না। উপোস করে করে মুখ আমশিপারা।
মনের দুঃখে চার্নক বাংলাদেশ ছেড়ে চলেছে।

ভাঁটায় নামতে নামতে কলতায় জঙ্গলের ধারে এসে জাহাজ ঠেকল। সর্বনেশে জায়গা রে বাপু! জনমানব নেই, বাঘ হামলা দিচ্ছে। এখানে নামা যায় না, জোয়ারবেলা ভাসিয়ে দিল আবার জাহাজ। যায় যেখানে, যাক। সুতোনুটির হাট ছেড়ে চলে গিয়েছিল, ফিরে এলো সেখানে। জেলে, কাঠুরে আর ঘর কয়েক তাঁতির বাস এদিকে-সেদিকে। বাংলাদেশে কাজকারবার বজায় রাখতে হলে আড্ডা একটা চাই। গড়ে নিতে পারলে এ জায়গা বোধ হয় মন্দ দাঁড়াবে না।

তারপরে বিস্তর ঘাটের জল খেয়ে—আজ হিজলি, কাল চাটগাঁ, পরশু মাদ্রাজ, এমনি করে করে—সুতোনুটির আশপাশেও দু-চারবার চক্কোর দিয়ে শেষটা হাটখোলার কাছে খান কয়েক চালাঘর তুলে বসল। তাঁবু খাটিয়ে আছে কেউ কেউ। আর গঙ্গার ঘাটে নৌকোর মধ্যেও অবরে-সবরে অনেকে রাত কাটায়···

গল্পের ইতি পড়ে দেখে খুনশুড়ির আর এক প্রশ্ন : এই সুতোনুটিতে থাকতেন হেস্টিংস?

বিশ্বেশ্বর খিঁচিয়ে উঠলেন, সুতোনুটির হাটে তাঁতের কাপড় বেচত হেস্টিংস—বসাক আর শেঠেরা কিনত। উপায় কি সেখানে না থেকে?

আকাট মুর্খের দল—এদের কাছে ধৈর্য রাখা দায়। আবার ভাবেন, এদের কি দোষ—শুনে থাকবে কারো না কারো কাছে। যত হাঁদারাম ইদানীং ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। আগে এই লাইনটা নিরুপদ্রব ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর পলিটিক্সে ভিড় বেড়ে যাওয়ায় সেখানে কলকে-না-পাওয়া মানুষেরা নানান দিকে ছিটকে পড়ছে—গবেষণার ব্যাপারেও। বিশ্বেশ্বরের নিজের ক্ষেত্র—তিনি

যদি নির্বাক থাকেন কিংবা গালাগালি দিয়ে শাসিয়ে থাকেন, ছুঁই-কোড়েরা তবে তো নানান আপ্তবাক্য ছেড়ে মানুষের মাথা খারাপ করে দেবে। বোঝ কাণ্ড। সুতোনুটিতে হেস্টিংসের ঘর জেনে আছে, ঐ ছোঁড়ারই বাপ-দাদা হয়তো হেস্টিংস স্ট্রীটে ওয়ারেন হেস্টিংসের আস্তাবল-বাড়িতে দশ-পাঁচটা অফিস করে ওর পড়াশুনোর খরচ যোগাচ্ছেন। সেই তখন কত কাণ্ড হয়ে গেল—শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ক'জনই বা খবর রাখে? অতএব মুলতুবি থাকুক কাজকর্ম—বিশ্বেশ্বর এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসে আবার হেস্টিংস-পর্ব শুরু করলেন।

হাঁ, জোর করে বলার শক্তি ধরেন বটে তিনি! তাঁর টম্যাজ রো একদিন গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজতে ভাঁজতে জাহাঙ্গিরের দরবারে ঢুকলেন, সেই পালা সাঙ্গ হল এসে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের আমলে—ইতিহাসের দূরবিস্তীর্ণ দুই সীমানার মধ্যে অতি স্বচ্ছন্দ তাঁর চলাচল। বরঞ্চ পরবর্তী বর্তমানটাকে চেনেন না তিনি ভাল করে, এর ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে ঢুকতে পারেন না। চারিদিকের জীবন্ত মানুষগুলোর মধ্যেই নিজেকে অসহায় বোধ করেন।

বকতে বকতে মুখে ফেনা উঠে গেছে, তবু শ্রান্তি নেই। ইরাবতী এসে দাঁড়াল, বিশ্বেশ্বর তখন অন্য-লোকে। কেমন কেমন চোখে তাকাচ্ছেন মেয়ের দিকে—এই সব জিজ্ঞাসুদের থেকে আলাদা করে যেন চিনতে পারছেন না।

ইরা ডাক দেয়, চলো বাবা—

চমকে উঠে বিশ্বেশ্বর বলেন, এখন কি রে, এই সন্ধ্যেবেলা?

সন্ধ্যা ছিল তিন ঘণ্টা আগে। দেখ না ঘড়ির দিকে তাকিয়ে।

ঘাড় উঁচু করলেই মুক্ত দরজা দিয়ে হলের দেয়াল-ঘড়ি দেখা যায়। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের ফুরসত কোথা অতখানি হাঙ্গামা করবার?

ইরা তাগাদা দেয়, ওঠো—

ছেলেদের একজন বলে, অতি চমৎকার বোঝাচ্ছেন, বিস্তর শিক্ষা হচ্ছে। কথাগুলো শেষ করতে দিন।

ইরা কঠিন কণ্ঠে বলে, আর নয়—এখন বাবা বাড়ি যাবেন। প্রশ্নগুলো কাল অবধি যদি মনে থাকে, আবার কাল এসে না হয় বুঝবেন। আমি এসে পড়বার আগেই সেরে নেবেন।

যুগচক্রের সম্পাদক কৃতান্ত এবং সহকারী পঞ্চানন ঘুরতে ঘুরতে লাইব্রেরিতে এসে পড়ল। রশিদ-বই নিয়ে ঘুরছে। কৃতান্ত বলে উঠল, ভক্তিতে বেসামাল তো ভায়ারা! মুখের বাক্য গবগব করে গিলে খেলেন—বই কেনেন না কেন? তবে তো আর মুখঝামটা খেতে হয় না।

কি বই?

এই দেখুন, নামটাও শোনা নেই; একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। 'ভারতে ইংরাজ'—যা লিখতে লিখতে দাদার কালো দাড়ি সাদা হয়ে গেল। পরের ভল্যুমের লেখা চলছে এখন।

পঞ্চানন ফলাও করে বলে, বৃটিশ আমলের তাবৎ ইতিহাস অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পাবেন। মুফতে মুখে না শুনে এক এক কপি কিনে নিয়ে পড়ুনগে। যুগচক্র কার্যালয় থেকে বেরিয়েছে। মূল্য আট টাকা, এক সঙ্গে তিনখানা কিনলে ডাকমাশুল ফ্রী।

আর এক ছোকরা বলল, ছাপা বইয়ের বাড়তিও বিস্তর দামি জিনিস থাকে। নাড়া দিয়ে দিয়ে সেই সমস্ত আদায় করছি। বই পড়ি নি, এটা ধরে নিচ্ছেন কেন?

কৃতান্ত হি-হি করে হাসে।

বেশ, বেশ। পড়ে থাকেন, ভালই। কিনে পড়েন, আরও ভাল। এমন ভক্ত যখন আপনারা, কিছু চাঁদা ছাড়ুন দিকি দাদার

সম্বর্ধনা ব্যাপারে। পঞ্চানন, যে যা দিচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে রশিদ কেটে দেবে। এমন কথা না ওঠে যে দশের পয়সা মেরে দিয়েছে।

এই অমোঘ অস্ত্রে ভক্তেরা রণে ভঙ্গ দিল। বাণ্ডিল খুলে রশিদ-বই বের করতে পঞ্চাননের কিছু সময় লাগে। রশিদ কাটতে গিয়ে দেখা গেল—মুখপাত্র হয়ে একেবারে সামনে ছিল, সেই দু-জন মাত্র—বাকি কারো পাত্তা নেই। দণ্ড স্বরূপ তারাই কিছু কিছু দিয়ে সরে পড়ল।

কৃতান্ত বলে, দাদা আপনার জন্মদিন বারোই আষাঢ় তো ?

বিশ্বেশ্বরের তখনো বোধ হয় ওয়ারেন হেস্টিংসের ঘোর কাটে নি। প্রশ্নটা পুরোপুরি শোনেন নি—চমক খেয়ে বলে উঠলেন, অ্যাঁ—কার জন্মদিন ? কবে ?

অর্থাৎ তারিখের হেরফের হলে ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বর ক্যাঁক করে টুটি চেপে ধরবেন এক্ষুণি।

পঞ্চানন বলে, জাতিধর্মনির্বিশেষে যাবতীয় নাগরিকের পক্ষ থেকে জন্মদিনে আপনাকে মানপত্র দেওয়া হচ্ছে। কাউন্সিলার ভূতনাথ গুঁই মশায়ের পৌরোহিত্যে য়্যুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে মহতী সভা—

ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না বিশ্বেশ্বর, ধাঁধাঁ লেগে গেছে। বললেন, কেন ?

বাঃ রে, 'ভারতে ইংরাজ' লিখে দেশের কত বড় কাজ করলেন! স্বাধীন-ভারত স্বাধীন-ভারত করে সবাই তড়পাচ্ছে—এই চিজ কারা কোত্থেকে কোন কায়দায় নিয়ে এলো, সমস্ত একেবারে আপনি জল করে দিয়েছেন।

কৃতান্ত হেসে উঠে বলে, ঐ যে বলে, যার বিয়ে তার মনে নেই—যুগচক্রে খবরটা বেরিয়ে শহরময় হৈ-হৈ পড়ে গেল, আর কেন কি বৃত্তান্ত আপনাকে ধরে ধরে বোঝাই এখন আমরা। একখানা করে

কাগজ পাঠাই, তার পাতাটাও উল্টে দেখেন না? লেখকরা অন্যের লেখা না পড়ুন, নিজের লেখার কমা-দাঁড়ি নিয়েও আহা-ওহো করেন। আপনার লেখার ঠিক নিচেই তো সম্বর্ধনার খবর।

ইরা তাড়াতাড়ি বলে, বাবা বেরিয়ে যাবার পরে আপনাদের কাগজ গিয়ে পৌঁচেছে। আমি পড়েছি, ওঁর এখনো হাতে যায় নি।

ব্যস্তবাগীশ বাপের দিকে মধুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, আমি তাই বলে থাকি, অফিসে চাকরির সময় ছুটিছাটা ছিল, দায়-বেদায়ে কামাই করা চলত। এখনকার মনিবের কাছে আধ মিনিট দেরি হবার জো নেই। ঠিক সাড়ে-দশটায় হাজিরা।

বিশ্বেশ্বর একগাল হেসে বললেন, 'ভারতে ইংরাজ' খুব ভাল বলছে বুঝি লোকে?

পঞ্চানন বলে, বলবে না? বাঙালি পাঠক বই না কিনুক, গুণীর কদর বোঝে। দেখবেন, ইনিয়ে-বিনিয়ে কী পরিমাণ বক্তৃতা দেবে, অশ্রু-গদগদ কত কবিতা লিখে নিয়ে আসবে!

বিশ্বেশ্বর গলে গেলেন।

আমি জানতাম। খাতার পাতে কলম ছুঁইয়েই বুঝতে পারি, কী দরের জিনিষ বেরুবে। তোমরা কিন্তু গোড়ায় ভরসা করতে পার নি। তা-না না-না করে বিস্তর দিন কাটালে। 'ভারতে ইংরাজ' নইলে ছ-বছর আগে বেরিয়ে এদ্দিনে পুরানো হয়ে যেত।

পঞ্চানন মনে মনে বলে, পুরানো ফর্মাও ওজন দরে চলে গিয়ে এদ্দিনে গুদাম সাবাড় হত। কৃতান্ত কিন্তু এক কথায় দোষ কবুল করে নেয়: খরচের হিসাব কষে দাদা আগুপিছু করেছি। করপোরেশনের ইলেকসন অবধি সবুর করতে হল। তা দেরি হোক যা-ই হোক, বের করে ফেললাম তো ঢাউশ বই। কোনটা কি দামের বস্তু, কৃতান্ত

বিশ্বাসের বুঝতে সিকি মিনিটও লাগে না। কিন্তু দেরি হয় কেন, সে এই জামার পকেটের তালি দেখে বুঝতে পারেন।

ইরা ঘাড় নেড়ে বলে, তা সত্যি। দেশে কত ধনী-মানী আছেন, গবর্নমেন্ট আছে, নামজাদা প্রকাশকরা আছে—কাউকে পাওয়া গেল না, আপনিই কেবল এগিয়ে এলেন কাকাবাবু—

কাকা ডেকে বসল আজকে। ধূর্ত ও ঘাগু-সম্পাদক বলে কৃতান্তর বদনাম। যুগচক্রের নামে অরুপাক্ষ ভ্রূ কুঁচকাল—ঐ মনোভাব অনেকেরই। সামনাসামনি বড় কেউ প্রকাশ করে বলে না, ভাল ভাল বিশেষণে তোয়াজও করে অনেকে। কাজ কি ভাই দুর্জনকে চটিয়ে? ভারি ধার কৃতান্তর কলমে, গালিটা বড্ড খোলে।

কিন্তু শুধু ধারে কাগজ চলে না। ভারও চাই, তাই আছেন বিশ্বেশ্বর। পয়লা লেখাটা তাঁর একচেটিয়া। পড়ে না প্রায় কেউ, তা হলেও চাই ওটা। প্রবন্ধের নাম দেখেই লোকে সসম্ভ্রমে বলে, হাঁ—কাগজখানার কদর আছে। যুগচক্র বেরুবার মুখে কৃতান্ত বিশ্বেশ্বরের বাড়ি হানা দিয়ে বিস্তর ভাল ভাল কথা বলে। বিশ্বেশ্বর তার পরে মরীয়া হয়ে লেগে যান লেখা তৈরি করতে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই। কিন্তু লেখা ঐ ছাপানো অবধি শেষ, তার অধিক প্রত্যাশা নেই। ইরাবতীও তাই কৃতান্তর উপর বিরূপ—কাগজ চালানোর জন্য তার ভালমানুষ বাপকে খাটিয়ে মারে, খাটনির ফল একলা ফাঁকি দিয়ে খায়। কৃতান্ত বাড়ি গেলে এতাবৎ বসতে বলে নি কখনো, কোন-কিছু প্রশ্ন করলে ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিয়েছে। কিন্তু দোষ যতই থাক, একটা জিনিষ মনে হচ্ছে, বাংলা সাহিত্যকে সে ভালবাসে। সে ভালবাসায় খাদ নেই। বিশ্বেশ্বরের বইটা নিয়েই দেখ না। এ যদি দিকপাল চাটুজ্জে হতেন, প্রকাশকরা হামলা দিয়ে এসে পড়ত। ঝুড়ি ঝুড়ি গল্প-উপন্যাস লিখে দিকপালের নাম। লিখেই যাচ্ছেন অবিরত—কেন

লিখবেন না, বানানো বস্তু, মনের মধ্যে যত-কিছু আগডম-বাগডম আসে কাগজের উপর ছড়িয়ে গেলে হল। বিশ্বেশ্বরের মতন নয় যে তারিখটা শনিবার হবে কি সোমবার হবে সাব্যস্ত করতেই লেগে গেল তিন দিন কি তিন মাস কিম্বা তিন বছর। তবু দেখ, মিথ্যুক ঐ দিকপাল চাটুজ্জের কত খাতির! সভাসমিতি লেগেই আছে। বাড়িতে নাকি পোষা ছাগল আছে—হররবখত দিকপালের গলার ফুলের মালা খেয়ে খেয়ে সে ছাগল মোষের মতন হয়েছে।

আর ইনি এক তপস্বী এই কোণটিতে পাঁচ-পাঁচটা বছর কাটিয়ে দিলেন, পাঁচ বছরের সাধনায় বই লেখা হল। দিকপাল দাদন নিয়ে বসে থাকেন—দু-ফর্দ চার ফর্দ লেখা হলেই প্রকাশক কেড়েকুড়ে নিয়ে প্রেসে দেয়। আর কৃতান্ত 'ভারতে ইংরাজের' কাপি ঘাড়ে করে সরকারি বেসরকারি কত প্রতিষ্ঠানের দোরে দোরে ঘুরেছে—জুতোর তলাই ক্ষয়ে গেছে, লাভ কিছু হয় নি। দুত্তোর—বলে শেষটা তখন নিজেই ছাপল।

কৃতান্ত দেমাক করছে, জিনিষ চিনি বলেই বই ছাপিয়েছি, আবার সম্বর্ধনার যোগাড় করছি। এ তুমি বুঝবে না ইরা মা, সম্বর্ধনা না করে হতভাগা কৃতান্তর উপায় নেই। তাতে বউ-ছেলেপুলের উপোস যাক, আর ছাপাখানাই বন্ধক পড়ুক।

পঞ্চানন বিরস মুখে বলে, বিনয় করে বলা নয়। হবে তাই নির্ঘাত। ছাপাখানাটা যাবে এবার।

যায় যাকগে। কৃতান্ত তাতে ডরায় না। অ্যাসেম্বলির বড় ইলেকসন সামনে—গেলে আবার ডবল করে হবে। তৈরি হতে লাগুন দাদা—'ভারতে ইংরাজের' দ্বিতীয় খণ্ডটা বের করবার মতলব রাখি ঐ অ্যাসেম্বলির মণ্ডকায়।

আবারি বলে, যাকগে। যখনকার ভাবনা তখন। যে জন্তে এসেছি—আপনার সঠিক জন্ম-তারিখটা বলে দিন। সেই মতো

হল-ভাড়া হবে, কার্ড ছাপবো। বারোই আষাঢ় বলে জানি—তাই তো পাকা?

বিশ্বেশ্বর চিন্তিত হলেন: আষাঢ়ে জন্মেছিলাম বটে—তারিখটা বারোই কিনা…তুই বলতে পারিস ইরা? উঁহু, আন্দাজি হাত মারা নয়। তোর মা ছিলেন সাথে, আমাদের বাড়ি গিয়ে ইরার মাকে একবার জিজ্ঞাসা কোরো কৃতান্ত। সে সঠিক বলবে।

কৃতান্ত হেসে ওঠে, সে কি দাদা? যত মরা মানুষের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ কণ্ঠস্থ, নিজের বেলা গড়বড়?

বিশ্বেশ্বর বলেন, বাজে জিনিষ আমি মাথায় রাখিনে। আমার জন্ম-তারিখ কোন্ কাজে আসবে?

কাজে আসবে না তো এদ্দূর এই হাঁটতে হাঁটতে এলাম কেন্ শুনি? যা বলেছেন, বউদির কাছেই যাব, আপনাকে দিয়ে হবে না।

উঠে পড়ল কৃতান্ত। পঞ্চানন বলে, লাইব্রেরির সেক্রেটারির কাছে খান দুই রশিদ-বই গছিয়ে যাই, যদি কিছু তুলে দেন্। এঁদেরই তো ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত—এই যখন দাদার সাধন-পীঠ।

ইরাবতীকে বল্লে, সম্বর্ধনা-কমিটিতে আপনাকে নেওয়া হয়েছে। রবিবারে আমাদের অফিসে কমিটির মীটিং। চিঠি যাবে আপনার কাছে।

কৃতান্ত বলে, মীটিং রবিবারে ডাকা হল সকলে যাতে হাজির হতে পারে। সকাল সাড়েআটটায়। প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলা হবে ঐ দিন। তুমি ভেবেচিন্তে তৈরি হয়ে এসো ইরা মা, পার তো কাগজে ছকে নিয়ে এসো। কাজ সহজ হবে।

ইরা বলে, বাবাকে নিয়ে ব্যাপার—বাবার সম্বর্ধনা। কমিটির মধ্যে আমার থাকা বোধ হয় ঠিক হবে না কাকাবাবু। আমি যাব না।

কৃতান্ত বলে, তোমার হলেন বাবা—আমিও বড় ভাই বলে তাঁকে মান্য করি। তবে তো আমারও হাত গুটিয়ে বসতে হয়। ঘরের মানুষ বলে দামের ঠিক ঠিক আন্দাজ নিতে পার না মা—বাংলার ইতিহাসের যে একটু খবরাখবর রাখে, সে-ই দাদাকে মাথায় তুলে নাচবে। সে হিসাবে দেশের সব মানুষই দাদার আত্মীয়জন। নিজেকেও সেই দলের একটি ভেবে নাও না, তা হলে সঙ্কোচ হবে না।

ইরা না-না—করছে। বিশ্বেশ্বর এক কাণ্ড করে বসলেন সহসা। মেয়েকে বললেন, শুনছিস রে ইরা? তোর মাকে গিয়ে বলবি, সে মোটে বিশ্বাস করে না। বলিস সমস্ত—কৃতান্ত যে কথাগুলো বলল। দেশের মানুষ মাথায় তুলে নাচবে, হেঁ হেঁ—মস্ত বড় সভা করছে আমায় নিয়ে।

ইরা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে: চলো এবারে তুমি। কত রাত হয়ে গেছে, ওঠো। তোমার খিদে পেয়ে গেল বাবা—

ছেলেমানুষ বাপটিকে নিয়ে এদের সামনে থেকে সরতে পারলে রক্ষে পেয়ে যায়।

বাপে-মেয়েয় চলে গেছে। কৃতান্তরা সেক্রেটারির ঘরে গিয়ে বসেছে। আসেন নি তিনি এখনো। কখন আসবেন কিম্বা একেবারেই আসবেন কিনা সঠিক কেউ বলতে পারে না। পঞ্চানন বেজার মুখে বলে, শনি আপনাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, কিছুতে শিক্ষা হয় না। যা ঐ মুখ দিয়ে বেরুল, ছাপাখানাটা সত্যিই যাবে এবার। পঞ্চাশ কপি বই বিক্রি হল না, তার উপর লেখক-সম্বর্ধনা।

রাগ দেখে কৃতান্ত হাসে।

আরে বাপু, কানে জল ঢুকলে আরও জল ঢুকিয়ে দিয়ে বের করতে হয়। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে মগলব খরচ। এ হল

সভার নামে হৈচৈ করে, পয়সায় কুলাল তো দু-খানা করে সিঙাড়া খাইয়ে, নিখরচায় খবরের কাগজে কলমজোড়া বিজ্ঞাপন বাগিয়ে নেওয়া।

নিখরচায় কি বলেন? হলের ভাড়াই কত পড়বে! তার উপর মালা আছে, মাইক আছে—নমো-নমো করে সারলেও পাঁচ-শ-টাকার ধাক্কা।

কৃতান্ত নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলে, সে তো আর আমরা দিতে যাচ্ছি নে। পাবই বা কোথা?

কে দেবে তবে? জাতিধর্মনির্বিশেষে তাবৎ নাগরিক সম্বর্ধনা করছে, তারা নাকি? তবেই হয়েছে!

রাগে গরগর করতে করতে পঞ্চানন পকেট থেকে রশিদ-বই বের করে ফেলল—একটু আগে যার থেকে দু-খানা কেটে দিয়েছে।

এই, এই—। পরিতোষ হাজরা আট আনা আর দীপক বটব্যাল ছ-আনা। বাহবার জোয়ার বইয়ে দিয়ে শেষ অবধি দুই ভক্তে মিলে পুরো টাকাটাও নয়। হস্টেলে থাকে দেখছি—সিনেমা-সিগারেটে কত উড়েপুড়ে যায়। এই হল ব্যাপার! ঐ চোদ্দ আনার পয়সা দিয়েই মনে মনে শাপশাপান্ত করতে করতে গেছে।

কৃতান্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, যদ্দূর হয় হোক এমনি। তার পরে গৌরী সেন রয়েছে। ইনস্টিট্যুটের মতন জায়গায় ভূতনাথ গুঁই সভাপতি হয়ে ফুলের মালা গলায় চড়িয়ে বক্তৃতা করবে। বক্তৃতা লিখেও দেবো আমরা। তার উপরে, চাই কি, 'বিদ্যোৎসাহী' 'দানশৌণ্ড' এমনি গোছের ভারী ভারী বিশেষণ ছুঁড়তে থাকব। বই ছাপানোর কাগজ দিয়েছে, বই বিক্রির দায় নিতে এখন কে আসবে?

পঞ্চানন বলে, কাগজটা দিয়েছিল—ইলেকশনের ডামাডোলের ছিল সে অস্ত্র। বিশেষণের বহুৎ দাম ছিল। তার উপরে অমুকাক্ষর নাম করে তাতিয়ে দিলাম—ডাক্তারবাবু শুধু কাগজ নয়, বইয়ের প্রেসখরচাও দিতে যাচ্ছেন। ভোটাররা টের পেলে অমুকোকের দিকে ঝুঁকবে—ধাক্কায় ভুলে গিয়ে ভূতনাথ তাড়াতাড়ি টাকা বের করল।

কৃতান্ত হেসে উঠে বলে, ইলেকসন যদি মাসে মাসে হত রে! তাই হওয়া উচিত, জনগণের মর্ত যত ঘনঘন যাচাই হবে, তত দাঁড়াবে খাঁটি গণতন্ত্র। পঞ্চানন, তুমি একখানা জ্বালাময়ী ছাড়ো দিকি আসছে সংখ্যায়। সরকারের সুবুদ্ধি হোক। যুগচক্র আর পিছিয়ে থাকে না তা হলে, হপ্তায় হপ্তায় নিয়মের মধ্যে এনে ফেলা যায়।

হপ্তায় কি বলছেন, দু'খানা করে ফি হপ্তায়। সেই সুখস্মৃতির মধ্যে পঞ্চাননও হেসে ফেলল উপস্থিত উদ্বেগ ভুলে। আহা, কী লাটসাহেবি করা গেছে করপোরেশনের সেই ইলেকসনের সময়টা!

হঠাৎ এরা যেন ঈশ্বরের সমতুল্য হয়ে উঠল। বৈঠকখানায় বিশ দিন ধর্না দিয়েও যে মহাজনের সঙ্গে একটা কথা বলার ফুরসৎ পাওয়া যায় না, তাঁরাই সকাল বিকাল লোক পাঠাচ্ছেন, হামেশাই নিমন্ত্রণ করছেন, নিজেরাও অনেক সময় যুগচক্র-অফিসে এসে ছবির গরুড়-পক্ষীর মতো বসে থাকেন। দু'জন ভাইপো ও দুটি শালার চাকরি করে দিল কৃতান্ত এই মওকায়। পঞ্চাননের নতুন জুতো, পশমি ট্রাউজার ও হাওয়াইয়ান শার্ট হল। প্রেসের পুরানো টাইপ বাতিল হয়ে আনকোরা নতুন টাইপ এলো। আর যুগচক্র কাগজ যদিচ নামে সাপ্তাহিক, বরাবর ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে বের হয়। পয়লা ভাদ্রের কাগজ হয়তো সাতুই কাত্তিক বেরুল, আর সাতুই কার্তিকেরটা বেরুলই না মোটে। পিছলে পিছলে যখন অনেকটা পিছিয়ে যায়, একেবারে পনের-বিশ সংখ্যা বাদ দিয়ে কাগজটা প্রকাশ-তারিখের

ঝাঁকাঝাঁকি নিয়ে আসে। আবার পেছুতে থাকে। বাইশে পৌঁছেছে যুগচক্রের বয়স—টায়েটোয়ে আর তিনটে বছর কাটালে রজত-জয়ন্তী। এই বাইশ বছরে বাইশ ইনটু বারো অর্থাৎ মাসে গড়ে একখানা করে বেরিয়েছে কিনা, তাই সন্দেহ।

ইয়া একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, গ্রাহকরা আপত্তি করে না?

কৃতান্ত মুচকি হেসেছিল, জবাব দেয় নি। গ্রাহক থাকলে তো আপত্তি। সরকার বাহাদুর করুণা করে নিলাম-ইস্তাহার ছাপতে দেন, আর হাঁটাহাঁটি কান্নাকাটি করে কিছু বিজ্ঞাপন জোটায়, তাতেই কায়ক্লেশে কৃতান্ত-পঞ্চাননের খরচটা উঠে আসে।

ইলেকসনের সময় কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ যেন হঠাৎ। যে কথা পঞ্চানন বলল—হপ্তায় হপ্তায় নিয়মিত সংখ্যা তো বটেই, ওর ফাঁকে বিশেষ সংখ্যা বেরুচ্ছে ঘন ঘন। যার যা পাওনাগণ্ডা, সমস্ত মিটিয়ে দিল। বিশ্বের সর্বপ্রধান লেখক—লেখক তো দপ্তরি-কম্পোজিটার নয় যে টাকাপয়সার ব্যাপার থাকবে। কিন্তু কৃতান্তর কৃতজ্ঞতা আছে—এই কল্পতরুর দিনে তাঁর বইটা বের করে দিতে হবে। ভূতনাথ ওঁকে বোঝাল, 'ভারতে ইংরাজ' নামক যুগান্তকারী বই ছাপানোর কাগজটা আপনি দিয়ে দিন। সেকালে বিদ্যোৎসাহী ধনীরা কত কি করতেন—দেশের লোক মাথায় করে রাখত তাঁদের, চিরদিন নাম করত।

দেশের লোক নিয়ে ভূতনাথের কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই, ভোটার-গুলো শুধু পদতলে না থেঁতলায়। বিশেষ করে অম্বুজাক্ষ রায়ের মতন মানুষ যখন বিপক্ষে। টুঁ শব্দটি না করে ভূতনাথ টাকা বের করে দিলেন। কৃতান্তর কিছু বদনাম হল এই নিয়ে। মন্দ লোকে চোখ টিপে বলে, যুগচক্র দেখ কেমন মৌমাছি হয়ে আজ এ-ফুলে কাল ও-ফুলে মধু খেয়ে বেড়াচ্ছে। সোমবারের কাগজে অম্বুজাক্ষকে আকাশে তুলে ধরল। ঠিক তার তিন দিন পরে বিষ্যুৎবারের বিশেষ সংখ্যায়

লিখছে—'অম্বুজাক্ষ উত্তম বটেন, কিন্তু তাঁহার তুলনায় ভূতনাথ ঢেঁই বিত্তর দানশীল। উভয়ে পাশাপাশি দাঁড়াইলে খদ্যোত ও চাঁদের উপমা মনে আসিবে। অম্বুজাক্ষের, এমন কি, খদ্যোতের দীপ্তিটুকুও আছে কি না সন্দেহ।'

পরের সোমবারের মন্তব্য আরও কড়া—'অম্বুজাক্ষ রায় বাহাদুর কাশীশ্বর রায়ের পৌত্র। উক্ত কাশীশ্বর চিরজীবন ইংরাজের খয়ের-খাঁ রূপে দেশের অনিষ্ট সাধন ও নিজের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই দুষ্ট বংশের অম্বুজাক্ষ রায় কদাপি দেশবাসীর বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারেন না...'

কিন্তু এসব ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল? অম্বুজাক্ষ শুধু মুখের খাতিরেই কেল্লা ফতে করতে চান। ভোটের ব্যাপারে নগদ অর্থ ছাড়া নাকি অন্যায়—অপমানকর। এখন বুঝেছেন, কৃতান্ত বিশ্বাস ক্ষমতা ধরে কিনা। মুখে যা বলেছিল, কাজেও সে করল ঠিক তাই। ভূতনাথ হেন গোমূর্খের কাছে হেরে অম্বুজাক্ষ, মনে করা গিয়েছিল, সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে পর্বতে যাবেন। তা গতিকও বটে তাই। হিমালয়ে না হোক, ঘন ঘন গ্রামে গিয়ে থাকছেন ইদানীং। কি কাণ্ড! রোগির দল টাকা পকেটে নিয়ে এসে ফিরে যায়। পল্লী না জাগলে কিছুই হবে না—এমনি সব ভাল কথা সর্বদা অম্বুজাক্ষের মুখে। এতখানি পল্লীপ্রীতির মূলে কিছু না থেকে যায় না।

—তিন—

এ হেন প্রবলপ্রতাপ যুগচক্র যেখান থেকে বেরোয়, সেই জায়গা কিন্তু খুঁজে পাওয়া দায়। গলির গলি, তস্য গলি। এমন সঙ্কীর্ণ যে দুটো মানুষের পাশাপাশি চলতে কষ্ট হয়। গলির শেষপ্রান্তে দোতলা মাঠকোঠা। দরজার উপরে সাইনবোর্ড ঝোলানো। কিন্তু যে মানুষ সন্ধান করে করে এইখানে চলে এসেছে, সাইনবোর্ড তার কাছে বাহুল্য। রূপকথায় বলে সূতোশঙ্খ সাপ—শাঁখের নির্ঘোষ বেরোয় নাকি লিকলিকে সূতোর মতন এক জীবের কণ্ঠ থেকে। যুগচক্র-অফিসে গিয়ে বস্তুটার উত্তম আন্দাজ হয়।

নিচের তলায় ছাপাখানা, দোতলায় অফিস। অফিসের জিনিসপত্র নিচের তলায় নামিয়ে দিয়ে ঢালাও সতরঞ্চি পেতে ফরাস হয়েছে। এক পাশে খানকয়েক চেয়ার সাজিয়ে রেখেছে, যারা সাহেব পোশাকে আসবে তাদের যাতে অসুবিধা না হয়। মীটিং সাড়ে-আটটায় বসবার কথা—সাড়ে-ন'টা হতে চলল, লোক এসেছে গুটি দশেক ছেলে-মেয়ে। যুগচক্রে যাদের লেখা বেরোয়, অথবা লেখা ছাপানোর চেষ্টায় যারা উমেদারি করে। অথচ একশ'র বেশি চিঠি ছেড়েছে ভাল ভাল লোকের নামে। সভাপতি ভূতনাথকে সঙ্গে করে নিয়ে পঞ্চানন আসবে, তারাও তো এতক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছল না।

কৃতান্ত দমে নি। আহা, এই তো ঢের। বেশি লোক এসে পড়লে জায়গা দিতাম কোথায়? এ সমস্ত পাবলিক ব্যাপারে মোটা মোটা নাম দিতে হয়। তাদের নামই শুধু, কাজ করে অন্য লোকে। সেই কাজের লোক ক'টি এসে গেছ তোমরা, তবেই হল। বেশি

লোকে গরজ নেই, সভাপতি মশায় এসে পড়লেই আরম্ভ করে দেওয়া যায়।

আরও খানিক পরে পঞ্চানন এলো। একা। ভূতনাথের জন্য বসে বসে এত দেরি। এখন দূরের মানুষ ভূতনাথ। সকালবেলা বৈঠকখানা গমগম করে, বড় বড় কথা বলে ভূতনাথ সকলের মাঝখানে বসে। করমোজার ব্যাপার নিয়ে উদ্বেগ; বান্দুং কনফারেন্সের তথ্য; রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য, এই নিয়ে নানারকম টিপ্পনী। পৃথিবীতে সপ্তাশ্চর্য ছিল এতকাল, সেই লিস্টিতে আর একটি বাড়ল—ভূতনাথ গুঁইর মুখে সাহিত্য ও রাজনীতি। যাচ্ছি যাচ্ছি—করে এক ঘণ্টার উপর পঞ্চাননকে বসিয়ে রেখে শেষটা আর একজনের সঙ্গে করপোরেশনের কোন জরুরি কাজে বেরিয়ে গেল। মীটিঙের সাফল্য-কামনা জানিয়েছে; আর শুনুন—

কৃতান্তকে এক পাশে টেনে নিয়ে পঞ্চানন একটা পাঁচ টাকার নোট তার হাতে দিল। ভূতনাথের চাঁদা।

কৃতান্ত স্তম্ভিত হয়ে রইল, মুখে কথা ফোটে না।

পঞ্চানন বলে, কাউন্সিলার হয়ে অবধি বিস্তর জায়গায় দিতে হচ্ছে। এর বেশি হয়ে উঠবে না, বলে দিয়েছে।

কৃতান্ত আগুন হয়ে বলে, মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে আসতে পারলে না? পাঁচ টাকা দেবে তো ওর মতন আকাট মুখ্যুকে সভাপতি করতে যাবো কেন? বাংলাদেশে জ্ঞানী-গুণীর মন্বন্তর হয়েছে?

পঞ্চানন বিরস মুখে বলে, সভাই হচ্ছে না তার সভাপতি! ম্যাও ধরবে কে? ইনস্টিট্যুটের ভাড়া ধরো শ'খানেক। তার উপরে—

কৃতান্ত বলে, কাগজে যখন ছাপা হয়ে গেছে, সম্বর্ধনা হবেই। গুঁই বেটার ইলেকসন জিতিয়ে দিয়েছি কিনা—কলির ধর্ম। এক মায়ে

শীত চলে গেল, তাই ভেবেছে। যাকগে, যাকগে। প্রস্তাবগুলো পাশ করে এদের তো ছেড়ে দিই। পরে ভাবব।

একটুখানি গুম হয়ে থেকে এদিকে এলো: শুনছ হে, ভূতনাথ আসবে না। রক্ষে পেয়ে গেলাম। এসে তো হাঁদার মতো এক এক জবান ছাড়ত, সামলাতে প্রাণান্ত। বুঝতে পেরেছে—এ জায়গায় তোমাদের মাঝখানে জুত হবে না। সেই ভয়ে এলো না। কাউন্সিলার বলে নৈবেদ্যের উপর কাঁচকলার মতন নামটা রেখে দেওয়া—না এলো তো বয়ে গেল! কিন্তু সভাপতি চাই একজনকে আপাতত—

উপস্থিত সকলের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, বয়সে বড্ড কাঁচা। সভাপতির খানিকটা তো ওজনদার হতে হয়! তাই তো, তাই তো—

একটি মেয়ে খোশামুদি সুরে বলে, আপনি থাকতে সভাপতি আবার কে?

মেয়েটা যুগচক্রে কবিতা পাঠাচ্ছে কিছু দিন ধরে। তার দিকে চেয়ে কৃতান্ত ঘাড় নাড়ল: উঁহু, আমি যে হলাম সেক্রেটারি। পঞ্চাননই চালিয়ে দিক আজ—কি আর হবে! যাও হে, বসে পড়ো ঐ গদি-আঁটা চেয়ারে।

পঞ্চাননের পৌরোহিত্যে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হল—'ভারতে ইংরাজ' পুস্তকের লেখককে কলিকাতার যাবতীয় নাগরিকের পক্ষ থেকে অভিনন্দন দেওয়া হবে। মানপত্র-রচনা, অর্থ-সংগ্রহ, অভ্যর্থনা, প্রচার এবং উদ্যোগ-আয়োজন বাবদে পাঁচটা সাবকমিটি তৈরি হল। প্রোগ্রামেরও আলোচনা হল মোটামুটি। কি পরিমাণ চাঁদা ওঠে, তার ওপর সমস্ত নির্ভর করছে; সেজন্য পাকাপাকি হতে পারল না।

লোকে গরজ নেই, সভাপতি মশায় এসে পড়লেই আরম্ভ করে দেওয়া যায়।

আরও খানিক পরে পঞ্চানন এলো। একা। ভূতনাথের জন্ত বসে বসে এত দেরি। এখন দূরের মানুষ ভূতনাথ। সকালবেলা বৈঠকখানা গমগম করে, বড় বড় কথা বলে ভূতনাথ সকলের মাঝখানে বসে। ফয়মোজার ব্যাপার নিয়ে উদ্বেগ; বান্দুং কনফারেন্সের তথ্য; রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য, এই নিয়ে নানারকম টিপ্পনী। পৃথিবীতে সপ্তাশ্চর্য ছিল এতকাল, সেই লিস্টিতে আর একটি বাড়ল—ভূতনাথ গুঁইর মুখে সাহিত্য ও রাজনীতি। যাচ্ছি যাচ্ছি—করে এক ঘণ্টার উপর পঞ্চাননকে বসিয়ে রেখে শেষটা আর একজনের সঙ্গে করপোরেশনের কোন জরুরি কাজে বেরিয়ে গেল। মীটিঙের সাফল্য-কামনা জানিয়েছে; আর শুনুন—

কৃতান্তকে এক পাশে টেনে নিয়ে পঞ্চানন একটা পাঁচ টাকার নোট তার হাতে দিল। ভূতনাথের চাঁদা।

কৃতান্ত স্তম্ভিত হয়ে রইল, মুখে কথা ফোটে না।

পঞ্চানন বলে, কাউন্সিলার হয়ে অবধি বিস্তর জায়গায় দিতে হচ্ছে। এর বেশি হয়ে উঠবে না, বলে দিয়েছে।

কৃতান্ত আগুন হয়ে বলে, মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে আসতে পারলে না? পাঁচ টাকা দেবে তো ওর মতন আকাট মুখ্যুকে সভাপতি করতে যাবো কেন? বাংলাদেশে জ্ঞানী-গুণীর মন্বন্তর হয়েছে?

পঞ্চানন বিরস মুখে বলে, সভাই হচ্ছে না তার সভাপতি। ম্যাও ধরবে কে? ইনস্টিট্যুটের ভাড়া ধরো শ'খানেক। তার উপরে—

কৃতান্ত বলে, কাগজে যখন ছাপা হয়ে গেছে, সম্বর্ধনা হবেই। গুঁই বেটার ইলেকসন জিতিয়ে দিয়েছি কিনা—কত্তির ধর্ম। এক মায়ে

শীত চলে গেল, তাই ভেবেছে। যাকগে, যাকগে! প্রস্তাবগুলো পাশ করে এদের তো ছেড়ে দিই। পরে ভাবব।

একটুখানি গুম হয়ে থেকে এদিকে এলো: শুনছ হে, ভূতনাথ আসবে না। রক্ষে পেয়ে গেলাম। এসে তো হাঁদার মতো এক এক জবান ছাড়ত, সামলাতে প্রাণান্ত। বুঝতে পেরেছে—এ জায়গায় তোমাদের মাঝখানে জুত হবে না। সেই ভয়ে এলো না। কাউন্সিলার বলে নৈবেদ্যের উপর কাঁচকলার মতন নামটা রেখে দেওয়া—না এলো তো বয়ে গেল! কিন্তু সভাপতি চাই একজনকে আপাতত—

উপস্থিত সকলের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, বয়সে বড্ড কাঁচা। সভাপতির খানিকটা তো ওজনদার হতে হয়! তাই তো, তাই তো—

একটি মেয়ে খোশামুদি স্বরে বলে, আপনি থাকতে সভাপতি আবার কে?

মেয়েটা যুগচক্রে কবিতা পাঠাচ্ছে কিছু দিন ধরে। তার দিকে চেয়ে কৃতান্ত ঘাড় নাড়ল: উহু, আমি যে হলাম সেক্রেটারি। পঞ্চাননই চালিয়ে দিক আজ—কি আর হবে! যাও হে, বসে পড়ো ঐ গদি-আঁটা চেয়ারে।

পঞ্চাননের পৌরোহিত্যে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হল—'ভারতে ইংরাজ' পুস্তকের লেখককে কলিকাতার যাবতীয় নাগরিকের পক্ষ থেকে অভিনন্দন দেওয়া হবে। মানপত্র-রচনা, অর্থ-সংগ্রহ, অভ্যর্থনা, প্রচার এবং উদ্যোগ-আয়োজন বাবদে পাঁচটা সাবকমিটি তৈরি হল। প্রোগ্রামেরও আলোচনা হল মোটামুটি। কি পরিমাণ চাঁদা ওঠে, তার উপর সমস্ত নির্ভর করছে; সেজন্য পাকাপাকি হতে পারল না।

কৃতান্ত বলে, কাগজে কাগজে দিয়ে এসো পঞ্চানন, আজকের মীটিঙের খবরটা। কালই যাতে বেরিয়ে যায়। বিপুল জন-সমাবেশ বলে ছেড়ে দাও, গোণাগুণতির তালে যেও না।

দিন আষ্টেক পরে রাত্রিবেলা কৃতান্ত বিশ্বেশ্বরের বাড়ি এসে হাজির। রাস্তা থেকে যথানিয়মে চেঁচাচ্ছে, দাদা আছেন নাকি—ও দাদা।

ইরা ছাত থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, কে? রাস্তার আলোয় দেখে বলল, বাবা শুয়ে পড়েছেন কাকাবাবু। সর্দিকাশিতে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, জোরজার করে শুইয়ে দিইছি। দাঁড়ান, দরজা খুলে দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে খট করে খিল খোলার শব্দ। সরমা নিচের রান্নাঘরে, তিনি এসে খিল খুলে দিলেন। সামনে যান না, কিন্তু কৃতান্তর সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে কয়েক বার। ঢুকেই একটু চাতাল মতো জায়গা—গৌরবে বৈঠকখানা বলা যায়, লোকজন এলে এখানটায় বসে।

সরমা ঘরের ভিতরে—কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন। কৃতান্ত জমিয়ে বসে পড়ে বলে, শুনছেন বোধ হয়—দাদার সম্বর্ধনা হবে। কিন্তু বিষম এক ফ্যাসাদে পড়লাম বউদি, সেই পরামর্শের জন্য এসেছি।

সরমা প্রমাদ গুণলেন। কৃতান্তর আসা-যাওয়া আজকের নয়—কথার ভঙ্গিমায় বোঝা যাচ্ছে, একটা খরচের ঝুঁকি চাপাতে চায় তাঁদের উপর। এক কথায় কেটে দিয়ে বললেন, দরকার কি ঠাকুরপো ঐ সমস্ত হাঙ্গামায়?

কৃতান্ত শিউরে উঠল। কী বলেন বউদি! একটা মানুষ বাঁধা-আয়ের পথ ছেড়ে দিয়ে সংসারের ভালমন্দ না ভেবে দুস্তর সাহিত্যপথে এসে নামলেন—

সরমা বাধা দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, আপনাকে কি বলব ঠাকুরপো, কোন খবরটা আপনি না জানেন? সাত নয় পাঁচ নয়, একটা মেয়ে। পড়াশুনো করছিল, মনে মনে কত সাধ-আহ্লাদ, ভালো ঘর-বরে বিয়ে দেবো মেয়ের—পড়া ছেড়ে চাকরির ধান্দায় ঘুরছে সে এখন। দু'জায়গায় পড়িয়ে কিছু কিছু এনে দেয়, তবে সংসার চলে। ঝট করে চাকরি ছাড়াটা কি বুদ্ধির কাজ হয়েছে, আপনি বলুন।

ইরা ওদিকে বাপের মশারি গুঁজে দিয়ে দুমদুম করে সিঁড়ি ভেঙে এসে পড়ল। এসে সে মায়ের কথা লুফে নেয়।

কি বলছিলে মা, কোনটা বুদ্ধির কাজ হয় নি?

সরমা চুপ করে গেলেন। কত দিন এই নিয়ে মা-মেয়েয় কলহ—বাইরের লোকের সামনে সেটা আর হতে দিতে চান না। কিন্তু ছাড়বে ইরা! বলে, বুদ্ধির কাজ না হোক, মহত্বের কাজ। রামনিধি সরকারের নাতি। রামনিধি দিব্যি মোক্তারি করছিলেন, ঘাড়ের উপর ভূত চেপে তাঁকে কাঁসিকাঠে চড়িয়ে তবে ছাড়ল। নাতিও তেমনি—নির্ঝঞ্ঝাটের কেরানিগিরি ছেড়ে দিয়ে সকলের হেনস্থা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। এর আনন্দ তুমি বুঝবে না মা।

কৃতান্ত হাঁ-হাঁ করে ওঠে: এত বড় সম্বর্ধনা—এর মধ্যে হেনস্থার কথা মুখে আনছ কেমন করে? শোন, 'ভারতে ইংরাজ' যে পড়ছে, সেই তাজ্জব হয়ে যাচ্ছে। দলে দলে রোজ আসে আমার কাছে। কোন রকম কিছু না করলে দাদার ভক্তমণ্ডলী মেরেই শেষ করবে আমায়। সেইজন্তে এত ছুটোছুটি।

কৃতান্ত নিজেও তাজ্জব। কী মিথ্যেই বানাতে শিখেছে! দিকপালের চেয়ে একতিল কম নয়। এই একটু আগে হিসাব করে এলো, 'ভারতে ইংরাজ' একুনে সাতায় কপি বিক্রি হয়েছে। তার মধ্যে খানকয়েক অর্ধেক দামে গছিয়েছে জানাশুনা কয়েকটা লাইব্রেরিতে।

বলল, রোজ আসছে—মেয়ে-পুরুষ ছোঁড়া-বুড়ো নানান ধরনের ভক্ত। কি না, এ বই যিনি লিখেছেন তাঁকে চক্ষে দেখব। আমি বলি, দেখবে বই কি—দেখাবার তালেই আছি। তাঁকে নিয়ে একসঙ্গে আমোদআহ্লাদ করব, সেইদিন দেখো সকলে।

নেপথ্যবাসিনীর উদ্দেশে অনুনয় করে বলে, এত মানুষের সাধে বাদ সাধবেন না বউদি, করজোড়ে বলছি। শুনবই না আমরা।

ইরা বলে, সম্বর্ধনার জায়গা ঠিক হল কাকাবাবু? কার্ড ছাপিয়েছেন?

কৃতান্ত বিশুষ্ক মুখে বলে, সেই তো মুশকিল হচ্ছে মা। আচ্ছা, দেশের যাবতীয় বড়লোকের জন্ম কি ঐ আষাঢ়ে? আর বারোই আষাঢ় দৈবাৎ রবিবার পড়ায় ঠেলেঠুলে সমস্ত ঐ তারিখে এনে জুটিয়েছে। য়্যুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট ভাড়া হয়ে গেছে। আরও চার-পাঁচটা হলের খবর নিলাম, সব জায়গায় এক অবস্থা। অথচ বারোই হতেই হবে, যুগচক্রে বেরিয়ে গেছে। আমাদের অফিসের দোতলার কথা তুলেছিলাম একবার—তা ভক্তেরা রে-রে করে উঠল।

মনে মনে হাসে কৃতান্ত। আচ্ছা জমানো গেছে যা হোক। ভূতনাথের কাছে বিস্তর প্রত্যাশা ছিল—তার তো ঐ গতিক। আর, এ বাজারে জনে জনের হাতে-পায়ে ধরেও খুচরো চাঁদা তিরিশ-চল্লিশের বেশি উঠবে না। বড় হলের আশা ছেড়ে দিয়েছে অতএব। আর একদিক দিয়েও ভাবছে। দেদার লিখে যাচ্ছেন শ্রীবঙ্ক বিশ্বেশ্বর—

কিন্তু লেখেন ইতিহাস, গল্প-উপন্যাস নয়—লেখক বিশ্বেশ্বরের নাম লোকে অতি সামান্য জানে। গড়ের মাঠের মতো এক হল ভাড়া করে শেষটা তার মধ্যে দেখ, গোটাকয়েক লোক টিমটিম করছে। সে এক বিতিকিচ্ছি ব্যাপার। যুগচক্র-অফিসে করাও বিপজ্জনক। চল্লিশ টাকা যদি চাঁদা ওঠে—তার মধ্যে দরজায় ঘট পাতো, ফুলের মালা কেনো, অতিথিসজ্জনদের চা-সিগারেট খাওয়াও—কত দিকের কত খরচ! পঞ্চাননটা আড় হয়ে পড়েছে—এই বইয়ের দরুন প্রেসের হিসাবে এক গাদা পাওনা হয়ে আছে, দপ্তরি এসে দু-বেলা তাগাদা করছে, তার উপরে নতুন ঝক্কি কিছুতে সে করতে দেবে না।

বলে, সকলে বলছে কি জানেন বউদি—গঙ্গার ধারা দেখেই সুখ হয় না, গঙ্গোত্রীও দেখব। দাদার লেখার উদগম যে পুণ্যস্থান থেকে। তা বললেই অমনি তো হুট করে ঘর-গেরস্থালির মধ্যে নিয়ে আসা যায় না! মানুষ বলুন বাড়ি বলুন—সাজগোজ করে পটের ছবি হয়ে একদিন-দুদিন থাকা চলে। বারোমাস তিরিশদিন খুশি-মাফিক ভক্তেরা সব আসা-যাওয়া করবেন, তাই হয় কখনো? সেজন্যে মতলব খাটিয়েছি—একদিনে, তা-ও নয়, একটা বেলায় ঝামেলা চুকিয়ে দেবো। সভা-টভা কি আর—জন্মদিনটা উপলক্ষ করে দাদাকে ঘিরে সকলে মিলে ওঁর তপোবনের আওতায় বসা।

দোতলার ঘরখানায় বিশ্বেশ্বরের লেখাপড়া ও শোওয়া-বসা; তার নাম তপোবন। নামকরণ কৃতান্তর। বাপের ঘর সম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত সতর্কতায় নামটা বাড়ির মধ্যেও চালু হয়ে গেছে। এমন কি সরমাও বলে ফেলেন কখনো-সখনো। কৃতান্তর কথায় সরমার বজ্রাঘাত হল যেন। কী সর্বনাশ করেছেন উনি এই লেখালেখির তালে গিয়ে! সিকি পয়সার মুনাফা নেই, উল্টে এখন এই বাড়ি বয়ে হামলা। আর কৃতান্ত যা-ই বলুক, ভক্তের আনাগোনা চলল এখন একনাগাড়।

একদিনে রেহাই দেবে না। শহরই ছাড়তে না হয় শেষ পর্যন্ত! যা গতিক না ছেড়ে উপায় নেই। গাঁয়ের বাড়িতে বছরের ধানটা হয় তো পাওয়া যাবে, এখানে কি ইট কামড়ে পড়ে থাকবেন? চলে যাওয়া উচিত ছিল অনেক আগে, কিন্তু বাপে-মেয়ের আড় হয়ে পড়ল —একা সরমার কি সাধ্য আছে? বাপ যাবেন না লাইব্রেরি ছেড়ে; আর মেয়েরও বাবার মন্ত্রে মত—'হাঁ' বলে বসে আছে বিশ্বেশ্বরের মুখ খুলবার আগেই। কোমর বেঁধে তাই চাকরির জোগাড়ে লেগে গেছে। মাস মাস ট্যুইশানির টাকা হাতে এনে দিচ্ছে—মেয়ে তো লাটসাহেব এখন।

হলও তাই। আগ বাড়িয়ে ইরা বলে ওঠে, বাবার জন্মদিনে আমরাই সকলকে নেমন্তন্ন করব কাকাবাবু। একটা মুশকিল শুধু, এই পায়রার খোপের মতো বাড়ি—

কৃতান্ত বলে, তাতে কি হয়েছে! হাটের হাততালি দাদা কখনো চান নি, হাটুরে লোক একটাকেও আনছিনে। যারা খাঁটি ভক্ত, আর ইতিহাস-রসিক—

হেসে বলে, সে-ও অবশ্য নেহাৎ কম যায় না। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। তবে অত্যন্ত বেছেগুছে চিঠি পাঠাব।

ইরা বলে, তাই তো বলছি। এনে তাদের বসতে দেবেন কোথায়?

ছাতের উপরে। পাশেই দাদার তপোবন—তাদের কাছে তীর্থস্থানের সামিল। বড্ড খুশি হবে সকলে। ধন্য হয়ে যাবে।

সরমা শেষ চেষ্টা করেন: বর্ষাকালে বৃষ্টি তো হবেই। তখন?

কৃতান্ত হাসতে হাসতে বলে, পাগলা হাতী হয়ে গিয়ে দাদার তপোবন তছনছ করব, সেই ভয় করেছেন বুঝি বউদি? বৃষ্টি হলে যাবে সব চিলেকোঠায়, যাবে সিঁড়িতে। নয় তো ভিজবে যেখানে হোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আমাদের অফিসে দুটো ত্রিপল আছে, তাই না হয় পাঠিয়ে

দেব। অত ভাবনাচিন্তা করতে হবে না বউদি। তারা সব আপন বলেই বাড়িতে আনতে পারছি। হৈ হৈ-ওয়ালা হলে তুলতাম নিয়ে কোন পাবলিক-হলে।

কথাবার্তা শেষ করে কৃতান্ত উঠল। আবার একটা কথা মনে পড়ায় মুখ ফিরিয়ে বলে, সকলকে চা দেওয়া হবে, সে ভার সম্বর্ধনা-কমিটী নিয়েছে। তোমায় সেইগুলোর বিলিব্যবস্থা করে দিতে হবে ইরা-মা।

ইরাবতী রাগ করে: আমাদের বাড়ির অতিথিদের কমিটী খরচপত্র করে চা খাওয়াবেন—আমাদের কি রকমটা মনে হবে বলুন তো?

কৃতান্ত বলে, আমাদেরও মনে লাগে মা, তুমি যদি অমন আমরা-আমরা করো। যেন তোমরাই সব, আমরা একেবারে কিছু নই। যে দু-চার টাকা খরচ, যার সুবিধা হয় করুক না! কাজটা ভাল ভাবে হয়ে গেলে হল। এমনি তো দাদা বিস্তর দিচ্ছেন দেশকে। তার উপরে নগদ খরচপত্রের দায়টা আর চাপাতে চাইনে।

ইরা বলে, খরচপত্র বাবার টাকায় হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বাইরে থেকে আয়োজন করে এনে খাওয়াবেন, এটা বড্ড বিশ্রী দেখাবে কাকাবাবু।

কৃতান্ত হেসে ফেলল।

তা বটে! তুমিও যে টাকার লোক হয়েছ, সেটা ভুলে গিয়েছিলাম। তা বেশ—বাপের জন্মদিনে মেয়ে খাওয়াবে, এতে আর কোন মুখে 'না' বলি?

তোফা হল। পঞ্চানন ঘাবড়ে যাচ্ছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন দিকেই আর সিকি পয়সার দায় রইল না। কেবল এখন লোক জুটিয়ে আনা। ছাতটুকু তো ভরাট হওয়ার দরকার। নেহাৎ পক্ষে জন

পঞ্চাশ না হলে খবরের কাগজেই বা মহতী সভা বলে রিপোর্ট ছাড়া যাবে কেমন করে?

কৃতান্ত বলল, জায়গার পাকাপাকি না হওয়ায় এদ্দিন নেমন্তন্নের চিঠি ছাপতে দিতে পারি নি। কালকের মধ্যে ছেপে ফেলছি। তোমায় খান দশেক দিয়ে যাব, আপন-জনদের দিও।

আপন-জনদের উপর ইরাবতীর বিতৃষ্ণা। বিশ্বেশ্বরকে কেউ বলে পাগল; কেউ বা ঠাট্টা করে, এঁটোপাতের ধোঁয়ার স্বর্গে যাবার শখ! বয়ে গেছে সেই সব আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে বাড়ি ডেকে আনতে। আবার ভাবে, আনাই তো উচিত। এসে দেখে যাক তার বাপের খাতিরটা—দেখে হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরুক।

আত্মীয় না হোক—বাইরের মানুষ, ইতিহাসের সেই অতি-মনোযোগী পড়ুয়াকে তো দিতেই হবে একখানা চিঠি। শাড়িটা পরের দিন পৌঁছে দেবার কথা—তা যে রকম এগজামিনের তাড়া দেখে আসা গেল, তার মধ্যে সম্ভবত সামান্য বস্তুটা স্মরণ নেই। শুধু শাড়ির তাগাদায় যেতে লজ্জা করে। নিমন্ত্রণ করতে সেখানে গিয়ে হঠাৎ যেন শাড়ির কথা মনে পড়ে যাবে। নইলে অরুণাক্ষ যা মানুষ—কোনদিন শাড়িটা ফিরে পাবে না।

এ ব্যাপারেও পঞ্চানন কিন্তু খুশি নয়। কৃতান্তকে বলে, ঠিক হল না। মেয়েটা বাড়ি বাড়ি পড়িয়ে সংসার-খরচ জোটায়—বারো ভূত ডেকে তার টাকায় খাওয়ানো, এ পাপ আমাদেরও অর্শাবে।

কৃতান্ত কিছু বিরক্ত হয়ে বলে, আমাদের খরচ করতে দেবে না—অবিশ্যি, পাব কোথায় যে খরচ করব? চাঁদার ঐ অবস্থা। একটা কিছু করা তো চাই—'ভারতে ইংরেজ' শুধু উই-ইঁদুরের মুখে

কাটালে চলবে না। বাতলাও তবে অন্য-কিছু। অন্য কোন ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলো।

পঞ্চাননও আর কিছু ভেবে পায় না। তখন বলে, বই যদি বিক্রি হয়, ওঁদের খরচের টাকাটা দিয়ে দিতে হবে কিন্তু।

কৃতান্ত চোখ পিটপিট করে বলে, ব্যাপার কি হে? ছাপাখানার পাওনা আর দপ্তরির বিল শোধ হওয়ার আগে দেবে, না পরে?

বই তো বিক্রি হোক, সেই সময় বিবেচনা করে দেখা যাবে। আপাতত এক জরুরি দায়, জন পঞ্চাশ মানুষ সভাক্ষেত্রে এনে জোটানো। নিমন্ত্রণ-চিঠি ডাকে পাঠিয়ে ভরসা হয় না, চাঁদা আদায়ের চেষ্টায় গিয়ে বোঝা গেছে কি কঠিন ব্যাপার! ইতিহাসের মহামূল্য গবেষণা—লোকে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে আহা-ওহো করে উঠবে, কিন্তু আর-কিছু কানে নেবে না। কার গরজ পড়েছে ডাকের চিঠি পেয়ে গলিঘুজি খুঁজে খুঁজে সম্বর্ধনায় হাজির হতে যাবে।

কিছু চিঠি দিয়ে দিল পঞ্চাননকে। আর কৃতান্ত সম্পাদক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে চিঠি নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কী আশ্চর্য, নিজের পাড়াটার মধ্যেও যে চেনে না বিশ্বেশ্বরকে! বয়স্ক মানুষ একজন রোয়াকে উবু হয়ে বসে বিড়ি ফুকছিলেন, চিঠির এপিঠ-ওপিঠ উলটে আদ্যন্ত পড়ে বললেন, গলিটা তো আমাদেরই। সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বর সরকার—চুনোপুকুরে সুপ্রসিদ্ধ লেখক কে মরতে আসবে? বাজে ভাঁওতা মশায়—

কৃতান্ত ঘাড় নেড়ে বলে, সত্যিই আছেন। সাতাশ নম্বরের বাড়ি। আপনারা জানেন না।

সামনের বাড়ির দরজায় এক ছোকরা ওজন কম হওয়ায় আলু-ওয়ালার সঙ্গে বচসা বাধিয়েছে। তাকে ডেকে বুড়া বললেন, শোন্—শোন্ রে পটলা, মজার কথা। জঙ্গল কেটে বসতি পাতলেদের—ইস্তক

ট্যাংরার খাল নখদর্পণে—গলির মধ্যে লেখক এসে ঝাপটি মেরে রয়েছে, আর আমি নাকি কিছু জানিনে !

পটলা নামধেয় ছোকরাটিকেও কৃতান্ত চিঠি দিল। পটলা প্রণিধান করে বলে, দিনকাল খারাপ জেঠামশাই। লোকনাথ ব্যাকরণরত্ন সেদিন দেখলাম দুয়োর দিয়ে বসে বসে ঠোঙা বানাচ্ছেন। পেটের দায়ে মানুষে হাড়িবৃত্তি চেড়িবৃত্তি করছে, আমরা তার ক'টা খবর রাখি ? তা হতেও পারে লেখক—

বুড়া বলেন, পাড়ায় সুপ্রসিদ্ধ লেখক—বেপাড়ার মানুষ সম্বর্ধনা করতে আসছে, না-রাম না-গঙ্গা আমরা কিছু জানলাম না ?

কপালের রগ টিপে ভাবতে লাগলেন।

সাতাশ নম্বর—তার মানে হলগে মন্দিরের ডাইনে ভীম ঘোষের গোয়ালবাড়ি ছিল যেটা। হয়েছে, হয়েছে রে পটলা—আমাদের বিশুবাবু। কালেকটরেটে ডেসপ্যাচ-ক্লার্ক ছিলেন—চাকরি ছেড়ে ভেবেছিলাম হরিনাম করছেন। তলে তলে তিনি আবার লেখক হয়ে গেছেন, সভা বসছে তাঁকে নিয়ে—কালে কালে কতই বা দেখব !

পটলার ভারি স্ফূর্তি—তুড়িলাফ দেয় আর কি ! বলে কত জায়গার কত ভাল ভাল মানুষের পদধূলি পাড়ার মধ্যে পড়বে, বুক ফুলে উঠছে আমার। নির্ভাবনায় চলে যান, আমরা ঠিক যাব।

হেসে বলে, এসব ব্যাপারে তো লেজুড় স্বরূপ—আপনিও যাবেন জেঠামশায়, সভা-টভা করে দিব্যি ঢেকুর তুলতে তুলতে ফেরা যাবে।

ছাত ভরে যাবে, কৃতান্ত এখন নিঃসন্দেহ। ভরে গিয়ে এমন কি উছলেও পড়তে পারে। যা হয় হোকগে—ঐ যে লেজুড়ের কথা বলল, সে ভার পুরোপুরি ইরা নিয়েছে। জনসংখ্যার নিখুঁত হিসাবে কি গরজ তবে আর ?

ইরাবতীও ঘুরছে ক'খানা চিঠি নিয়ে। চিঠি নিয়ে সেদিনের সেই থামওয়ালা বাড়ির দরজায় ঘা দিল। ভিতরে মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া যায়। ধাক্কাধাক্কিতে খুলল অবশেষে দরজা। হরিহর ঘর-পরিষ্কারে লেগে গেছে। ধুলোয় ভূত। খাটাখাটনিতে বুড়োমানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তার উপরে এই কাজের ভণ্ডুল। ইরাবতীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে সে বলে, নেই—মফস্বলে চলে গেছেন।

কলকাতা শহরেই নেই? তবে আর কি হবে!

বলে ফিরে যাচ্ছিল ইরা। হরিহর বলে, নাম-ঠিকানা লিখে রেখে যাও, সকলে লিখছে।

নাম লিখতে হবে না। চিঠিটা দিও, তাহলেই হবে।

হরিহর বলে, নাম লিখে যাও—নইলে ফিরে এসে আমার উপরে রাগ করবেন। যত লোক আসছে, সবাই লিখে লিখে যায়। নতুন লোক যদি হও, কি রোগে ভুগছ সেটাও লেখো।

রোগ? হরিহর খাতা এগিয়ে দিয়েছে। বিস্তর নাম, কারো কারো নামের পাশে রোগের লক্ষণ। তখন মালুম হল।

ইরা বলে, আমি রোগি নই। ডাক্তারবাবু নয়, অরুণাক্ষবাবুকে চাই আমি। ডাক্তারবাবুর ছেলে।

ভবানীপুর চলে গেল যে এই এখুনি। ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছিল; তিনি নেই তো ছোটবাবুই গেল।

ইরা বলে, ছোটবাবুও চিকিচ্ছে করেন নাকি?

হরিহর বলে, যেখানে যাবে সেইখানে বুঝি চিকিচ্ছে? কী এক বৈঠক হচ্ছে, সেখানে গেল।

ইরা জমিয়ে বসে পড়ল। বলে, তুমি হরিহর? দেখেই চিনতে পেরেছি।

হরিহর ইরার আপাদমস্তক তাকিয়ে ঘাড় নাড়ে, আমি তো কই তোমায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

দেখি নি আমিও। না দেখেও চিনি। আর একদিন এসে পড়েছিলাম, তুমি ছিলে না। অরুণাক্ষবাবু ভীষণ প্রশংসা করছিলেন, তোমার মতন মানুষ নাকি হয় না।

হরিহর গলে গিয়ে বলে, অনেক কালের লোক আমি কিনা! দাদাবাবুকে প্রায় তো হাতে ধরে মানুষ করলাম।

তাই বলো, সেইজন্যে অমন করে বলছিলেন।

শাড়ির কথাটা তুলবে নাকি এইবার? ঝাঁট দিয়ে দিয়ে হরিহর ঝুড়িতে আবর্জনা ভরেছে, তার ভিতর থেকে একটা খাতা তুলে নিয়ে ইরা বলে, কলেজের প্রফেসররা নোট দিয়েছে—এ জিনিস ঝুড়ির মধ্যে কেন হরিহর?

হরিহর বলে, দরকারি নাকি? আমি তা জানব কি করে? তাকের নিচে জঞ্জালের মধ্যে আণ্ডিল হয়ে পড়েছিল, উনুনে দেবো বলে নিয়ে যাচ্ছি।

ইরা হেসে ওঠে, দিলে অবশ্য তোমার ছোটবাবু বেঁচে যান। পড়াশুনোর দায় থাকে না।

হরিহরের অভিমানে লাগে: উহু, সে কথাটি বলতে পারবে না। টপাটপ পাশ করে যায় দাদাবাবু, কক্ষণো ফেল হয় নি। বড্ড ভাল ছেলে দাদাবাবু, বিস্তর গুণ—

ইরা বলে, কেবল এই যা একটু অগোছালো।

হরিহর সায় দেয়, হ্যাঁ—

ঘরের চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করে ইরা বলল, ভেন্টিলেটারে চড়ুইয়ের বাসা, দেয়ালে মাকড়শার জাল, আলমারির পিছনে আরশুলা গোঁফ বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে—দিব্যি এক চিড়িয়াখানা বানিয়ে আছেন

তোমার দাদাবাবু। আর ঐ খবরের কাগজের পাহাড়—ওর মধ্যে বাঘ লুকিয়ে আছে কি না কে জানে ?

হরিহর সহজভাবে বলে, হাঁা, ঘরের মধ্যে বুঝি বাঘ থাকে ? নেংটি-ইঁদুর।

ইরা বলে, তুমি আছ হরিহর, তাই। নয় তো ইঁদুর-আরশুলা-মাকড়শায় খুবলে খুবলে তোমার বাবুকে খেয়ে ফেলত।

হরিহর পরম প্রীত হয়ে নালিশ জানায়, দেখ তাই। হুকুম হয়ে গেল, বাবা-মা কবে এসে পড়েন, হরিহর, নিচের ঘরগুলো অন্তত সাফসাফাই করে ফেল। তুমি বলো দিদি, রাবণ রাজার বিশখানা হাত হলেও তো একটা দিনের মধ্যে এত সমস্ত হয় না।

ইরা বলে, আমি একটু করে দিই—

বলেই ঝুলঝাড়া তুলে নিয়ে মাকড়শার জাল ভাঙতে লাগল। হরিহর হাঁ-হাঁ করে ওঠে: তুমি কেন গো, তোমায় কে করতে বলছে ? আমিই পারব।

ইরা বলে, না হয় দিলাম করে একটুখানি। মেয়েদের কাজই এই। তুমি তো জানো না হরিহর-দা কোনটা দরকারি, কোনটা বেদরকারি। অমন করো কেন, এই একটু-আধটু তোমার কাজ এগিয়ে দিলে ক্ষয়ে যাব না।

হরিহর হাঁ-হাঁ করে, জোর করে আর তেমন আপত্তি করে না।

ইরা বলল, সেই যে আর একদিন এসেছিলাম, কাদামাখা শাড়ি ফেলে গিয়েছিলাম সেদিন। দাও দিকি সেটা, নিয়ে যাই।

হরিহর বলে, সে বুঝি তোমার শাড়ি ? দাদাবাবুর কাণ্ড—বইপত্তোরের গাদার মধ্যে রেখে দিয়েছিল। মায়ের শাড়ি ভেবে কাল আমি ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।

ঘ্যাস করে রাস্তার উপরে ট্যাক্সি থামল। হুড়মুড় করে ছুটে এলো এক মেয়ে—মাজাঘসা ঝকঝকে মুখ, চটকদার পোশাক। ইরার হাতে ঝাঁটা, আঁচল কোমরে বাঁধা—সেই অবস্থায় মুখোমুখি পড়ে গেছে।

ইরাকে বলে, ডাক্তারবাবু ফেরেন নি এখনো?

ইরা ঘাড় নাড়ে।

কী মুশকিল! অরুণবাবু কোথায়? তিনিও বাড়ি নেই?

ইরা হতভম্ব হয়ে ঘাড় নাড়ল। ঝি ভেবে বসেছে, এ অবস্থায় তা ছাড়া অন্য কি ভাববে? ছি-ছি, কী লজ্জার কথা! স্বল্প-পরিচিত পরের বাড়ি এসে ঝাঁটা ধরতে গেল সে কোন বিবেচনায়? এই এক রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে—নোংরা কোন-কিছু দেখলে গা শিরশির করে, তখন আপনপর জ্ঞান থাকে না।

অরুণবাবু এলে বলবে যে সুনন্দা এসেছিল। অতি অবশ্য একবার যেতে বলবে। রবিবার রাত্রে খাবেন আমাদের বাড়ি। মনে থাকবে তো?

হরিহর এগিয়ে এসে বলল, ভবানীপুরে তোমার মেসোমশায়ের বাড়ি গেছে। কী নাকি বৈঠক সেখানে। দাঁড়িয়ে কেন গো, বোসো দিদিমণি ভাল হয়ে।

ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। মেসোমশায়ের বাড়ি যাই তবে। সেখানে গিয়ে ধরব।

সেন্টের গন্ধে ঘর মাতিয়ে সুনন্দা গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল।

হরিহর বলে, দাদাবাবুর সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে ঐ মেয়ের। ওর বাপের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর ছেলেবেলার জানাশোনা। চিকিচ্ছের জন্য কলকতায় এসে এখন মেয়ে গছাবার তালে আছেন।

ইরা বলে, মেয়ে তো ভালই—

মা'র অপছন্দ। রং চড়া হলে হবে কি—নাক থ্যাবড়া, চীনেদের মতন। হয়ে যাবে তবু, ডাক্তারবাবুর ভারি ঝোঁক।

—চার—

দোতলায় একখানা মাত্র ঘর—যার নাম হয়েছে তপোবন। বাকিটুকু ছাত। আর সিঁড়ির মাথায় সঙ্কীর্ণ চিলেকোঠা। তপোবনের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের শোওয়া-বসা লেখাপড়া সমস্ত। পুরানো ছবি দু-চারখানা ঝুলছে দেয়ালে—আর বই-কাগজ, পত্র-পত্রিকা। হীরা-মাণিক লোকে অত যত্ন করে রাখে না। বইয়ের উপর বই সাজিয়ে প্রায় ছাত সমান উঠে গেছে। মেজের উপরেও বই। তার মাঝ-খানে মাদুরের উপর হাত দুয়েক জায়গা নিয়ে বিশ্বেশ্বর কাজ করেন। রাত্রিবেলা গুটিশুটি হয়ে শোনও ঐ জায়গায়। ডাকাত ইরা শোনে না—ঝগড়াঝাটি করে এদিক-ওদিকের আর দু-পাঁচখানা বই সরিয়ে দিয়ে ঐখানেই একটু মশারি খাটায়।

ছাতের উপরে সম্বর্ধনার জোগাড় হচ্ছে। যুগচক্র লেখক-গোষ্ঠীর কয়েকটা ছেলেমেয়ে আগেভাগে এসে সতরঞ্চি পেতে ফেলেছে। একপাশে নিচু তক্তাপোশ পেতে তার উপরে বালিশ ও ভেলভেটের তাকিয়া সাজিয়ে হয়েছে বিশ্বেশ্বরের বসবার বেদি। একটু চাঁদোয়াও খাটিয়েছে ঐখানটায় মাথার উপরে। নগ্ন নিরাবরণ আকাশের নিচে আজকের দিনে মাননীয় অতিথিকে বসানো যায় না।

আর কি কি করতে হবে, মেয়ে ক'টি ইরার কাছে জিজ্ঞাসা করল। ইরা হেসে বলে, কিছু নয় ভাই। অনেক খেটেছ। সভা-শোভন করবে এবার সতরঞ্চিতে বসে বসে। আর যা করতে হয় আমিই পারব।

তার বাবার জন্য বাইরে থেকে এসে এত করছে—ইরার ইচ্ছে করে, এদের বুকে জড়িয়ে ধরে, এদের কাঁধের উপর তুলে নাচায়। এদের মতো আপন মানুষ কে আছে কলকাতা শহরে!

বলে, হারমোনিয়ম নিয়ে তুমি বরঞ্চ একটা গান ধরো মাধুরী, মানুষ-জন জমে ওঠবার আগে। যেটা দিয়ে সভার শুরু হবে, সেটা নয়—অন্য একটা। খাবার গোছাতে গোছাতে আমি চিলেকোঠায় বসে শুনব।

কৃতান্ত যতদূর ভয় পেয়েছিল, তা নয়। ছাত একরকম ভরতি। পাড়ার অনেকেই এসেছেন। অরুণাক্ষ এসেছে। সেই যে দীপক আর পরিতোষ চৌদ্দ আনা চাঁদা দিয়ে কৃতার্থ করেছিল, তাদেরও দেখা যাচ্ছে। দীপক আবার অরুণের সহপাঠী। চুপি চুপি সে জিজ্ঞাসা করে, তুমিও খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলে?

অরুণাক্ষ বুঝতে পারে না।

চাঁদা কত খসাল?

অরুণ বলে এক পয়সাও না। আমার কাছে কেউ কিছু চায় নি। হঠাৎ এক নিমন্ত্রণের চিঠি। তা ভাবলাম, দেখেই আসি ব্যাপারটা কি।

হরেক মজা। টিকিট করেও এমনটা পাবে না। আমাদের অবশ্য টিকিট আছে—চাঁদার রসিদ। তোমার ফ্রী-পাস।

যা গতিক, শেষ অবধি হয়তো নিমন্ত্রণের জায়গা দেওয়াই মুশকিল হয়ে উঠবে। তপোবনের দরজা ভেজানো। কৃতান্ত দরজায় টোকা দিল। সাড়া নেই। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে অবাক। দেয়াল-টুকুর বাইরে এতবড় ব্যাপার, আর কোন লোকে উনি এখনো! লিখছেন, তদগত হয়ে লিখেই যাচ্ছেন। সে এমন অবস্থা, কৃতান্ত হেন কাজের মানুষ মিনিটখানেক থমকে দাঁড়িয়ে দেখে।

মৃদুস্বরে ডাকল, দাদা! সবাই এসে গেছেন দাদা, উঠতে হয় এবারে।

বিশ্বেশ্বর কৃতান্তর দিকে মুখ তুলে তাকালেন। এখনো অতীতের রাজ্যে—কৃতান্ত কি বলছে, বুঝতে পারছেন না ভাল করে। তার পরে যেন চটকা ভেঙে বলে উঠলেন, ও—হ্যাঁ তাই তো! চলো—

সশব্দে খাতা বন্ধ করলেন। তবু কিন্তু ওঠেন না। বললেন, বুঝলে কৃতান্ত, এক মোক্ষম অবস্থায় এসে পড়েছি। লালদীঘির উত্তর-পূব কোণে গির্জেটা আছে না—আরে, তোমাদের রাইটার্স-বিল্ডিঙসের পূব দিকটায় গো—ওখানে ধুন্ধুমার লড়াই বেধে গেছে। নবাবের সৈন্য তুলো-ধোনা করছে ক্লেটনের দলটাকে।

কৃতান্ত একটু হেসে বলে, করুক তুলো-খোনা। তাড়িয়ে সবসুদ্ধ গঙ্গার গর্ভে ডুবোতে পারে তো আরো ভাল—পলাশির ঝামেলাটা আর হয় না। তা চলতে থাকুক ওদিকে। এর মধ্যে সম্বর্ধনার কাজটুকু চুকিয়ে আসুন। ঘণ্টা দুই-তিন পরে আবার এসে জমবেন। লোকে হা-পিত্যেশ বসে আছে, আপনি চলে আসুন।

একটু ঝাঁজও আছে শেষ দিককার কথায়। বেকুব হয়ে—তা বটে!—করতে করতে বিশ্বেশ্বর উঠলেন। কৃতান্ত বলে, একি, এই ময়লা ধুতি-ফতুয়া পরে যাবেন কি রকম?

বিশ্বেশ্বরও রাগ করে বলেন, মেয়েটার কাণ্ড দেখ! তুমি বললে বলে কৃতান্ত, নয় তো এই বেশে গিয়ে বসতে হত। ওরে ইরা—

ইরা সাড়া দেয় চিলেকোঠা থেকে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই যেন পাখি হয়ে উড়ে এসে ঘরে ঢুকল।

কি বাবা?

দেখ্ দিকি, আজকের দিনে কী জামা-কাপড় পরে আছি আমি!

এই যে গরদের জোড় রেখে গিয়েছি। পরতে বললাম, তুমি কানে নিলে না। তোমায় তো বিশ্বাস নেই বাবা, লিখতে লিখতে

হয়তো বা দোয়াতের কালি ঢেলে বসবে কাপড়ের উপর। তাই ভাবলাম, দেরি আছে যখন, সাত সকালে সেজেগুজে বসে থেকে কি হবে?

বিশ্বেশ্বর বকে ওঠেন, দেরি কিসের, দেরি আর নেই। এতগুলো মানুষ হা-পিত্যেশ বসে রয়েছে। কোন দিকে যদি একটু হুঁশ থাকে তোর!

কৃতান্ত ইরার দিক হয়ে তাড়াতাড়ি বলে, সে কি, অমন কথা কক্ষণো বলবেন না দাদা। মা আমাদের দু-খানা হাতে দশ-হাতের খাটুনি খাটছে, দুটো চোখ দশ দিকের খবরাখবর করছে।

ইরা হেসে বলে, না কাকাবাবু, আমারই দোষ—বাবা ঠিক বলেছেন। বসে বসে খাবার সাজাচ্ছিলাম, এদিককার খেয়াল ছিল না। আচ্ছা দশটা মিনিট সময় দেন, সমস্ত গোছগাছ করা আছে—আপনি গিয়ে বসুনগে, বাবাকে নিয়ে আমি যাচ্ছি।

ইরার দিকে চেয়ে কৃতান্ত বলে, তুমিই বা কি সাজে রয়েছ। যেমন বাবা, তেমনি মেয়ে! রান্নাবান্না করছিলে বুঝি?

কি বলেন, রান্নাঘর হল মায়ের এলাকা। এক মিনিট উনুনের দখল ছাড়বেন তিনি!

রান্না নয়, ঝি কিশোরীবালা একা কত সামলাবে? একবার গিয়ে ইরা ইতিমধ্যে খানিকটা হলুদ বেটে দিয়ে এসেছে। আঁচলময় সেই হলুদের দাগ। কোথায় যে নেই আজকের দিনে ইরাবতী! যে দিকে অকুলান, ছুটে গিয়ে সে পড়ছে। আর হাসি ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে বাড়িময়। কোঁচানো গরদের ধুতি হাতে নিয়ে এসে বলে, পরে ফেল বাবা। কোঁচাটা আগে মুঠো করে ধরো, ছড়িয়ে না যায়।

কৃতান্ত বলে, মা যেমন-যেমন বলে, ভাল ছেলে হয়ে মুখ বুঁজে করে যান দাদা। মায়ের মতন কে পারবে? তা নিজের

দিকেও একটু কিন্তু নজর দিও। মা বটে আমাদের সকলের—তা বলে 'আন্তিকালের বদ্যিবুড়ি, মাথায় শনের নুড়ি, বয়সে সাড়ে-চার কুড়ি' তো নও!

কপালে চন্দনের ফোঁটা, পরনে গরদের জোড়। সাজিয়ে-গুজিয়ে বাপের হাত ধরে ইরাবতী তক্তাপোশের উপর এনে বসাল। মেয়ে ক'টি একদিকে। ইরা তাদের মধ্যে গিয়ে বসে পড়ে। নিজে সে পরেছে ধবধবে একখানা তাঁতের ধুতি, আর কিছু নয়। অনাড়ম্বর সাজপোশাকে এমন খাসা দেখায় ইরাকে! ছাতের কোণ থেকে অরুণাক্ষ এক নজরে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি পড়তে দৃষ্টি ফিরিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের কেন্দ্র বিশ্বেশ্বরের দিকে তাকাল। ফুল আর ফুল! নিমন্ত্রিতেরা সকলে ফুল নিয়ে এসেছে। ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন করে দিল বিশ্বেশ্বরের অস্থিসার দেহ। শেষ অবধি ঠিক হয়েছে, সভাপতি কেউ হবে না। কৃতান্ত তার একটু ভূমিকা করে দিল: নিতান্তই ঘরোয়া অনুষ্ঠান আজকের এখানে—সকলের বড় আসন ঐতিহাসিক-প্রবর বিশ্বেশ্বর সরকার মশায়ের। আমাদের বিশ্বেশ্বর-দা'র। সবাই আমরা নিচে। সভাপতি রূপে অন্য কারো মাতব্বরি বরদাস্ত করতে রাজি নই আমরা।

বিস্তর চেষ্টাচরিত্র করেও তেমন কাউকে পাওয়া গেল না—এইটে হল আসল কথা। সেটা পঞ্চানন জানে, এবং ঝানু কেউ কেউ আন্দাজ করেছে। বক্তৃতার বড় বড় কথায় তারা মুখ টিপে হাসে।

কৃতান্ত তার পরে লিখিত অভিনন্দন পাঠ করল। যাবতীয় উৎকৃষ্ট বিশেষণ বিশ্বেশ্বর সম্বন্ধে—অভিনন্দন-পত্রের যে রকম দস্তুর। ইরা বাপকে অনেক করে বুঝিয়ে দিয়েছে, ঐ সময়টা নিরাসক্ত ভাব,

দেখাতে হবে—একেবারে কিছুই যেন কানে যাচ্ছে না। অথবা কাচুমাচু ভাবে না-না করাও চলে। কিন্তু স্ফূর্তির চোটে বিশ্বেশ্বর সব ভুলে মেরে দিয়েছেন। এক একটা ভাল কথা আসছে আর হেসে ঘাড় দুলিয়ে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করেন সেটা। কেউ মালা দিতে গেলে নিজেই হাত বাড়িয়ে নিয়ে গলায় পরছেন। ইরা লজ্জায় মরে যায়।

বাবা—

কি রে? লাল গোলাপগুলো বড্ড ভাল। গন্ধটা কি রকম, দেখ্ শুঁকে। দেখ্—

এর পরে কী বলা যায় এত মানুষের মধ্যে? একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে! ভাবতে গিয়ে ভালও লাগে—নিষ্পাপ শিশুর মতন তার বাবা। মনে এক, মুখে অন্য ভাবের অভিনয় তিনি পারেন না।

সম্বর্ধনার উত্তরে যা-যা বলতে হবে, ইরা তিন-চার দিন ধরে তালিম দিয়েছে। কিন্তু কোথায় কি! রোজ যেমনধারা লাইব্রেরিতে হয়ে থাকে, এখানেও ঠিক তেমনি। অপরের গালমন্দ, আর নিজের সম্বন্ধে একশ'খানা করে বলা। লাইব্রেরির সেই ছেলেগুলোর কয়েকটি দেখা যাচ্ছে—হতে পারে, সেইজন্যে স্থানকাল ভুলে ক্ষেপে উঠলেন।

রামতারক মুখুজ্জে কে জান? জান না। নামই শোন নি। ঐ যে বললাম, ওরা ইতিহাস লেখে! হাত-পা ঘাড়-গরদান বাদ দিয়ে লিখে গেলেই হল—গবর্নমেন্টের আইনে মানা নেই তো! রামতারক হলেন বড় মুৎসুদ্দি—লর্ড ক্যানিং যাঁর বাড়ি পুতুলের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন। লাখ টাকা খরচ করে পুতুলের বিয়ে—আর সেই বিয়ের তারিখ দিয়েছে বাইশে ডিসেম্বর, শনিবার। হ্যাঁ, দেখাব তোমাদের—দিগ্‌গজ পণ্ডিতের লেখা বইতে আছে। নিজের চোখে না দেখে কি বলছি?

এতক্ষণ কাছাকাছি চেয়ে ছিলেন। এবারে গোটা হাতের উপর নজর ঘুরিয়ে কলাও করে বলতে লাগলেন, পৌষ মাসে বিয়ে হয় কখনো, বলুন আপনারা? হলই বা পুতুলের বিয়ে—পুরোপুরি শাস্ত্রসম্মত ভাবে হচ্ছে, তার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। তারিখ হল বাইশে ডিসেম্বর নয়, বাইশে জানুয়ারি। বাইশে ডিসেম্বর শনিবার হয় না, বুধবার। মাসটা জানুয়ারি হলে মাঘ মাস পড়ে যাচ্ছে, দিনটাও শনিবার দাঁড়াচ্ছে। বুঝুন, কি সর্বনাশ! আমার 'ভারতে ইংরাজ'-এ আট পাতা জুড়ে রয়েছে পুতুলের বিয়ের তারিখ নিয়ে আলোচনা। আমি শেষ কথা বলে দিয়েছি, তার উপরে তিলেক সন্দেহের ব্যাপার নেই। কী মেহনত হয়েছে শুধু ঐ তারিখটা বের করতে, বাইরের কেউ ধারণায় আনতে পারবেন না।

ইরা উঠে দাঁড়াল। সারাক্ষণ বসে বসে শোনবার সময় কোথা? অরুণাক্ষ তখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, কী মনীষা—কী রকম সত্যদৃষ্টি! উঃ, তাজ্জব হয়ে গেছি।

বিশ্বেশ্বর বলেন, পড়েছ তুমি বাবা?

অরুণ বলে, পড়েছি মানে? লাইন-কে-লাইন মুখস্থ। বলে যেতে পারি। লেখক তো কতই আছেন, কিন্তু আপনি অদ্বিতীয়। লোকে চিরকাল আপনাকে মাথায় তুলে রাখবে। আজকে তার এই একটু নমুনা দেখছেন।

বিশ্বেশ্বর গদগদ হয়ে বলেন, আমায় নয় বাবা, আমার বই—'ভারতে ইংরাজ'। তাই বা কেন—লোকে মাথায় রাখুক সত্যকে। 'ভারতে ইংরাজ'-এ যদি ভুল বেরিয়ে পড়ে, সেদিন এ বই নর্দামায় ছুঁড়ে দিয়ে যিনি ভুল বের করলেন তাঁর বই যেন মাথায় নেয় দেশের মানুষ।

তার পর হেসে উঠলেন : জান বাবা, দু-দণ্ড চুপচাপ বিশ্রাম নিতে পারিনে। ঘুমিয়ে সোয়াস্তি নেই—সেকেলে আজব-পোশাকের পুরুষরা আজব-গয়না-পরা মেয়েরা এসে চলাফেরা করেন। ইরা রাগারাগি করে, কেন তুমি ঘুমোও না—উঠে উঠে বসো, ঘুমের মধ্যে কি সব বলো···আরে, আরাম করতে আমার কি অনিচ্ছে? ঘাড় ধরে যদি তুলে বসিয়ে দেয়, আমি কি করতে পারি বলো?

সেই পরমোৎসাহী পটলাও এসে বসেছে অরুণের পিছনে। সে বলে, এ যে ভৌতিক ব্যাপার! গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠছে।

বিশ্বেশ্বর বলেন, ঠিক তাই। ঘাড় ধরে তুলে তারা কাজে বসিয়ে দেয়। কথা বলে, আমি স্পষ্ট শুনি, কান্নাকাটি করে এসে আমার কাছে—বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি, আমাদের বাঁচাও। তোমার ক্ষমতা আছে, তুমি পারবে। ওগো, বাঁচাও।

হাসতে হাসতে বললেন, চাকরি ছেড়ে দিলাম কেন জান? রামপ্রসাদ হিসাবের খাতায় গান লিখতেন। ভয় হল, আমার লেজার-বইয়ে 'ভারতে ইংরাজ' লিখতে না বসে যাই।

ইরা শুনছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অরুণাক্ষকে লক্ষ্য করে হঠাৎ বলল, আপনি আসবেন ভাবতে পারি নি।

সে কি কথা! আপনি নিজে নেমন্তন্ন করে এলেন, আমি ছিলাম না দুর্ভাগ্যক্রমে—

ইরা বলে, সেদিন ভবানীপুরে কোন বৈঠকে গিয়েছিলেন। আমি থাকতে থাকতে সুনন্দা দেবী গিয়েছিলেন আপনার খোঁজে।

হেসে উঠে বলে, রবিবার রাত্রে খাবেন ওঁদের বাড়ি। বাবু ফিরে এলে আমায় বলতে বললেন। তারপরে দেখা হয় নি, তাই বলতে পারি নি। সে রবিবার আজ।

অরুণাক্ষ বলে, এটা সেরে সেইখানে যাব। নেমন্তন্ন আমি পারতপক্ষে ছাড়িনে।

ইরা বলে, আমাদের এখানে তো ফাঁকা নিমন্ত্রণ। খানিকটা কথাই শুধু—

অরুণ বলে, দেখা যাক, ইরা দেবী চিলেকোঠায় বসে সেঁটে সেঁটে শুধু কথাই সাজাচ্ছেন, না আর-কিছু।

ইরা চলল এর পর চিলেকোঠায় নয়, নিচের তলায়। মনের স্ফূর্তিতে এক সঙ্গে জোড়া-সিঁড়ি লাফ দিচ্ছে।

ও মা!

মা কোথায়, সাড়া নেবার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। সে তো জানাই আছে। জানলাহীন আধ-অন্ধকার রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, মাগো, তোমার পুরানো পচা বাড়িতে মানুষজন আজ ভেঙে এসেছে বাবার নামে। তুমি একটিবার চোখের দেখা দেখবে না মা?

সরমা বলেন, সবাই দেখতে গিয়ে বসলে এদিককার কি হবে? কৃতান্ত ঠাকুরপোর চোলে পড়ে এত বড় দায় ঘাড় পেতে নিলি, আমায় মুখের কথাটা একবার জিজ্ঞাসা করলিনে।

মায়ের সঙ্গে এই নিয়ে এখন কথা-কাটাকাটি করবার সময় নয়। যতই বকো, ইরা মুখভার করবে না। মা'কে জড়িয়ে ধরে রান্নার পিঁড়ি থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে যায়: এক নজর তুমি দেখে এসো মা।

সরমা ছড়া কাটেন: পাঁচি যাবেন বৃন্দাবনে, ঘুঁটে কুড়োবে কে? সর্ সর্—ঘি পুড়েজ্বলে গেল।

ইন্দ্রা হেসে বলে, ঘুঁটে কুড়োবার মানুষ এই তো হাজির হয়েছে মা। আমি ভেজে দিচ্ছি, যাও তুমি একবার। গ্লাতদিন বাবার নিন্দেমন্দ কর। অফিসের এক ক্ষুদে কেরানি ছিলেন—সে চাকরি ছাড়ার দুঃখ আজও ভুলতে পারলে না। তখন তাঁকে কে চিনত? আজকে দেশের বড় বড় মানুষেরা জুটে কি বলছে, কানে শুনে এসো।

বড়মানুষেরা বলবে না কেন? তাদের তো ক্ষতি-লোকসান নেই, ক্ষেপিয়ে দিলে হুঁশ। বাহবা দিয়ে দিয়েই তো চাকরিটা ছাড়াল। মেয়ে-বাপ তোরা ঘন-আঁটা দুধ ভালবাসিস—আজ আষাঢ়ের দিনে তোদের পাতের কাছে একটুকু আঁব-দুধ এনে ধরতে পারিনে।

শেষ দিকটা গলার স্বর ভারী হয়ে আসে। কড়াইর দিকে ঝুঁকে পড়ে ঘিয়ের মধ্যে সশব্দে ঝাঁঝরি নাড়তে লাগলেন।

ইরা ক্ষণকাল মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। বাবার উপর যখন তখন বকাবকি, সেজন্য ভাল লাগে না—তবু মায়ের ব্যথা বুঝতে পারে সে। তাই তো পাশের খবর না বেরুতে ট্যুইশানি জুটিয়ে নিয়েছে, চাকরির জন্য অফিসে অফিসে টহল দিচ্ছে। ট্যুইশানি করে ক'টা টাকাই বা দেওয়া যায়। তার উপরে খামোকা এই এক এক লম্বা খরচ। বাবাব নামে লাফিয়ে উঠে না ভেবেচিন্তে এত বড় দায়টা ঘাড়ে তুলে নিল।

কিশোরীবালা লুচি বেলে দিচ্ছিল সরমার পিছন দিকে বসে। চাকি-বেলন তার হাত থেকে টেনে নিয়ে ইরা বলল, তোলা-উনুন ধরে গেছে। তুই ভাই চায়ের জল চাপিয়ে দে এবার। লোক-জন আর বেশিক্ষণ থাকবে না। জল হয়ে গেলে চিলেকোঠায় নিয়ে চা ভিজিয়ে দিবি। কাপ-প্লেট সমস্ত সাজিয়ে রেখে এসেছি। আমরা যাচ্ছি চটপট লুচি ক'খানা ভেজে নিয়ে।

সরমাকে বলে, হাত চালিয়ে ভাজো মা, আমি বেলছি। আমায় যদি হারাতে পার তবে বলব, হ্যাঁ—শিখিয়েছিলেন বটে তোমায় মা।

সরমা হাসলেন এবার: তার মানে নিয়েই যাবি আমায়?

হ্যাঁ মা, একটু তোমায় না শুনিয়ে ছাড়ব না। চিলেকোঠায় খাবার গোছাতে গোছাতে কিছু তো কানে আসবে। তোমার সংসারে অনেক দুঃখ-কষ্ট। এই কষ্ট-দুঃখের বদলে যা পাচ্ছ, সেটা টের পেলে তবু অনেকখানি শান্তি পাবে। সত্যি সত্যি যদি কিছু না পেয়ে থাকে, এত মানুষ কি জন্যে খোশামোদ করতে আসবে? বাবার কাছে কোন প্রত্যাশা তাদের?

বিশ্বেশ্বর একটানা বকেই যাচ্ছেন। একটু যখন কমা-দাঁড়ির লক্ষণ দেখা যায়, যে-কেউ একটু খুঁচিয়ে দিলে হল। আবার চলল পুরা দমে। এখন আর লোকে বিশেষ শুনছে না—দু-জনে চার জনে এক একটা দল করে নিজেদের ভিতর কথাবার্তা বলছে। গলা খাঁকারি দিয়ে উঠে পড়ছে কেউ কেউ—অর্থাৎ থুতু ফেলতে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি না একেবারে। উপায়ও নেই চলে যাবার। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থেকে কৃতান্ত আপ্যায়ন করছে: সে কি কথা! একটা দিন দাদাকে নিয়ে বসেছি—বলতে না বলতে আসর ভেঙে দিলে হবে কেন? চা খেয়ে যেতে হবে একটু। গৃহস্থ শুধু-মুখে ছেড়ে দেবেন না।

আবার এ ঘাঁটিও যদি জো-সো করে ছাড়িয়ে যাও, সিঁড়ির নিচে পঞ্চানন। কাজকর্ম শেষ না হওয়া অবধি একটা পিঁপড়ে গলতে দেবে না। উঠে আসতে পার স্বচ্ছন্দে, নেমে বেরুবার উপায় নেই। আঃ, মেয়েদের ব্যাপারই আলাদা। দু-খানা লুচি

আর দু-ভুচি আলুর দমের নামে রাত কাটিয়ে দেবে নাকি? মানুষজন কতক্ষণ ধরে রাখা চলে এমনধারা এক ব্যাপারে!

চিলেকোঠার ওধারে দেয়ালের আড়াল। টেনেটুনে দু-তিনটে চেয়ার নিয়ে গেছে সেখানে। ছোকরারা গিয়ে দু-টান সিগারেট টেনে খানিক গল্পসল্প করে চাঙ্গা হয়ে আবার এসে বসছে। ঘোরাফেরাটা বড্ড বাড়ছে, কেউ আর স্থির বসে থাকতে চায় না। গতিক বুঝে কৃতান্ত হাঁক দিয়ে বলে, ও মাধুরী, কত আর বকাবে দাদাকে? জানি, সকলে জানতে-বুঝতে এসেছ। কিন্তু সকলের জ্ঞানের ক্ষুধা মেটাতে বুড়োমানুষের যে জান থাকে না। গান ধরো একটা—দাদা ততক্ষণ জিরিয়ে নিন।

অরুণাক্ষ পড়ে গেছে একেবারে সামনে। এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ফলস্বরূপ বিশ্বেশ্বরের দৃষ্টি ঘুরে ফিরে তারই উপর। দীপক বসে ছিল, সে দিব্যি উঠে পড়েছে; উঠে ঐ আড়ালের দিকে গেছে। অরুণের উপায় নেই, মুখের দিকে চেয়ে অনবরত কথা বলতে থাকলে ওঠা যায় কেমন করে।

হেনকালে কৃতান্তর ঐ প্রস্তাব যেন ঐশী প্রত্যাদেশ—ও মাধুরী, গান ধরো এইবার।

অরুণ সঙ্গে সঙ্গে প্রবল সমর্থন জানায়: হ্যাঁ, গানই হোক। ওঁর বড় কষ্ট হচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর হেসে ঘাড় নেড়ে বলেন, কিছু না, কিছু না। সমস্ত রাত্তির ধরে আমি এমনি বলে যেতে পারি—এক বিন্দু কষ্ট হবে না।

অরুণাক্ষ জোর দিয়ে বলে, হচ্ছে কষ্ট। ঘেমে গিয়েছেন, আর বলেন কষ্ট হচ্ছে না! কষ্ট হল না হল, সে কি আর বোঝেন আপনি?

মাধুরী হারমোনিয়ামের চাবির উপর আলসে আঙুল বুলিয়ে গেল। পরের প্রতি করুণা, হয়তো বা নিজেরই কান বাঁচানোর তাগিদ। আরম্ভের গানটায় বেশ জমিয়ে নিয়েছিল—এ গানও ভাল হবে সম্ভবত। কিন্তু অরুণাক্ষ ততদূর গেল না। ফাঁক বুঝে সুড়ুৎ করে সরে পড়ল। আড়াল জায়গার এক চেয়ারে বসে পড়ে দুরন্ত দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল : বাব্বাঃ!

দীপক বলে, রবিবার বিকেলটা কি করি বসে বসে, তার উপরে ছ'আনার পয়সা চাঁদা দিয়ে ফেলেছি—জলটল খেয়ে তাই উশুল করতে এসেছিলাম। যা গতিক, আবার একদফা চাঁদা দিতে রাজি আছি কৃতান্তবাবু সিঁড়ির মুখটা যদি ছেড়ে দেন।

বলার ভঙ্গিতে সকলে হেসে উঠল। অরুণাক্ষ বলে, ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। গবর্নমেণ্ট বাইরে ছেড়ে রেখেছে—দেশ সুদ্ধ লোকের মাথা উনি খারাপ করে দেবেন।

চিলেকোঠার মধ্যে খাবার গোছাতে গোছাতে ইরাবতী স্তব্ধ হয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে মায়ের দিকে তাকাল। সরমা কম কথার মানুষ—তিনি কিছু বললেন না। শুনতেই পান নি হয়তো।

দীপক অরুণাক্ষকে বলে, এখন এই বলছেন—আপনিই তো আগডম-বাগডম বলে আরো আকাশে তুললেন। অদ্বিতীয় লেখক, লোকে মাথায় তুলে রাখবে—উঃ, পাগল ক্ষেপানো আর কাকে বলে!

অরুণাক্ষ হেসে বলে, অদ্বিতীয়—সে কি মিছে কথা? সারা দেশে পাতি-পাতি করেও এ মানুষের দোসর মিলবে না।

ইরা সন্ত্রস্ত হয়েছে। মা মোটে আসতে চাচ্ছিলেন না—কেন যে তাঁকে টেনেটুনে নিয়ে এল! তাদের দুঃখকষ্টের বদলে দেশের মানুষের কাছ থেকে কি পাচ্ছে, তাই শোনাবার জন্য। শুনে ফেললেন নাকি? ঠিক বোঝা যায় না—একটুখানি করুণ হাসি

যেন মুখের উপরে। হায় হায়, না শোনেন—না শুনতে পান যেন কোন-কিছু।

পটলাও এবারে বিড়ি টানতে টানতে এসে দাঁড়াল। পাড়ার মানুষের নিন্দেয় তার লেগেছে। বলে, বিশ্বেশ্বরবাবু বকেন একটু বেশি, কিন্তু সাচ্চা লেখক—হেলাফেলার বস্তু নন।

দীপক হেসে উঠে বলে, লেখকই নন মোটে। আমার কাকার সঙ্গে কালেক্টরেটে লেজার লেখার কাজ করতেন—লেখক ছিলেন তখন, লিখতে লিখতে আঙুল ব্যথা হয়ে যেতো। ঐতিহাসিক হবার পর তো কলম ছেড়েছেন।

এককপি 'ভারতে ইংরাজ' ভাল করে বাঁধিয়ে বিশ্বেশ্বরের বেদির উপরে রেখে দিয়েছে। কৃতান্তর আসল কাজে ভুল হয় না। এই উপলক্ষে বইটা চর্মচক্ষে দেখা হয়ে যাক উপস্থিত সকলের। কেউ কেউ দু-পাঁচ পাতা উল্টেও দেখছেন। দীপকের কথায় পটলা চটে গিয়ে বলে, কলম ছেড়ে দিয়েছেন—অমন ঢাউস বই তবে কি মন্তোরে বেরিয়ে গেল?

দীপক বলে, ওতে কলম লাগে না। গঁদের আঠা আর কাঁচি—দুই বস্তু নিয়ে কারবার। যেখানকার যত পুরানো পচা লেখা এক জায়গায় এনে আঁটা। নিজের কি আছে বইয়ের ভিতরে?

তা ঠিক, ভাবতে গেলে তা-ই বটে। হাসির হররা উঠল—ছোকরাগুলো উচ্ছ্বসিত হাসি হাসছে।

চিলেকোঠায় সহসা অনতিস্ফুট আর্তনাদ। সরমা কি হল, কি হল—করে ওঠেন। ইরা চা করছিল, গরম জল চেলে পড়েছে। কৃতান্ত ছুটে এলো। বাইরের এরাও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

না, যতটা ভাবা গিয়েছিল তা নয়। গরম জলের ডেগচি উলটে, পায়ে তত বেশি নয়—লুচি-হালুয়া-সন্দেশের উপরে সমুদ্দুর খেলছে।

তখন সরমা মেয়ের উপর ক্ষেপে গেলেন : কাজ দেখাতে এসেছে ! পারিস দশের মধ্যে জমিয়ে সভাশোভন করতে, তাই করগে যা বসে বসে। কে তোকে এদিকে আসতে বলেছে ?

ইরা শান্ত কণ্ঠে বলে, গরম জল খাবারে না পড়ে গায়ের উপর পড়লেই কি ভাল হত ?

তা বটে, সর্বনাশ হতে হতে বেঁচে গেছে। সরমা নরম হলেন। ডেগচি উলটে যদি মেয়ের উপর পড়ত! কিন্তু আসে কি জন্য এ সমস্ত কাজে ? এত হচ্ছে, আর তোলা-উনুন থেকে ডেগচিটা আমি নামাতে পারতাম না ? নয় তো কিশোরীবালাকেও বলা যেত ! এখন উপায় কি, জলে-ভেজা এই বস্তু কেমন করে সেঁকে সেঁকে তুলে দিই ?

কৃতান্ত বলে, বকবেন না বউদি। ইরা-মা'রই তো সব চেয়ে বেশি উৎসাহ। হাত ফসকে পড়ে গেল, ও তার কি করবে ? ইচ্ছে করে ফেলে নি।

ইরা ফোঁস করে ওঠে : ইচ্ছে করে ফেললেও কিছু অন্যায় হত না কাকাবাবু।

কৃতান্তর বিস্ময়-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে সামলে নেয়। হাসির ভাব করে বলে, কী আর হয়েছে ! বাবার ভক্তেরা ভক্তি-শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন। অসীম দয়া ওঁদের। শ্রদ্ধা জানানো হয়ে গেছে—ব্যস, বিদেয় হয়ে যান। লুচি-টুচি কি হবে—আকাশের অবস্থা সুবিধের নয়, চলে যেতে বলুন।

সরমা অবাক হয়ে বললেন, শোন কথা। তোরই তো ব্যবস্থা— নিজে টাকা বের করে কিশোরীবালাকে দিয়ে ঘি-ময়দা আনালি। আমি কি এর মধ্যে ছিলাম ? না, একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলি আমায় ?

ইরা বলে, তা ভালই তো হল মা, জিনিসপত্রের অপব্যয় হল না। নর্দামায় ফেলে দাও—কাকে-কুকুরে খেয়ে যাবে। তারা অনেক ভাল, কথা বলে না—মনে এক, মুখে অন্য বলতে পারে না।

সবাই সরে গেল ইরাবতীর তেমন-কিছু হয় নি দেখে। যায় নি অরুণাক্ষ—দরজার ওদিকটায় একলা সে দাঁড়িয়ে। শুনে ফেলেছে বোধহয় মা-মেয়ের কথাবার্তা। শুনেছে তো বয়ে গেল—শোনাই উচিত ওদের। বেহায়া মানুষটা আবার জিজ্ঞাসা করে, পুড়েটুড়ে গেল নাকি? জ্বালা করছে?

হ্যাঁ—বড্ড জ্বালা, বড্ড—বড্ড—

মুখ ফিরিয়ে ইরা ছুটে বেরুল। স্বর কাঁপছে। আকাশ ঘন কালো মেঘের ভরা সাজিয়ে স্তম্ভিত হয়ে আছে। এক ছুটে সে বাপের কাছে গেল। আকাশের গতিক বুঝে কৃতান্ত আর এখন বেশি আটকাচ্ছে না। দু-একজন করে চলে যাচ্ছে, যারা সব এসে জমেছিল।

দীপক বটব্যালও যাচ্ছে। পটলা তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বলে, পালা চুকেবুকে গেল? শুনেছিলাম যে পরের ব্যাপার আছে—

দীপক খিঁচিয়ে ওঠে: ভেজিটেবল-ঘিয়ের দু-খানা লুচি মুখে দিয়ে কী চতুর্বর্গ লাভ হবে শুনি? চলুন, চলুন—বৃষ্টি আসছে।

পটলা অবাক হয়ে বলে, সে কি মশায়! উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সর্বদিকে তো চাঁদা তুলে বেড়িয়েছে। খরচের বেলা চাপা-চাপি করলে কে শুনবে?

দীপক বলে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক বিপাকে পড়েছেন—ফন্দি-ফিকিরে দুটো পয়সা তুলে দেওয়া। দুঃস্থ সাহিত্যিকের সাহায্যার্থে সম্বর্ধনার আয়োজন—খোলাখুলি বিজ্ঞাপনটা ভাল শোনায় না। কিন্তু ব্যাপার আসলে এই।

ইরাকে দেখে থতমত খেয়ে চুপ করল। হাতের উপর আছে এখনো সর্বসাকুল্যে জনকুড়িক—তা বোধ হয় কুড়িটা মীটিংই চলেছে চতুর্দিকে। বিশ্বেশ্বরও ছাড়বেন না, তাঁর কথা তিনি শুনিয়ে চলেছেন। আজকের বিশেষ পদাধিকার বলে সকলের চেয়ে উঁচুতে গলা তুলবার চেষ্টায় আছেন। পারবেন কি করে—একে বুড়োমানুষ, বিপরীতে তায় অতগুলো কণ্ঠ।

ইরা গিয়ে বাপের হাত ধরে টেনে তুলল : চলো বাবা। সভা হয়ে গেছে, এখনো বসে কেন তুমি?

বাধা পেয়ে বিশ্বেশ্বর রেগে ওঠেন : হয়ে গেল কি রে? এই তো এত সব আছেন।

ওঁরা নিজেদের কথা বলছেন। কেউ তোমার কথা শোনে না বাবা। বুঝতে পার না তুমি, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই।

টপ-টপ করে ক-ফোঁটা জল পড়ল। মানুষগুলো ঘাড় তুলে আকাশের দিকে তাকায়। জোর বৃষ্টি নামবে, আসর ভাঙতে হল এবারে।

কেউ শোনে না? বিশ্বেশ্বরের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। মৃদু মৃদু তিনি ঘাড় নাড়েন : তাই হবে বোধ হয়। ঠিক বলেছিস ইরা, শুনলে কেন এত গণ্ডগোল হবে?

ইরার মনের মধ্যে হায়-হায় করে উঠল। নিজে ইনি এক স্বর্গলোক গড়ে রয়েছেন—কেন তার উপর আঘাত হানতে যাওয়া? বিশেষ আজকের এই দিনটায়। লোকে বিস্তর ভাল ভাল কথা বলে গেল —সত্যি কিম্বা অভিনয়, গরজটা কি অত শত খবরে?

কৃতান্তকে পেয়ে বিশ্বেশ্বর তাকেই সালিশ মানলেন : শোন—আমার মেয়ে বলছে, কেউ শোনে নি নাকি আমার কথা। কথার ঝাঁকে খরচ এতক্ষণ ধরে।

কৃতান্ত ভারি ব্যস্ত। আর যাই হোক, খবরের কাগজের লোক-গুলোকে খাওয়াতেই হবে। নিরম্বু ফিরে গেলে রিপোর্ট বেরুবে না তাদের কলমে। তাদেরই বাপু-বাছা ঠাকুর-গোঁসাই করছিল। তারই মধ্যে ঘাড় না ফিরিয়ে জবাব দিল, কতক্ষণ আর শুনবে মানুষে। উঠছেন বুঝি? তাই যান— বিস্তর বকেছেন, বিশ্রাম করুনগে।

তপোবন-ঘরের মধ্যে তোষকটুকুর উপর ইরা বাপকে এনে বসাল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গড়িয়ে পড়লেন—কত ক্লান্ত হয়েছেন, এতক্ষণে বোঝা গেল। দরজার ওপাশে অন্ধকারে যেন মানুষ—যে হয় হোকগে, উঠে গিয়ে ইরা দুয়ার ভেজিয়ে দিয়ে এলো।

একটুখানি ওঠো বাবা। তাকিয়া সরিয়ে নিচু বালিশ দিয়ে দিই। তোমার ঘাড় ফেটে যাচ্ছে।

বিশ্বেশ্বরের মেজাজ ভাল নয়। সেইজন্য আরও নেতিয়ে পড়েছেন। এমনি মেজাজেই অবাধ্যপনা করেন তিনি। মেয়ের উপর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন: না, কিছু হচ্ছে না আমার। তুই তো সব জানিস, দুনিয়া একেবারে নখদর্পণে নিয়ে বসে আছিস।

ইরাবতীকে হাসতে হয়। কান্নায় চোখ ভরে এলেও হেসে উঠে সামাল দিতে হয় বাপকে। বলে, তুমি বাবা আমার দুনিয়া। সে দুনিয়ার সবটুকু জেনে বসে আছি। তোমার নিজের চেয়ে বেশি জানি—অনেক বেশি।

সেই এক দুঃখের আনাগোনা বিশ্বেশ্বরের মনে। অভিমান ভরে তিনি বললেন, কেউ আমার কথা শোনে নি—কিন্তু কৃতান্ত তো অমন কথা বলল না।

ইরাবতী সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়: কাকাবাবু যা বললেন তাই ঠিক বাবা, তিনি একেবারে সামনে ছিলেন। চিলেকোঠায় আমি খাবার গোছাচ্ছিলাম, আমি কি দেখেছি কিছু চোখে?

না দেখে বলিস কেন ?

না বললে কি উঠতে ? জানিনে তোমায় ? বুদ্ধি এসে যায়—তোমার শরীর খারাপ। ফাঁকি কথা বলে তুলে আনতে হল।

বল্ সেই কথাটা। আঠারোটা সন-তারিখের গোলমাল মুখে মুখে ধরে দিলাম, শুনছে না অমনি বললেই হল। বিশ্বেশ্বর একেবারে জল হয়ে গেছেন। একগাল হেসে বলেন, ভারি বজ্জাত তুই। আমি ভাবলাম, সত্যি সত্যি বুঝি বা—

ইরা তর্ক করে, ভাবো কেমন করে তা-ও তো বুঝিনে। কথা শুনবে না তো এত মানুষ দল বেঁধে এসেছিল কেন ?

বিশ্বেশ্বর বলেন, বড্ড অন্যায় করেছিস মা। তাড়াতাড়ি আসর ভেঙে এত জনের মন ক্ষুণ্ণ করলি।

ইরা ঘাট মানে : অত শত ভাবি নি বাবা। তোমায় নিয়ে আসছি—দেখি, মুখ চূণ করে সকলে তাকাতাকি করছে। আমারও কষ্ট হল দেখে।

ভেজানো দরজা একটুখানি নড়ে ওঠে।

কে ?

অরুণাক্ষ মৃদুকণ্ঠে বলে, একটুখানি বাইরে আসেন যদি উনি—

না, বাবা শুয়ে পড়েছেন।

ইরাবতী উঠে দরজায় খিল দিয়ে এলো।

বিশ্বেশ্বর ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, খিল আঁটিস কেন ? ডাকছে, কি বলে শুনি আসি।

ইরা বলে, কি শুনতে যাবে ? মিষ্টি-মিষ্টি কিছু বানিয়ে বলবে—তোমার মতন সত্যি জিনিস বলতে ক'জনে পারে ? তোমার কষ্ট হচ্ছে, ক্লান্ত হয়ে ফিরোচ্ছ, তবু রেহাই দেবে না—তবু জ্বালাতন করবে মুখ্যু মিথ্যেবাদীরা—

বিশ্বেশ্বর তাড়া দিয়ে ওঠেন: ও কি রকম কথা রে। কৃতান্ত বলছিল, অনেক বড়লোক এসেছেন যাঁরা হলেন দেশের মাথা। আমরা গরিব মানুষ—আমি চিনিনে, তুইও না। ডাকছেন হয়তো তেমনি একজন কেউ।

ইরাবতী এক কথায় কেটে দেয়: দেশের মাথা আবার কে আছে? মাথা হলে তোমরা, জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি যাঁদের হাতে। সব চেয়ে বড় কুলীন, সকলের বড় ব্রাহ্মণ। আজকে বেদির উপর বসেছিলে বাবা, নিচে সব লোকজন। কত উঁচু আর কত তফাৎ তোমায় দেখাচ্ছিল অন্য দশজন থেকে! বাবা তুমি কত বড়!

এমনি করেই ভাবে ইরা। এদেশে-বিদেশে পাহাড় কেটে বুদ্ধমূর্তি বানিয়েছে—একজন মানুষ যত বড় হতে পারে, তার বিশ-পঞ্চাশ গুণ বড় করেও শিল্পীর তৃপ্তি নেই। তার বাবারও তেমনি এক আকাশ-ছোঁয়া মূর্তি যেন। মনের সমস্ত কল্পনা জুড়ে জুড়েও সে মূর্তির নাগাল মেলে না। বিশ্বেশ্বরের পিতামহ রামনিধি সরকার—ফাঁসি হয়েছিল তাঁর। ফাঁসিতে মরেও রেহাই পান নি—আদালতের কাগজপত্রে তিনি খুনি-ডাকাত। শহুরে শিক্ষিত মানুষ তাই হয়তো বিশ্বাস করেছে, তবে মণিরামপুর অঞ্চলে কাজকর্ম করতেন, সেখানকার কেউ ঐ সমস্ত সরকারি প্রমাণপত্র মানে না। রামনিধি এখনো পীর-পয়গম্বর তাদের কাছে—তাঁর নামে সিন্নি পড়ে। বিশ্বেশ্বরের কিছু জমিজমা আছে, সেই সম্পর্কে মণিরামপুর থেকে একবার একদল লোক এসেছিল। তাদের কাছে বসে বসে শুনলেন পিতামহের কথা—অনেক রকম কিম্বদন্তী। শুনে তো অবাক। সাহেবরা রামনিধিকে শুধু হত্যাই করে নি, অপবাদের বোঝা চাপিয়ে তাঁকে গোর দিতে চেয়েছিল—ঘৃণায় কেউ যাতে সেদিকে নজর না ফেলে। সেই গোরস্থান খুঁড়ে ফেলে বিচ্ছিন্ন হাড়-পাঁজরা খুঁটে

খুঁজে বিশ্বেশ্বরই অবশেষে এক বিশাল-পুরুষ সর্ব চক্ষুর সামনে তুলে ধরেছেন। দেশের মানুষ, একেবারে ভুলে মেরে বসে রয়েছ তোমরা। 'ভারতে ইংরাজ'-এর অনেক পৃষ্ঠা জুড়ে রামনিধি। শুধু মাত্র পিতৃপুরুষের ঋণ-শোধ নয়, বাঙালি জাতির কৃতঘ্নতার পাপ-মোচন।

ভাঁটির দেশ ছেড়ে যুবক রামনিধি উত্তর অঞ্চলে এলেন ভাগ্য ফেরাবার আশায়। সঙ্গে অভিন্নহৃদয় বন্ধু কাশীশ্বর রায়। সংস্কৃত ও ফারসি উভয় ভাষাই উত্তম রূপ জানা—এর উপরে কিছু কিছু ইংরেজি কথাও অচিরে রপ্ত করে নিলেন। এমন মানুষ পড়ুতে পায় না। সদরে যে ক'টি সাহেবসুবো ছিল এবং মফস্বলের নানান কুঠি থেকে হপ্তায় হপ্তায় যারা প্লান্টার্স-ক্লাবে আসত, ভারি দহরম-মহরম সকলের সঙ্গে। কাশীশ্বর তো বছর কতক পরে গ্রামাঞ্চল ছেড়ে ইংরেজের খাস শহর কলকাতায় গিয়ে জমিয়ে বসলেন। গেলেন বটে, কিন্তু যাতায়াতটা বজায় থাকায় কলকাতায় যত পশার-প্রতিপত্তিই হোক গ্রামের বাড়িতে এসে দোল-দুর্গোৎসব করতেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মানুষজন খাওয়াতেন। উকিল হিসাবে রামনিধিরও খুব নামডাক। কিন্তু সমস্ত পয়মাল শেষ অবধি। ভাঁটির দেশ ছাড়বার সময় তাঁর এক পূর্বপুরুষের হাতে-লেখা ভাগবত পুঁথি এনেছিলেন। নৌকা থেকে নেমেছিলেন সেই পুঁথি মাথায় নিয়ে। আর বুকের মধ্যে এনেছিলেন দুর্জয় সাহস ও ঈশ্বরনিষ্ঠা। তাই কাল হল। এত খাতির নীলকর মহলে, তাদের মামলা-মোকর্দমার বেশির ভাগ রামনিধির সেরেস্তায়—কিন্তু তাঁর পুরুত ঠাকুরকে নিয়ে এক ব্যাপারে বিষ-নজরে পড়ে গেলেন নীলকরদের। ছেলের অন্নপ্রাশনে পুরুত মশায় আর আসেন না—রামনিধি তো রেগে টং। তিন প্রহর বেলায় অপমানে লজ্জায় কাঁপতে কাঁপতে ব্রাহ্মণ এসে হাজির হলেন। কিনা, পথের

মধ্যে নৌকা আটকে কুসুমপুর কুঠির টমাস সাহেব তাঁকে এবং অনেককে দিয়ে নীলকুঠির উঠান ঝেঁটিয়ে নিয়েছে।

পরিচয় জানতে পেয়ে টমাস তারপরে দুঃখ প্রকাশ করল। কাশীশ্বর মধ্যস্থ হয়ে বলেন, যাকগে, যাকগে—তোমার পুরুতঠাকুর সেটা জানবে কি করে? মাপ চেয়েছে যখন, মিটে গেল।

জবাবে রামনিধি একটি কথা বললেন শুধু, যারা আমার পুরুত নয়?

তা সত্ত্বেও কাশীশ্বরের ধরাধরিতে মিটমাট হয়ে যেত নিশ্চয়। সবাই অন্তত তাই বুঝেছিল। কিন্তু আরও নানা ব্যাপার ঘটে গেল ইতিমধ্যে। 'ভারতে ইংরাজ'-এর দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়টা পড়ুন, বিস্তৃত পরিচয় পেয়ে যাবেন। মাস কয়েক পরে এক তাজ্জব কাণ্ড করে বসলেন রামনিধি। কোন এক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে টমাস সাহেবকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এনে সকলের সামনে—এবং সেই পুরুত ঠাকুরের সামনে বরকন্দাজে ঘিরে ঝাঁটা তুলে দিলেন তার হাতে: উঠোন সাফ করে দাও সাহেব।

সে আমলের নীলকরদের যদি জানা থাকে, এর পরের ব্যাপারগুলো আর বলে দিতে হবে না। চরমে পৌঁছল, একরাত্রে কুসুমপুর-কুঠি দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল যখন। বুড়ো টমাস বেরুতে পারল না, আগুনে পুড়ে মরল। আদালতে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরা বলল—রামনিধির দল কুঠি লুঠ করেছে, বুড়ো টমাসকে রামনিধি নিজে ধাক্কা মেরে ফেলেছেন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে।

সেই বংশের বিশ্বেশ্বর। গোড়ায় রামনিধিকে নিয়েই পুরানো কাগজপত্র খোঁজাখুঁজি শুরু—পিতৃপুরুষের নামের কালিমা মোচন করবেন তিনি। নজর ছড়িয়ে তার পরে গোটা ইংরেজ আমলে গিয়ে পড়ল—উঃ, মিথ্যার উপর মিথ্যা সাজিয়ে ইতিহাস বলে চালাচ্ছে—

উপন্যাস কোথায় লাগে। কলমের মহিমায় দিন-দুপুর হয়ে দাঁড়ায় রাত-দুপুর। যেমন ঐ রামনিধির বেলা ঘটেছে। এখনো সময় আছে —মালমশলা সব হেলায় এদিক-ওদিক ছড়ানো, খুঁটে খুঁটে তবু অনেক হদিশ পাওয়া যায়। পরে আর হবে না। তাই বিশ্বেশ্বর এত খাটছেন। চাকরি ও সংসার-প্রতিপালন নিয়ে তিনিও যদি মজে থাকেন, ক'টা বছর বাদে পঙ্কোদ্ধারের কোন উপায় থাকবে না। অতএব সরমা রাগ করলে কি হবে, নিরুপায় তিনি।

সরমাকে ইরা বলে, সেই রামনিধিই ফিরে এলেন আমাদের বংশে। অত খাতির-ইজ্জত ওকালতির অমন পশার এক-কথায় ছেড়েছুড়ে গাঁয়ের চাষাভুষোর মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন যিনি। মিছে তুমি মা কান্নাকাটি ঝগড়াঝাটি করো বাবার সঙ্গে। সহজ আরাম ওঁদের ভোলাতে পারে না। অনেক দিন ফেরারি থাকবার পর রামনিধি ধরা পড়লেন। ধরেই নাকি শঙ্করমাছের চাবুক মেরে সর্বদেহ শতছিদ্র করেছিল। তার পরে ফাঁসিতে লটকায়। বিশ্বেশ্বরেরও একই গতিক বটে। ঘরে-বাইরের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অবিরত চাবকাচ্ছে তাঁকে, সরমা পর্যন্ত রেহাই দেন না। নিজেই কেন এতদিন ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়েন নি, সেই তো পরমাশ্চর্য মনে হয়।

বিশ্বেশ্বর এক আস্ত পাগল। মেয়েটাও বাপের দোসর, কিন্তু সরমা তা নন। গরম জল পড়েছে তো ফেলে দিতে হবে নাকি অত লুচি-সন্দেশ? যেছেগুছে কিছু অন্তত দেওয়া চলবে। তাড়াতাড়ি সেই ভাবে প্লেট গুছাচ্ছেন। কিশোরীবালাকে নিচে পাঠালেন—আবার চায়ের জল গরম করে আনতে। কৃতান্ত বলেকয়ে জন কয়েককে আটকে রেখেছে। তা পাঁচ-দশ মিনিট থেকে যেতে অসুবিধা নেই। আকাশ

জমজমাট হয়ে আছে—এবং বিশ্বেশ্বর ঘরে গিয়ে ওঁদের তাঁর বাক্য শোনবার ভান করতে হচ্ছে না—স্পষ্টাস্পষ্টি আড্ডা ও হৈ-হল্লার কোন প্রকার বাধা নেই এখন। তপোবন-ঘরের ভিতর থেকেই ইরা টের পাচ্ছে, যথোচিত সেবা অন্তে সিঁড়ি ভেঙে তাঁরা নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন।

দরজায় ঘা পড়ল এমনি সময়। বিরক্ত হয়ে ইরাবতী সাড়া দেয়, কে?

পঞ্চানন বলে, শুনুন একটিবার—

দরজা খুলে ইরাবতী চৌকাঠ ধরে দাঁড়াল। ভিতরে উঁকি দিয়ে পঞ্চানন বলে, শুয়ে পড়েছেন? একটি বার উঠতে হবে যে ওঁকে। বাইরে ডাকছেন।

বিশ্বেশ্বর তড়াক করে উঠে বসলেন: নিশ্চয়, নিশ্চয়। এক্ষুণি যাচ্ছি আমি। গরদের জোড় আবার পরে নিতে হবে—একটু দেরি হবে যে বাবা পঞ্চানন। বেশি নয়, কাপড়খানা জড়িয়ে নিতে যা লাগে। ইরা, কোথায় রাখলি রে কাপড় কুঁচিয়ে?

ইরা দেখেছে, অরুণাক্ষ অদূরে দাঁড়িয়ে। চৌকাঠের দু-দিকে দু-হাত রেখে বাপকে এক শিশুর মতো আটকে দাঁড়াল। বলে, বাবার শরীর ভাল নয়, আর উনি বেরুতে পারবেন না।

বিশ্বেশ্বর চেঁচিয়ে ওঠেন: পারব রে, খুব পারব। বাড়ির উপর এসে ওঁরা দেখা করতে চাচ্ছেন, কি লাটসাহেব হলাম যে যেতে পারব না!

পিছনে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাপের মুখোমুখি চেয়ে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে ইরাবতী বলে, ব্যস্ত হয়ো না, তুমি শুয়ে থাক বাবা। আমিই জেনে আসছি, কেন ডাকছেন—কি দরকার ওঁদের।

এই কণ্ঠস্বর ভালরকম জানেন বিশ্বেশ্বর। আর তিনি উচ্চবাচ্য করলেন না। ইরা কয়েক পা এগিয়ে অরুণাক্ষের সামনে গিয়ে বলল, কি বলবার আছে, আমায় বলুন—

অরুণাক্ষ জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, যাবার সময় একবার প্রণাম করে যেতাম। আর ধরুন, আজকের এই আনন্দের দিনে—

ভ্রুকুটি করে ইরা বলে, আনন্দের দিন তাতে সন্দেহ কি। তার পর ?

আনন্দের দিনটা উপলক্ষ করে অতি-সামান্য একটা জিনিস—

সোনালি খাপের দামি এক কলম বের করল পকেট থেকে। ইরাবতী বাঁ-হাতে কপালের অবাধ্য অলকগুচ্ছ তুলে দিয়ে মুখোমুখি তাকাল। অরুণের ধ্বক করে মনে আসে কেশর-ফোলানো এক সিংহী। অথচ হাসছে সে। হাসিমুখে কৌতুকের স্বরে বলে, কলম ? কলম কি হবে, কাঁচি দিলে বরঞ্চ কাজে আসত।

পঞ্চানন বুঝতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে থাকে। ইরা ঘাড় দুলিয়ে বলে, হ্যাঁ—তাই তো বলছিলেন ওঁরা। আমার বাবার কাজ কলমের তো নয়, কাঁচি আর আঠার।

নিজে হাসে, পঞ্চাননও হেসে উঠল হো-হো করে। অরুণাক্ষ এতটুকু হয়ে যায়, না-না করে দু-একবার। কিন্তু দু-জনের হাসির তোড়ে ভেসে চলে যায় তার অস্ফুট আপত্তি। দলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু নিজে কিছু বলে নি—একথা কেমন করে বোঝাবে এই প্রগল্‌ভাকে ?

পঞ্চানন বলে, পুরানো কাগজপত্র ঘেঁটে ঘেঁটে উদ্ধার করা—অমুক লোকটা এই বলেছিল, তমুক জায়গায় এই লেখা আছে—সে যে কী কষ্ট, লোকে যত্ন করে পড়ে না বলেই এমনিধারা বলাবলি হয়। পড়ে দেখলে কদরটা বুঝত।

ইরা অরুণকে দেখিয়ে ভালমানুষের ভাবে বলে, কিন্তু ইনি ইতিহাসের ছাত্র। অন্য কেউ না হোক, ইনি ভয়ানক রকম পড়েছেন—

অরুণ মরীয়া হয়ে বলে, পড়েছি বই কি!

শুধু পড়া? মুখস্থ বলে যেতে পারেন গড়গড় করে। অরুণাক্ষের পাংশু মুখের দিকে চেয়ে আবার হেসে ওঠে: ভয় নেই। মুখস্থ আমি ধরতে যাব না।

কৃতান্ত এসে পড়ে। অরুণাক্ষকে সে চেনে, ইলেকশনের সময়ে অনেকবার তাদের বাড়ি গিয়েছে। বলে, এই যে অরুণবাবু। অনুষ্ঠান মোটের উপর ভালই হল, কি বলেন?

অরুণাক্ষ ঘাড় নেড়ে কি বলল বোঝা গেল না। পঞ্চানন কলমটা হাতে নিয়ে দেখায়, উপহার নিয়ে এসেছেন ইনি।

কৃতান্ত তারিপ করে, বাঃ বাঃ। ডেকে দাও দাদাকে। একেবারে তাঁর হাতেই জিনিসটা দিয়ে দিন।

ইরা কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল, মাপ করবেন কাকাবাবু। অদৃষ্টে যে দুর্ভোগ ছিল, হয়ে গেল। এই সব উপহাসের জিনিস কক্ষণো আমি বাবাকে ছুঁতে দেবো না।

কৃতান্ত হাঁ-হাঁ করে ওঠে: কী রকম কথার শ্রী! এই যাঁরা এসেছেন—চেনো না এঁদের—হীরে-মাণিকের টুকরো। ভালবেসে শ্রদ্ধা করে দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে, তাই এটা-ওটা হাতে করে এনেছেন।

শ্রদ্ধা আর ভালবাসা। কেটে কেটে ব্যঙ্গের সুরে ইরাবতী বলে, দেশের লোক নাকি মাথায় তুলে নাচাবে! সরল আপন-ভোলা মানুষটিকে নানান কথায় ক্ষেপিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব মজা দেখেন। বইটা চোখেও দেখেন নি, অথচ লাইন ধরে ধরে নাকি মুখস্থ।

অরুণাক্ষ প্রতিবাদ করে, চোখে দেখি নি—কে বলে এমন কথা?

ইরা অগ্নিদৃষ্টি হেনে তাকে থামিয়ে দেয়, আমি বলছি। আমি জানি, আমি জানি।

বলতে বলতে এক লহমায় আগুন নিভে গেল জলের প্লাবনে। এত জল ছিল মেয়েটার দু-চোখে।

আমার বাবা কারো সাতে নেই পাঁচে নেই। পাগলামি করুন যা-ই করুন—নিজের ঘরে কিম্বা লাইব্রেরিতে বসে। কাউকে উপযাচক হয়ে কিছু বলতে যান না। বুড়োমানুষ বলে দয়া নেই, দল বেঁধে বাড়ি বয়ে তাঁকে অপমান করতে আসা—

কৃতান্ত বিরক্ত স্বরে বলে, এঁরা কেউ এমনি-এমনি বাড়ি আসেন নি। আমরাই আদর-আহ্বান করে নিয়ে এসেছি। আমরাই বা কেন বলি—দু-শ পাঁচ-শ নয়, যুগচক্রের দুই হতভাগা, আমি আর পঞ্চানন। তা হলে আমরা দু-জনই সকল দোষের মূল হয়ে দাঁড়ালাম।

কৃতান্তকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ইরাবতী অরুণাক্ষের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, আপনারা শিক্ষিত মানুষ—বাবার জন্মদিনের ব্যাপারে আজকের এই একটা দিন অন্তত রসিকতাগুলো না করলে পারতেন। আরও তো তিন-শ চোবট্টি দিন পড়ে রইল। এই বাড়িটা বাদ দিয়ে আরও কত শত বাড়িতে পার্কে-পথে ব্যঙ্গবিদ্রূপ চলতে পারত।

কৃতান্তর ধৈর্য থাকে না। এবারের ইলেকশনে না হয় এদের উল্টো বলেছে, পরেরটায় কি গতিক দাঁড়াবে কে বলতে পারে? এত উদ্যোগ-আয়োজন, মানুষজন ডাকাডাকি—শেষ পরিণাম তার এই দাঁড়াচ্ছে। একেবারে বোমার মতো সে ফেটে পড়ল:

কোন উটকো লোক কি বলেছে, তাই অমনি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল। বই না পড়ে থাকলে ফাঁসে লটকাতে হবে নাকি? বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি, দাদা নিজে ছাড়া ক-জন মানুষ

পড়েছে? আমাদের যে গায়ের জ্বালা! ফর্মার পাহাড় হয়ে আছে—হৈ-হৈ করলে তবু যদি দু-দশ জনের নজরে পড়ে, দশ-বিশখানা বিক্রি হয়ে যায়। তোমাদেরও গরলাভ ছিল না, খরচা উঠে গেলে মুনাফার ভাগ পেতে। পঞ্চানন বলেছিল, আমিও ষোল-আনা রাজি। চলুন—চলে আসুন অরুণবাবু। ঘাট হয়েছে এমন জায়গায় মানুষ-জন ডেকে আনা!

হাত ধরে ফেলে অরুণাক্ষর। অরুণ হাত ছাড়িয়ে নিল। কলম হাতে করে পঞ্চানন চুপচাপ ছিল, কলম সে অরুণাক্ষকে ফিরিয়ে দিল: না অরুণবাবু, জুতো মেরে গরু দান হয় না। আপনার জিনিস নেওয়া চলবে না। ফিরিয়ে নিয়ে যান।

ইরাবতী ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে দড়াম করে দরজা দিয়েছে। অরুণাক্ষ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে—সম্বিৎ লোপ পেয়ে গেছে যেন তার। পঞ্চাননের কথা কানে গেল না। ইরার দুই গাল বেয়ে দরদর ধারে জল পড়ছিল, বিস্রস্ত কেশপাশ। ঘরে খিল এঁটে দিয়েছে, অবমানিতা মেয়ের সেই ছবি তবু সে চোখের উপর দেখতে পাচ্ছে।

—পাঁচ—

বৃষ্টি, বৃষ্টি—কী বৃষ্টিটা হল তার পরে! শ্যামবাজার এই অবস্থায় কি করে যাওয়া যায়? মোটর আছে, কিন্তু কালীতলায় এত জল বেধেছে যে মোটরে হবে না, নৌকার দরকার। বাইরে থাক সুনন্দা, শহর কলকাতার গতিক তো জান না! ঐ জল মরতে এখন রাত দুপুর। খানাটেবিল সাজিয়ে থাক বসে ততক্ষণ। গিয়ে কি বলবে? অন্যত্র এক নিমন্ত্রণ ছিল—সেই যে মেয়েটাকে দেখেছিলে সেদিন, তাদের বাড়ি। তাইতে দেরি হয়ে গেল। বলে ফেলে বেধে যাক আবার এক দফা কুরুক্ষেত্র সেখানে। মেয়ে মাত্রেই বিষম ঝগড়াটে, পুরুষের মতন ভালমানুষ নয়। তার চেয়ে ফোন করে দাও—ফোন আছে ওদের উপরতলায়, তারা ডেকে দেবে: উঃ সুনন্দা, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, নাড়িতে জ্বর দেখা দিয়েছে, যেতে না পেরে কী যে হচ্ছে মনের মধ্যে!

যাওয়াই যখন হচ্ছে না, মোটর ঘুরিয়ে বই-পাড়াটা চক্কোর দিয়ে যাওয়া যাক। ফোন করে দেবে কোন এক দোকান থেকে, আর 'ভারতে ইংরাজ' একটা কিনে নেবে। রাত্রিবেলা বইটা পড়ে নিয়ে, কাল সকালেই বিশ্বেশ্বরের বাড়ি হুঙ্কার দিয়ে পড়বে: খুব যে বলা হচ্ছিল, বই মোটে চোখেই দেখি নি—চোখের জল ফেলা হয়েছিল। একজামিন করা হোক এবারে। জিতে গেলে যে-মুখে গালমন্দ হয়েছিল সেই মুখ টিপে টিপে হাসতে হবে কিন্তু। আমার নুন-চা খাওয়ার পরে যেমন ধারা হয়েছিল।

ও হরি, বইয়ের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। পাল্লা দিয়ে সবাই শক্রতা করছে। লাট সাহেবের নাতিপুতিরা কি না—আটটা বাজতে

না বাজতে দোকানে তালা এঁটে বইওয়ালারা সরে পড়ে। ব্যবসার গতিক কারো কাছে অজানা নেই। সারাদিন কাউণ্টারে বসে অপলক চোখে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে থাকা—নিতান্ত বোকাসোকা ও বাতিকগ্রস্ত ভিন্ন ফুটপাথ ছেড়ে কেউ ঘরে ঢোকে না। ভিড় জমে বটে দোকানের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে তার পরে। ছুঁচো, ইঁদুর ও আরশুলার মহামহোৎসব। ওরা আছে, বই তাই তো কিছু কাটে। শুধু খদ্দেরের ভরসায় থাকলে এক এডিশন কাবার হতে জন্মজন্মান্তর লেগে যেতো।

যাকগে, যাকগে। একটা দিনে কি আর হবে! আজ না হল, কাল। বাবুরা বুঝি আবার দশটার আগে দোকান খোলেন না। তাই হবে, আসা যাবে ঠিক দশটায়। আজকের পুরো একটা রাত্রি না-হক গেল।

পরের দিনও ঘুরে ঘুরে হয়রান। 'ভারতে ইংরাজ' শুনে দোকানদাররা হাঁ করে তাকায়। অকূল সমুদ্রে ভাসমান—এমনি গোছের মুখভাব।

কি মশায়, বইটা চোখেও বোধ হয় দেখেন নি? ইরার ভর্ৎসনাটা অন্যকে ছুঁড়ে মেরে বেশ খানিকটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। দেখ তবে, আমি একজন শুধু নই—ঢের ঢের আছি আমরা এক দলে।

বলে, বই না দেখুন, সকালের খবরের কাগজটাও কি দেখেন নি? লেখক মশায়ের যে বিরাট সম্বর্ধনা হয়ে গেল।

দোকানদার নিরুৎসুক কণ্ঠে বলে, ও তো হচ্ছেই মশায় আজকাল। লেখক মাত্রেই তালেবর; আর যে বই বেরোচ্ছে, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর তিনকালের মধ্যে নাকি অমনটি আর হয় না। তা খদ্দেরও আবার তেমনি ঘড়েল। সহজে নড়াচড়া করবে না। বলে, বিজ্ঞাপনের ডামাডোল থামুক তো আগে, চতুর্দিকে থিতিয়ে আসুক—তারপরে দেখা যাবে।

দশ-বারোটা দোকান খোঁজবার পর একজনের কাছে হদিস পাওয়া গেল।

বাজার চুঁড়ে পাবেন না, কেউ রাখে না ও-মাল। যুগচক্র ছেপেছে, গলার কাঁটা নামাবার জন্য আঁকুপাঁকু করছে। সেখানে চলে যান—একখানা চাইলে তিনখানা চাপাবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু যুগচক্রে যাওয়া চলে কেমন করে—ইলেকশনের মরশুমে যেখানে একদিন দলবল সহ গিয়ে কৃতান্তকে যাচ্ছে-তাই করে বলে এসেছিল। 'ভারতে ইংরাজ'-এর খাতিরেও যাওয়া চলে না সেখানে।

আপনারা এক কপি দয়া করে আনিয়ে দিন। বিকেলে আসব।

বেশ, দেবো তাই। বিকেল-টিকেল নয়—যুগচক্র কি এখানে? কাল সন্ধ্যেবেলা।

আরো দুটো দিন বরবাদ। দুই আর একে তিন—তিন-তিনটে দিন মেয়েটার কাছে দোষী হয়ে রইল। কিন্তু তড়িঘড়ি দিচ্ছে এনে কে? ঘাড় নেড়ে অতএব সায় দিতে হয়।

দোকানদার আগের কথার জের ধরে বলে, ব্যবসা করতে বসেছি। খদ্দেরে চাইলে—যুগচক্র কোন ছার, সুন্দরবনে গিয়ে বাঘের দুধ দুয়ে ঘটিতে করে এনে দেব। কিন্তু পুরো দামটা চুকিয়ে দিতে হবে মশাই। কিছু মনে করবেন না—বিতিকিচ্ছি বই বলেই। কালকেতু-রোমাঞ্চ সিরিজ হলে কি আর আগাম চাইতে যেতাম? অর্ডার দিয়ে তারপরে ধরুন আপনি আসতে ভুলে গেলেন। তখন জোঁক ঠোঙাওয়ালা ছাড়া বই কাটাবার অন্য গতিক নেই।

অরুণাক্ষ বলে, আমি কিছু মনে করছি নে। দয়া করে আনিয়ে দিচ্ছেন—দাম কত বলে দিন, পুরো টাকাই জমা দিচ্ছি।

দোকানদার মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। নিজে দাম জানে না, কর্মচারীরাও নয়। দুনিয়ায় কত রকম খেয়ালের মানুষ আছে—

না বাজতে দোকানে তালা এঁটে বইওয়ালারা সরে পড়ে। ব্যবসার গতিক কারো কাছে অজানা নেই। সারাদিন কাউন্টারে বসে অপলক চোখে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে থাকা—নিতান্ত বোকাসোকা ও বাতিকগ্রস্ত ভিন্ন ফুটপাথ ছেড়ে কেউ ঘরে ঢোকে না। ভিড় জমে বটে দোকানের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে তার পরে। ছুঁচো, ইঁদুর ও আরশুলার মহামহোৎসব। ওরা আছে, বই তাই তো কিছু কাটে। শুধু খদ্দেরের ভরসায় থাকলে এক এডিশন কাবার হতে জন্মজন্মান্তর লেগে যেতো।

যাকগে, যাকগে। একটা দিনে কি আর হবে! আজ না হল, কাল। বাবুরা বুঝি আবার দশটার আগে দোকান খোলেন না। তাই হবে, আসা যাবে ঠিক দশটায়। আজকের পুরো একটা রাত্রি না-হক গেল।

পরের দিনও ঘুরে ঘুরে হয়রান। 'ভারতে ইংরাজ' শুনে দোকানদাররা হাঁ করে তাকায়। অকূল সমুদ্রে ভাসমান—এমনি গোছের মুখভাব।

কি মশায়, বইটা চোখেও বোধ হয় দেখেন নি? ইরার ভর্ৎসনাটা অন্তকে ছুঁড়ে মেরে বেশ খানিকটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। দেখ তবে, আমি একজন শুধু নই—ঢের ঢের আছি আমরা এক দলে।

বলে, বই না দেখুন, সকালের খবরের কাগজটাও কি দেখেন নি? লেখক মশায়ের যে বিরাট সম্বর্ধনা হয়ে গেল!

দোকানদার নিরুৎসুক কণ্ঠে বলে, ও তো হচ্ছেই মশায় আজকাল। লেখক মাত্রেই তালেবর; আর যে বই বেরোচ্ছে, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর তিনকালের মধ্যে নাকি অমনটি আর হয় না। তা খদ্দেরও আবার তেমনি ধড়েল। সহজে নড়াচড়া করবে না। বলে, বিজ্ঞাপনের ডামাডোল থামুক তো আগে, চতুর্দিকে থিতিয়ে আসুক—তারপরে দেখা যাবে।

দশ-বারোটা দোকান ঘোরবার পর একজনের কাছে হদিস পাওয়া গেল।

বাজার ঢুঁড়ে পাবেন না, কেউ রাখে না ও-মাল। যুগচক্র ছেপেছে, গলার কাঁটা নামাবার জন্য আঁকুপাঁকু করছে। সেখানে চলে যান—একখানা চাইলে তিনখানা চাপাবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু যুগচক্রে যাওয়া চলে কেমন করে—ইলেকশনের মরশুমে যেখানে একদিন দলবল সহ গিয়ে কৃতান্তকে যাচ্ছে-তাই করে বলে এসেছিল। 'ভারতে ইংরাজ'-এর খাতিরেও যাওয়া চলে না সেখানে।

আপনারা এক কপি দয়া করে আনিয়ে দিন। বিকেলে আসব।

বেশ, দেবো তাই। বিকেল-টিকেল নয়—যুগচক্র কি এখানে? কাল সন্ধ্যেবেলা।

আরো দুটো দিন বরবাদ। দুই আর একে তিন—তিন-তিনটে দিন মেয়েটার কাছে দোষী হয়ে রইল। কিন্তু তড়িঘড়ি দিচ্ছে এনে কে? ঘাড় নেড়ে অতএব সায় দিতে হয়।

দোকানদার আগের কথার জের ধরে বলে, ব্যবসা করতে বসেছি। খদ্দেরে চাইলে—যুগচক্র কোন ছার, সুন্দরবনে গিয়ে বাঘের দুধ দুয়ে ঘটিতে করে এনে দেব। কিন্তু পুরো দামটা চুকিয়ে দিতে হবে মশাই। কিছু মনে করবেন না—বিতিকিচ্ছি বই বলেই। কালকেতু-রোমাঞ্চ সিরিজ হলে কি আর আগাম চাইতে যেতাম? অর্ডার দিয়ে তারপরে ধরুন আপনি আসতে ভুলে গেলেন। তখন তো ঠোঙাওয়ালা ছাড়া বই কাটাবার অন্য গতিক নেই।

অরুণাক্ষ বলে, আমি কিছু মনে করছি নে। দয়া করে আনিয়ে দিচ্ছেন—দাম কত বলে দিন, পুরো টাকাই জমা দিচ্ছি।

দোকানদার মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। নিজে দাম জানে না, কর্মচারীরাও নয়। দুনিয়ায় কত রকম খেয়ালের মানুষ আছে—

বই লেখায় যখন ট্যাক্সো নেই, লিখে গেলেই হল। সব মালের দাম মুখস্থ রাখতে গেলে তো জীবন থাকে না। কিনতে এসেছেন— আপনিও জানেন না মশাই? কি রকম মোটা হবে বইটা—ওজন কত, দেড় পোয়া—আধ সের? নেড়েচেড়ে দেখেন নি?

আন্দাজ মতো দশ টাকা জমা দিয়ে অরুণ বাড়ি চলে গেল। তারপরেও কি কম নাজেহাল। আজকে মশায় ভুল হয়ে গেছে। যুগচক্র কি এখানে? একখানা বইয়ের জন্য কে যায় অদ্দুর ট্রাম ভাড়া করে? কতই আর কমিশন পাব—পড়তায় পোষাবে না। আরও দু-চারখানার অর্ডার জমুক না।

অরুণাক্ষ বলে, গাড়িভাড়াও ধরে নেবেন বইয়ের দামের উপর।

জিভ কেটে দোকানদার বলে, সে কি চলে মশায়? ফার্মের বদনাম হবে। এত জরুরি বুঝতে পারি নি। যাক গে, এদ্দিন তো ঘুরলেন—কাল, নির্ঘাৎ কাল পেয়ে যাবেন। সন্ধ্যের দিক আসবেন, কাল আর ফিরতে হবে না।

তবু ফিরতে হল। এবং শুধু সেদিন বলে নয়, আরও অনেক সন্ধ্যায়। বিস্তর ঘোরাফেরার পর বইটা হাতে এলো।

হাতে এলো অবশেষে, কিন্তু এগুলো যায় কই? বিশেশ্বর মুখে মুখে তো মন্দ বলেন না, কলম ধরলেই কি যত পাণ্ডিত্যে পেয়ে বসে। যত লেখা, তার ডবল ফুটনোট। যেন কাঁটা-ছড়ানো পথের উপরে চলা। আধ পাতা পড়েই মাথা ঝিমঝিম করে, হাত-পা মেলে টান-টান হয়ে শুয়ে জিরিয়ে নিতে হয়। আর ভেবেছিল কিনা, একরাত্রে বই শেষ করে পরের দিন ইরার কাছে হুমকি দিয়ে পড়বে। কি লেখাই লিখেছেন ভদ্রলোক। শাঁস হয় তো কিছু আছে, কিন্তু খোলা ভেঙে কার সাধ্য আস্বাদন নেবে? বই-

সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধারে একটা মাস তো কাবার হতে চলল ; কবে শেষ হবে, তার কোন ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না।

এর মধ্যে একদিন সুনন্দা ও তার মা সাবিত্রী দেবী এসে পড়লেন।

সুনন্দা বলে, এমন অসুখ যে আমাদের নিমন্ত্রণে যেতে পারলেন না। অথচ পরের দিন আর পাত্তা পাওয়া যায় না।

সাবিত্রী বলেন, উনি তো শয্যাশায়ী, নড়ে বসতে পারেন না। বললেন, আহা একলাটি অসুখে পড়ে রয়েছে—দেখে এসো তোমরা বাছাকে। তা তিন-তিন দিন এসে গেছি। কিছু বলে নি তোমার চাকর ?

হুঁ—বলে তাড়াতাড়ি অরুণ অন্য কথা পাড়ে : এখন আছেন কি রকম ?

সাবিত্রী বলেন, যেমন দেখে এসেছিলে তার চেয়ে অনেক খারাপ। বাইরে বাইরে থাকি, কলকাতায় আমাদের জানা-শুনো নেই। তোমার বাবার ভরসায় করে এলাম। তিনি পাড়াগাঁয়ে গিয়ে রইলেন। নন্দার পিশেমশাই ওঁদের ভবানীপুরের এক ডাক্তার পাঠিয়ে দিলেন, তাঁর অষুধ চলছে। কোন উপশম নেই। তাই বড় ভাবনা হচ্ছে বাবা।

সুনন্দা বলে ওঠে, আপনি সেই দু-হপ্তা আগে গিয়েছিলেন—তার পর একটিবার খোঁজ নিলেন না, আছি কি মরেছি আমরা।

শেষ দিকটায় গলার স্বর যেন ভারী। অরুণাক্ষ বেকুব হয়ে বলে, ইয়ে—মানে, একজামিন কিনা, সময় করে উঠতে পারিনে—

এখন এগজামিন কিসের ?

সেকালে মেয়েরা মুখ্যুসুখ্যু ছিল। দিব্যি ছিল—কথায় কথায় উকিলের জেরায় পড়তে হত না এমন। অরুণ জবাব দেয়, এখন মানে কি আজকেই ? কলেজ খুলে গেলে তার পরে—

কৈফিয়ৎটা তেমন লাগসই না হওয়ায় আবার জুড়ে দেয়, জামিন কড়া একজামিন। ফেল হলে সর্বনাশ। বই যোটে পাওয়া যায় না—তা পেয়ে গেছি অনেক কষ্টে। জীবনপণ করে লেগেছি।

সাবিত্রী বলেন, তোমায় টানাটানি করে কী-ই বা হবে। তুমি তো ডাক্তার নও। কানপুর থেকে এই অবস্থায় টেনে নিয়ে এলাম তোমায় বাবার মতন ধন্বন্তরি রয়েছেন বলে। উনিও তাই বললেন, অনুকূলডাক্তারের কাছে পৌঁছে দাও—তারপর কারো কিছু করতে হবে না। তা এমনি অদৃষ্ট, বাড়াবাড়ির সময়টা তাঁকে একবার পাচ্ছি না। বাসায় এইভাবে চলবে, না হাসপাতালে ব্যবস্থা করতে হবে, কোন-কিছু ঠিক করা যাচ্ছে না।

সুনন্দার বাপ বাতে পঙ্গু হয়ে আছেন—সে ব্যাধি দু-চার দিনে সারবার নয়। তা নিয়ে এত বেশি দুশ্চিন্তারও হেতু নেই। যে কেউ লক্ষণ দেখে রোগ বুঝতে পারে। কেবল সাবিত্রী বুঝবেন না, তাঁকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা বৃথা। অরুণাক্ষ বলে, এসে যাবেন বাবা খুব শিগগির।

সে তো কতদিন থেকে শুনছি।

না, আসবেনই। না এসে উপায় নেই। অবস্থা চরম হয়ে উঠেছে। আর দেরি করলে রোগিরাই দল বেঁধে আমাদের মণিরামপুরের বাড়ি অবধি হামলা দিয়ে পড়বে।

হেসে একথা-সেকথা শুরু করে, সাবিত্রীর একঘেয়ে কাঁদুনি কাঁহাতক আর ভাল লাগে? বলে, যা জীবন ডাক্তারের। শীত নেই বর্ষা নেই, দুপুর নেই রাতদুপুর নেই, সংসার নেই বিশ্রাম নেই—সর্বক্ষণ রোগের পিছু পিছু ছুটে বেড়ানো। আমারও ডাক্তার হবার কথা মাসিমা। বাবা তাই চাচ্ছিলেন। বাঁধা পশার—এমন কি এ.রায়-ছাপা নামের প্যাডটাও বদলাতে হত না। কিন্তু মা

কাত হয়ে পড়লেন। ডাক্তার কিছুতে হতে দেবেন না। তাই, এম-বি-র পরে তাই আর্টিসে চলে গেলাম।

গল্পগুজবে চলল খানিকক্ষণ। সাবিত্রী ছাড়েন না, ওরই মধ্যে স্বামীর রোগের লক্ষণ সবিস্তারে শুরু করেন এক একবার। অরুণ বিব্রত হয়ে পড়ছে। রোগিরা বাবার কাছেও অমনি এসে বসতে থাকে। বাবা নেই, সে জায়গায় তাকে ডাক্তারির ধকল নিতে হবে নাকি! মাঝে মাঝে আজে-বাজে রোগিও এমনি তার ঘরে ঢুকে পড়ে। আজকে আবার একখানা চিঠি ছাড়তে হবে—চলে এসো শিগগির। অ্যাসেম্বলিতে বাবা সত্যিই যদি দাঁড়ান, কোন একটা পার্টির ছাপ চাই। একলা নিজের পায়ে দাঁড়ানো চলে না। গণতন্ত্রের সরঞ্জাম অশেষ, কলকব্জা অজস্র—যথাযথ সেইসব খাটিয়ে নিতে পারলে তবে কেল্লা ফতে। কিন্তু গোড়াতেই মুশকিল দেখা দিচ্ছে—সেদিন প্রফুল্ল দত্তর বাড়ির বৈঠকে অনেকেরই দোমনা ভাব। ইংরেজের গোলাম রায়-বাহাদুর কাশীশ্বর রায়ের নাতিকে কে ভোট দেবে? অর্থাৎ আরও সব উমেদার আছে, তাদের তদ্বিরতাগাদা ও বন্দোবস্ত চলেছে ভিতরে ভিতরে।

সমস্ত জানিয়ে আগেই সে চিঠি দিয়েছে। সোজাসুজি বাবাকে নয়—গোমস্তা সহদেব বর্ধনের নামে। বাবার উপর কিছু বলবে মা ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি দুনিয়ার উপর নেই। আজকে আরও জরুরি করে লিখবে মাকে—চলে এসো মা, তা ছাড়া উপায় নেই। নিজের পড়ার ঠেলায় হিমসিম হচ্ছি, তার উপরে নানান রকম উপদ্রব। মাথা খারাপ হয়ে যাবে আর ক'দিন এমনি অবস্থায় থাকলে।

তাই বটে! দৈত্যাকার এই 'ভারতে ইংরাজ'—ক'মাস কিম্বা ক'বছর লাগবে যে শেষ হতে, আদপেই শেষ হবে কিনা, কিছু বলা যাচ্ছে না। অরুণাক্ষের বদলে তেনজিং নোরকে হলেও পারতেন

না করতে। এভারেস্ট-চূড়ার চেয়ে এ কিছু কম শক্ত নয়। তার উপরে, এই দেখুন, সাবিত্রী দেবী সুখ-দুঃখ ভাবনা-উদ্বেগের বস্তা খুলে বসে গেলেন।

শেষটা ধরে বসলেন, ভবানীপুরে আমার সেই ননদের বাড়ি যাই চলো। রোগের গতিক বোঝা যাচ্ছে না—কদ্দিন চুপচাপ থাকা চলে? চলো, তোমার মুকাবেলা নন্দাইয়ের সঙ্গে যুক্তিপরামর্শ করে দেখা যাক।

অরুণ বলে, আমি গিয়ে কি করব মাসিমা, রোগপীড়ের কিচ্ছু আমি বুঝিনে।

সুনন্দা ফোড়ন কাটে, বাড়িতে এত রোগি আসে—শুনে শুনেই তো কত শেখা হয়ে যায়।

অরুণ হেসে উঠে বলে, বাবার ঘরে যাব রোগের লক্ষণ শুনতে—কি বলছেন, ঘাড়ের উপর একটা বই দুটো মাথা নেই তো আমার!

কিছুতে রেহাই হল না। নিয়েই যাবে। সুনন্দা বলে, এই অবেলায় বই মুখে দিয়ে কতটুকু পড়া হবে বলুন দিকি? বেড়িয়ে এলে আবার মন বসবে!

সাবিত্রী বলেন, চলো বাবা। একটু যদি ক্ষতিই হয় কি আর করবে? এখানে কাউকে তো চিনিনে তোমরা আর ভবানীপুরের ওঁরা ছাড়া। দুটো মুখের কথা বলে ভরসা দেবারও মানুষও নেই।

কী বলা যায় এর উপরে। সুবিখ্যাত প্রতুল দত্তের বাড়ি—ক'দিন আগের ডাক পেয়ে অরুণ এখানে এসেছিল, বৈঠক হয়েছিল। প্রতুল বাড়ি নেই। দশের কাজ করে করে ফুরসৎ পান না, ঘরবাড়ি আত্মীয়-কুটুম্বের দিকে নজর দেবার সময় কোথা? কখন ফিরবেন ঠিকঠিকানা নেই। আগে থেকে ফোন না করে এলে এমনি হয়।

অরুণ বলে, চলে যাই তা হলে আমি। আপনারা কথাবার্তা বলে পরে যাবেন। আমার একজামিনের পড়া।

বড় মেয়ে শোভা এসে বলে, এসেই চলে যাচ্ছেন, তাই হয় কখনো! বাবার আসা পর্যন্ত না পারেন, থাকুন আর কিছুক্ষণ। আলাপ-পরিচয় হোক, গল্পসল্প করি।

অর্থাৎ জলটল না খাইয়ে ছেড়ে দেবে না। আর সুপ্রীতি কেমন সন্দেহজনক।

শোভা আবার বলল, পুরুষমানুষ কেউ নেই—বৈঠকখানায় কি, উপরে চলে আসুন। মা বলছেন।

পিছু পিছু তখন উপরে উঠতে হয়। বাড়িতে বিস্তর মেয়ে, উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে এদিকে ওদিকে। চাপা কথাবার্তা, হাসি-হাসি মুখ। অবস্থা মালুম হল এতক্ষণে। ছি-ছি, এমন ভাবে এদের সঙ্গে চলে আসা উচিত হয় নি। সুনন্দার ভাবী স্বামী বলে তাকে ধরে নিয়েছে। সাবিত্রী বোনের বাড়ি জামাই দেখাতে এসেছেন। মতলব করেই এসেছেন—কী লজ্জা, কী লজ্জা!

আর, কি কাণ্ড, উপরে উঠতে উঠতে ইরাবতীর সঙ্গে দেখা। সে নামছে। অরুণাক্ষ আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

আপনি এখানে?

এই বাড়িতে পড়াই আমি। শোভার বোনকে। আমি মাস্টারনি।

তারপর খানিকটা গায়ে-পড়া ভাবে বলল, সকাল সকাল চলে যাচ্ছি। এত সকালে ছাড় পাবার কথা নয়। কিন্তু ছাত্রী পড়ল না, তার কোন জামাইবাবু এসেছেন।

ছাত্রী সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। ইরাকে একটু ঠেলে দিয়ে চাপা গলায় বলে, আঃ ইরা-দি, আপনি যেন কি! ইনি তো সেই—

ধুপধাপ করে অনেকখানি নেমে গিয়েছে তারা। সেখান থেকে জিজ্ঞাসা করছে, বর কি রকম দেখলেন, বলুন ইরা-দি।

ইরার উচ্ছ্বাস অরুণাক্ষের কানে গেল, খাসা বর—চমৎকার বর!

পাকে-চক্রে কী হয়ে গেল, দেখ! 'ভারতে ইংরাজ' হবে সমাধা হয় হোকগে, আপাতত কাল সকালেই যেতে হচ্ছে বিশ্বেশ্বরের বাড়ি। মেয়েদের ঐ নাচুনে স্বভাব—তাঁরা বদনাম দিলেন, তা বলে সত্যি সত্যি আমি কি মাথায় টোপর চড়িয়ে বর হয়ে বসছি! বাবার ইচ্ছা থাকতে পারে কিন্তু আমারও মতামত আছে একটা। তোমার ছাত্রীকে আচ্ছা করে শাসন করে দিও ইরা, ঐ বয়সে এমন কাজিল হবে কেন?

ছুটো গলি এক জায়গায় পড়েছে, মোড়ের উপর পুরানো শিব-মন্দির। তার একটু ওদিকে বিশ্বেশ্বরের বাড়ি। বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে গলিটুকু হাঁটতে হাঁটতে অরুণাক্ষ মন্দিরের পাশে এলো। এসে থমকে দাঁড়ায়। জন কয়েক রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি লাগিয়েছে। বিশ্বেশ্বর নেমে এসে জানলা খুলে ভিতর দিকে দাঁড়ালেন।

কি হল বিশ্বেশ্বরবাবু, আজকে দেবার কথা ছিল না?

বিশ্বেশ্বর কাতর হয়ে বলছেন, আস্তে বলুন মশায়, আস্তে—

বাপু-বাছা বলে থামাবার চেষ্টা করছেন—পাড়ার মধ্যে চাউর হয়ে পড়বে, বোধ করি এই ভয়ে। কিন্তু শুনবার পাত্র কি লোকগুলা? উত্তমর্ণের মেজাজই আলাদা।

আজ দেবো কাল দেবো বলে কতকাল হাঁটাচ্ছেন বলুন দেখি? লজ্জাও করে না!

বিশ্বেশ্বর বিপন্ন কণ্ঠে বললেন, তা সত্যি। অন্যায় হচ্ছে বড্ড। কিন্তু চেষ্টার কসুর নেই, পেরে উঠছিনে আমি। বিশ্বাস করুন, সাধ্যে কুলাচ্ছে না।

অরুণ অনেকটা এগিয়ে এসেছিল। মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি মন্দিরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এমনি ভাবে এসে পড়ে লজ্জা বোধ করছে। দেখবে আর একটুখানি—এমনি তাগিদ যদি চলতে থাকে, টিপিটিপি সরে পড়বে। এই হল লেখকদের অবস্থা—অনটনে অর্থাভাবে শতেক লাঞ্ছনা-অপমান মাথায় নিয়ে তবে জ্ঞানের চর্চা করতে হয়।

অনুনয়-বিনয়ের ফলে অবশেষে এ-পক্ষের সুরটা কিছু নরম হল।

ঠিক করে বলে দিন, কোন তারিখে আসব। এবারে যেন কথার খেলাপ না হয়।

বিশ্বেশ্বর পরম কৃতার্থ হয়ে বলেন, বেশ, আসবেন আপনি মঙ্গলবারে।

ঐ দিন আবার যদি ওয়াদা করেন, কক্ষণো শুনব না আমি।

না, না—পেয়ে যাবেন এবারে।

ভিতরে বিশ্বেশ্বর এবং বাইরে অন্যান্যদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করে সে লোকটি গটগট করে চলে গেল।

পরের জন—

আমায় বলুন একটা-কিছু। আমি কবে আসব?

বিশ্বেশ্বর বললেন, ওঁকে মঙ্গলবারে বলে দিলাম। তার পরে তিনটে দিন বাদ দিয়ে আসবেন আপনি। বেশি চাচ্ছিনে, মাত্তোর তিন দিন। শনিবারে আপনাকে দেব।

লোকটা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, তিন দিন হতে পারে না—কিছুতে না। খুব বেশি তো দুটো দিন। শুক্কুরবারে আসব। আমায় ডোবাবেন নাকি মশায়?

বেশ, তাই—

মাসখানেক ধরে বলে আসছেন, সে রকম নয় তো?

না, না—এবারে ঠিক।

কিন্তু পাওনাদার কি একটা-দুটো? নতুন নতুন আসছে আরও। আহা, পঙ্গপালের মতো ছেঁকে ধরছে বুড়ো মানুষটাকে।

অসহায় দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বিশ্বেশ্বর বলেন, চেষ্টার কসুর নেই আমার। কিন্তু আপনি একা নন, সেটাও বুঝে দেখবেন একবার।

লোকটা আরও খাপ্পা হয়ে বলে, হ্যাঁ—হ্যাঁ, বুঝি বই কি! সবাই পেয়ে যায়—আমার সঙ্গে যত ধোঁকাবাজি আপনার।

বিশ্বেশ্বর মরমে মরে গেলেন, আজ্ঞে না। সাধ্যে কুলোয় না বলেই···একেবারে অসাধ্য হয়ে পড়েছে।

সহসা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, আস্তে মশায়, আমার মেয়ে আসছে।

চক্ষের পলকে পাওনাদারের দল ভদ্র হয়ে গেল। ভয়-দেখানো কথা নয়—মোড় পার হয়ে সত্যি সত্যি ইরার মূর্তি দেখা দিয়েছে। সকালে সন্ধ্যায় সে দু-জায়গায় পড়ায়। সকালবেলা ফিরবার মুখে বাজারটা ঘুরে আসে। আজকেও তাই, একটা বড় থলিতে আনাজ-পত্র ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে। এসে দাঁড়িয়ে সে ভ্রূকুটি করল।

বাবা, তুমি জানলার ওখানে—হুঁ, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, মেরে ফেলবেন নাকি আপনারা মানুষটাকে? যা অত্যাচার লাগিয়েছেন—আমি বলে দিচ্ছি, কিচ্ছু কেউ পাবেন না। দয়া করে আর আসবেন না।

অরুণাক্ষের দিকে অপাঙ্গে একটু তাকিয়ে বলে, এমনি ভাবে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকলে পথের লোকেই বা কি মনে করবে!

যেন কেউটের মুখে টোকা পড়েছে। কেউ আর মেজাজ দেখায় না। সেই রগ-চটা লোকটা মিহি সুরে বলল, বটেই তো! জানলা আটকে দাঁড়াবেন না আপনারা, চলে যান। আসি তবে দাদা, শুক্রবারে কথা রইল।

সুড়সুড় সকলে সরে পড়েছে। অরুণাক্ষের মুখোমুখি ফিরে দাঁড়িয়ে ইরাবতী বলল, আপনার কি চাই? আপনারও কাগজ আছে?

কাগজ কিসের? বুঝতে না পেয়ে অরুণ হতভম্বের মতো তাকায়।

ঐ যত এসেছিলেন, সবাই কাগজের লোক। পুজো কবে তার ঠিক নেই—এখন থেকেই পুজো-সংখ্যার লেখায় তাগিদ। কাগজ যদি নেই, আপনি কি জন্যে তবে এঁদের দলে ?

অরুণ আমতা-আমতা করে বলে, কারো দলে নই আমি। এই পথে এমনি যাচ্ছিলাম।

ইরা কঠিন হয়ে উঠল : যাচ্ছিলেন—লোকের হট্টগোল শুনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মজা দেখতে নেমে এলেন। ভাবলেন, দেনায় বিশ্বেশ্বর সরকারের চুল বিক্রি—সেদিনের চেয়েও বড় মজা। বড্ড নিরাশ হলেন, না ?

কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। বলে, আমার বাবা পাগল ক্ষ্যাপা—সরকার দয়া করে গারদের বাইরে রেখেছেন, নিখরচায় আপনারা পাগল দেখতে আসেন। একদিন ভুল করে আপনাদের বাড়ি ডেকে বসেছিলাম। অনেক তো হয়ে গেছে—শাস্তি এখনো শোধ হল না, কতকাল ধরে চলবে বলতে পারেন ?

কিছু বলতে দিল না, অরুণের কোন কথা কানে নিল না। ঝগড়াটে মেয়ে এক ছুটে বাড়ির ভিতর গিয়ে দড়াম করে দরজা দিয়ে দিল। বন্ধ দরজার সামনে অরুণাক্ষ লজ্জায় অপমানে ফুলতে লাগল।

অপমান করে মুখের উপর দরজা দিয়ে যায়, প্রতিশোধ চাই। পড়তেই হবে বইটা। বইয়ের ভুল বের করে কাগজে কাগজে লিখে নাস্তানাবুদ করবে। দুটো-পাঁচটা খুঁত বেরোবে না, এমন হতেই পারে না—বিশেষ করে ঐতিহাসিক গবেষণা যেখানে। নিজের বিদ্যেয় না কুলায়, সহপাঠীদের ডাকবে। নয় তো খুঁত বের-করা বিস্তর পণ্ডিত আছেন, তাঁদের শরণ নেবে।

ইন্দ্রাকে দেখেই বিশ্বেশ্বর জানলা থেকে সরে পড়েছিলেন। সন্তর্পণে এদিক-ওদিক চেয়ে আবার তিনি উদয় হলেন। মেয়ে ভিতরে চলে যেতে অরুণাঙ্ককে ডেকে চাপা গলায় প্রশ্ন করেন, কি বাবা, তোমার কি দরকার বল তো শুনি।

অরুণ উত্তেজিত স্বরে বলে, আপনার বইয়ে ভুল আছে। সেই সব আলোচনা করতে এসেছিলাম।

দাম্ভিক ঐতিহাসিক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এক মুহূর্তে। প্রবল ভাবে ঘাড় নেড়ে বিশ্বেশ্বর বললেন, আমার ভুল কক্ষণো হয় না—ওজন করে করে লিখি। ভুল তোমার। লাইব্রেরিতে যেও একদিন। উহুঁ, সেখানে বড্ড ভিড়—এইখানেই এসো একদিন—সকাল-সকাল এসো, মেয়ে যে সময়টা থাকে না। সব সন্দেহ মিটিয়ে দেব।

মরীয়া হয়ে লাগল অরুণাক্ষ। ভুল বের করবেই। বিশ্বেশ্বর ভালো লোক, তাঁকে নিয়ে কিছু নয়। যত আক্রোশ মেয়েটার উপর। ভাবতেও সুখ, ঐ দাম্ভিক মাথা মাটির দিকে নুয়ে পড়েছে, লজ্জায় ঘাড় তুলতে পারছে না। অধ্যাপকদের একজন হলেন ডক্টর গুণসিন্ধু আচার্য—এক দিক দিয়ে বিশ্বেশ্বরেরই দোসর, নিজে ছাড়া আর যে কেউ কিছু জানে, কদাপি স্বীকার করেন না। বিশ্বেশ্বরের কথাবার্তায় কেউ দোষ ধরে না, নিজে তিনি কাজের মধ্যে ডুবে আছেন সেই বিবেচনা করে। কিন্তু আচার্য সেই কোন যৌবন বয়সে থিসিস দিয়ে বাহবা পেয়েছিলেন। তারপর থেকে উপদেশ-বর্ষণ ছাড়া আর কোন কাজ নেই। ছেলেরা দু-চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু অরুণাক্ষ দায়ে পড়ে ঘন ঘন তাঁর বাসায় গিয়ে বাক্যসুধা পরিপাক করছে। একখানা 'ভারতে ইংরাজ' দিয়ে এসেছে তাঁকে। কিন্তু বইয়ের দাম আটটা টাকাই বরবাদ। গুণসিন্ধুর কেবল ফাঁকিবাজি। দেখা যাচ্ছে, ত্রুটি বের করার ব্যাপারে নিজেদের উপর নির্ভর ছাড়া গতি নেই।

বাবা-মা এসে পড়েছেন ইতিমধ্যে। বাড়ি জমজমাট।

অম্বুজাক্ষ একদিন দেখা করলেন প্রতুল দত্তর সঙ্গে। সেই কথা, নমিনেশনে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কাশীশ্বরের নাতি হলেন কিনা আপনি—

মেথর-মুদ্দফরাস বুঝি, কেউ আমাদের ছায়া মাড়াবে না?

প্রতুল বলেন, ইংরেজ আমলে যারা সব মজা লুটেছে এখন সাজা তাদের। লোকের মতিগতি এই রকম, আমার একার ইচ্ছেয় কি হবে বলুন ?

আরও কিছু কথাবার্তার পর অম্বুজাক্ষ মুখ কালো করে উঠলেন। ফিরে দাঁড়িয়ে আবার বলেন, আর শুনুন দত্ত মশায়, আপনার ভায়রাভাই আমার বাল্যবন্ধু। বাতে শয্যাশায়ী, কাল ওঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। উনি মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পাড়লেন। কিন্তু আজ-কালকার ছেলে, বোঝেন তো, তাদের নিজস্ব মতামত রয়েছে। ছেলের মায়েরও আপত্তি। আমার সঙ্কোচ হল, আপনি অনুগ্রহ করে জানিয়ে দেবেন—আমার একার ইচ্ছেয় কাজ হবে না।

দ্রুত এসে গাড়িতে উঠলেন। মণিরামপুর থেকে দাঁড়াবেন, সেখানে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে এসেছেন। আবার যাবেন। এরা কিছু না করে তো বয়ে গেল। মানুষগুলো কেনা-গোলাম নাকি যে এরা বললেই তবে ভোট দেবে ? এসব কথা বাড়িতে বলেন নি। বলে লাভ নেই। তা ছাড়া দেখা যাক, শেষ অবধি কি দাঁড়ায়—প্রতুল দত্ত খেলাচ্ছে কি না ?

কাজে বেরুনোর সময় কখনো কখনো তিনি অরুণের ঘরে উঁকি দিয়ে যান। খুব পড়ছে। এমন কি বিকালবেলা খেলাধুলার সময়টাও বেরোয় না। অর্থাৎ জেদ চেপেছে, শেষ পরীক্ষাটায় ভাল রকম কিছু করবেই। ভালো, খুব ভালো। যা ছেলে—মন করে লাগলে ও যে পয়লা কয়েক জনের ভিতরে থাকবে, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।

সুহাসিনীর কিন্তু ভালো লাগে না। হৈ-হল্লা করে বেড়ায় ছেলে—এ তার কি হয়েছে, রাত-দিন ঘরের মধ্যে বই মুখে গুঁজে পড়ে আছে। পড়ার ব্যাপার নিয়ে কর্তা ঘা দিয়ে দিয়ে যেমন করে বলেন, গ্লানি হয়েছে ছেলের মনে। মায়ের প্রাণ মোচড় দিয়ে ওঠে।

ঘরের মধ্যে গিয়ে ছেলের মুখোমুখি বসে পড়লেন।

কি হয়েছে, খুলে বল্ তো আমায়।

পরীক্ষার পড়া—

পরীক্ষা তো আসছে বছর—

সে হল য়্যুনিভার্সিটির পরীক্ষা মা, তাতে আর কতটুকু পড়তে হয়। তোমার ছেলে তাতে ডরায় না। বরাবর তো দেখে আসছ, না পড়েশুনে তুড়ি মেরে বেরিয়ে আসি।

সুহাসিনী অত শত বুঝলেন না। খোলা বইটা তুলে নিয়ে দেখে উল্টেপাল্টে অবজ্ঞা ভরে বললেন, আজকাল বাংলা বই পড়ায় নাকি তোদের ?

অরুণাক্ষ হেসে বলে, বাংলা বলেই তো বেশি কড়া। বাংলাতেই বেশি রকম গণ্ডগোল। ইংরেজি অনেক সহজে বোঝা যায়। দেশ স্বাধীন হয়ে এই সব হচ্ছে।

না, অতি-সাবধানী মানুষ বিশ্বেশ্বর। দেখেশুনে নানান রকমে পরীক্ষা করে তবে এক এক লাইন ছাড়েন। এ মানুষকে বেকায়দায় ফেলা অসম্ভব। অন্তত অরুণাক্ষের বিদ্যায় কুলোবে না। তবু আশায় আশায় এগোচ্ছে। অধ্যবসায়ে হয় না, এমন কঠিন কর্ম দুনিয়ায় নেই। তার একটা প্রমাণ, 'ভারতে ইংরাজ'ও শেষ হয়ে এলো। দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ে এসে পড়েছে। এখন যেন জমেও উঠেছে—গল্পের টানে টানে পড়া হয়ে যাচ্ছে, কসরত করতে হয় না। উনিশ শতকের অর্ধেক ছাড়িয়ে এসেছে। মানুষগুলো দিব্যি চেনা-চেনা। নীলের চাষ খুব চলেছে। একটু গঞ্জ মতো জায়গা হলেই সেখানে নীলকুঠি। গোড়ায় গোড়ায় খুব সম্প্রীতি নীলকর সাহেবদের সঙ্গে। তারা খালি গায়ে খালি পায়ে মাঠের জলকাদা ভেঙে চাষ-আবাদ দেখে। তামাক খায় গড়গড়ায়। বাংলা কথাবার্তা বলে, কালীপুজো দেয়, জোড়া-মুরগী মানত করে মাদারের থানে, সামিয়ানার নিচে যাত্রার আসরে বসে

গান শোনে রাত দুপুর অবধি। দায়ে-বেদায়ে পড়শিদের দেখাশুনো করে, সিকিটা আধুলিটা দেয়। সাত সমুদ্র পারের এই সব জলজঙ্গল সাপ-বাঘের গাঁয়ে মেমসাহেবরা এসে থাকতে পারবে না, এরাও গরজ করে না তাদের এ দেশে নিয়ে আসবার জন্য। দেশি কালো মেয়ের সঙ্গে মানিয়েগুছিয়ে ঘর করে…

তাই বটে। তাদের মণিরামপুর গাঁয়ের হাড়িপাড়ায় একটা আধ-ফর্সা মেয়েলোক দেখেছিল অরুণাক্ষ। বয়সকালে রীতিমত সুন্দরী ছিল, এখনকার চেহারা থেকেই বোঝা যায়। ত্রিসংসারে দেখাশুনার কেউ নেই, বড্ড কষ্ট তার। এর বাড়ি ওর বাড়ি ঢেঁকিতে ধান ভানে, চিঁড়ে কোটে। এই সব করে দিন চলে। লোকে নামটা দিয়েছে ভারি মজার—মেম-ভাঁড়ানি। যারা ধান ভেনে বেড়ায় তাদের ভাঁড়ানি বলে। সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় মেম নামটা জুড়ে গেছে নামের সঙ্গে। এককালে যে নীলকরেরা হাতে মাথা কাটত, তাদের রক্ত দেহে বয়ে বেড়িয়েও, দেখ, আজ বাড়ি বাড়ি ধান ভেনে খেতে হচ্ছে।

এমনিধারা ঘটবে, তারও আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে অধ্যায়ের যত শেষাশেষি এসে পড়ছে। এত সম্প্রীতি দেশি মানুষের সঙ্গে, ক্রমশ সেখানে বিরোধ এসে জমে। বাংলাদেশে নীলের চাষ করে অচিরে লাল হয়ে যাওয়া যায়, সারা ইউরোপ জুড়ে রটনা। জাহাজ ভাসিয়ে দলের পর দল এসে পড়ছে নীল-চাষের জন্যে। গোড়ায় এ-দলে ও-দলে রেশারেশি—নীলের দর বাড়িয়েই যাচ্ছে পাল্লা দিয়ে। চাষীদের বড্ড মজা—ধান-চাষ ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে নীলের পত্তনে মেতে উঠল। শেষটা সাহেবরা নিজেদের আহাম্মুকি ধরে ফেলে—সমিতি গড়ল যাবতীয় কুঠিয়ালে মিলে। নীলের দর বেঁধে দেয় সমিতি থেকে, তার উপরে এক আধলা কেউ দেবে না। চাষীদের পোষায় না, ধারদেনা হয়ে যাচ্ছে—আগাম টাকা নিতে হচ্ছে কুঠি

থেকে। কান্নাকাটি—নীলের দর বাড়িয়ে দাও সাহেব। কিন্তু তখন দস্তুরমতো গুছিয়ে নিয়েছে, কেবা শোনে কার কথা! করমু না, নীল করমু না মোরা। দাদন নিয়েছিস, বললেই হল নীল করব না? ইত্যাদি, ইত্যাদি। হিন্দু-পেট্রিয়টের ফাইলে হরিশ মুখুজ্জে মশায়ের বিস্তর লেখা ছড়ানো আছে, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটক আছে—সে সমস্ত জানেন আপনারা। জানেন না তেমন-কিছু রামনিধি সরকারের সম্বন্ধে। এইটা বিশেষ করে বিশ্বেশ্বরের গবেষণা। পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে।

অরুণদের জমিজমা আছে মণিরামপুর অঞ্চলে—সেই জায়গার মানুষ রামনিধি। সদরের সেরা উকিল। কিন্তু বদনাম আছে। কাশীশ্বর রায়ের চিঠিতে পাওয়া যাচ্ছে—'অর্থপিশাচ চশমখোর বলিয়া তোমার সম্পর্কে নিন্দা-রটনা হইয়াছে, কলিকাতায় বসিয়াও সেই সমস্ত কানে আসিতেছে। অল্প দিনের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত উকিলকে ছাড়াইয়া গিয়াছ, তাহাদের অন্নে হাত পড়িয়াছে—বুঝিতে পারিতেছি, ইহা তাহাদেরই চক্রান্ত…'

আচ্ছা, কাশীশ্বর—বারংবার নাম পাওয়া যাচ্ছে, এই কাশীশ্বরটি হলেন কে? অরুণাক্ষের প্রপিতামহ তো এক কাশীশ্বর। রায় উপাধিও বটে। তিনি নন তো?

এমন পশার, এত নামডাক, পয়সাকড়ি জলস্রোতের মতন আসছে —তবু রামনিধি ওকালতি নিয়ে থাকতে পারলেন না। সেই এক বিচিত্র কাহিনী। ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর। এই অংশটা প্রাণ ঢেলে লিখেছেন বিশ্বেশ্বর। কুঠিয়াল ও চাষীদের ঝগড়া ভয়াবহ হয়ে উঠল। গোড়ায় রামনিধি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, ওকালতি নিয়ে মেতে ছিলেন। একটা মামলায় চাষীর দল মক্কেল হয়ে এলো তাঁর কাছে। তা রামনিধি হলেন

ব্যবসাদার মানুষ—যে টাকা দেবে, তার হয়ে লড়বেন। বার দুই-তিন ঠিক মতো টাকা দিল তারা। শেষে আর পেরে ওঠে না। আধাআধি দিয়ে বলে, এর বেশি আর যোগাড় হল না হুজুর। এক তারিখে মোটেই কিছু দিল না। রামনিধি চটে গেলেন, গরিব বলে কি আদালত কোর্ট-ফী'র টাকা মকুব করে? সমস্ত চলবে, উকিলের বেলাই তাইরে-নারে-না! চাষীর দল গ্রামে চলে গেল টাকার যোগাড়ে; হাতে-পায়ে ধরে বলে গেল—হাকিমকে বলে-কয়ে অন্ততপক্ষে এই তারিখটা সাবকাশ নিয়ে নেন যেন; একতরফা মামলা খতম হয়ে না যায়। তা বয়ে গেছে রামনিধির, দিনের দিন হাজিরই হলেন না তিনি কোর্টে। কিন্তু ইতিমধ্যেই খেটেখুটে রামনিধি মামলাটা ভালো দাঁড় করিয়েছিলেন। আর, হাকিম মানুষটাও ভালো—বাদী গরহাজির বিধায় তিনি এক কথায় মামলা ডিসমিস না করে নিজে থেকেই একটা দিন ফেলে দিলেন। ব্যাপারটা চাউর হয়ে পড়লে সকলে ছি-ছি করতে লাগল। কিন্তু রামনিধি একরোখা মানুষ—অন্যে কি বলল না বলল থোড়াই কেয়ার করেন তিনি।

এর পরেই এক কাণ্ড। মহারানীর রাজত্বের জুবিলি উপলক্ষে কালেক্টরের বাংলোয় গিয়ে কুসুমপুর-কুঠির টমাস সাহেবের সঙ্গে রামনিধির আলাপ হল। কালেক্টর সাহেবই আলাপ করিয়ে দিলেন। একথা-সেকথার পর টমাস রামনিধিকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বন্ধু-ভাবে পিঠ চাপড়ে বলল, তাঁর ব্যবহারে কুঠিয়ালরা অত্যন্ত প্রীত হয়েছে। রামনিধি সরে দাঁড়িয়েছেন—চাষীদের মামলা অত যোগ্যতার সঙ্গে আর কেউ চালাতে পারবে না। এখন তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি অবশ্য সাহেবদের পক্ষ নিতে পারছেন না—বাদীর পক্ষ ছেড়ে দিয়ে বিবাদী-পক্ষে যাওয়া যায় না, আইনগত বাধা আছে। তার প্রয়োজনও নেই। রামনিধি শুধু এমনি চুপচাপ থেকে যান,

চাষীর হয়ে লড়বেন না। তারই জন্য পাঁচশ' টাকা দেওয়া হবে কুঠিয়ালদের তরফ থেকে।

প্রাক্টার্স-ক্লাবের কাগজপত্র থেকে বিবরণ সংগ্রহ হয়েছে। অতএব ভুল আছে বলে তো মনে হয় না। হেন লোভনীয় প্রস্তাবের পরেই রামনিধি যেন আর একরকম হয়ে গেলেন। হাঁ-না কিছু বললেন না। টমাস চাপাচাপি করতে জবাব দিলেন, ভেবে দেখি। ভেবেচিন্তে খবর পাঠাব দু-পাঁচ দিনের মধ্যে।

ভাবনাচিন্তা বোধহয় সেই মুহূর্তেই হয়ে গিয়েছিল। খবর পাঠাবার প্রয়োজন হল না—দিন ছয়েকের মধ্যে কাকপক্ষীতে এসে টমাসের কাছে খবর দিল, সদর ছেড়ে রামনিধি নিজে চাষীদের গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন, তাদের সঙ্গে বৈঠক করে কুঠির দাদন দেওয়ার পদ্ধতিটা ভালো মতো জেনে-বুঝে নিচ্ছেন। আর শোনা যাচ্ছে, চাষীদের কাছ থেকে তিনি নাকি ফী নেবেন না—মুফতে মামলা করবেন। এমন কি কোর্টের খরচাও তিনি দেবেন, চাষীর তরফে এক পয়সা খরচের দায় রইল না।

এর উপরে সেই পুরুত ঠাকুরের ব্যাপার। আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বর কিন্তু নিঃসংশয় নন। তিনি লিখছেন, 'অবিকল এমনি ঘটনা—পুরোহিত কিংবা কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে অপমান করা একাধিক নীলকর সাহেব সম্বন্ধে শোনা গিয়াছে। কোন এক স্থানে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা যে রামনিধির পুরোহিত সম্পর্কেই—জনপ্রবাদ ছাড়া কোথাও কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না…'

সে যাই হোক, লড়াই আচ্ছা রকম জমে গেল—তার পরিচয় তো সর্বত্র ছড়ানো। সারা জেলার মধ্যে যে চাষী যখনই মুশকিলে পড়ত, ছুটে চলে আসত রামনিধির কাছে। অত্যাচারের খবর শুনে

শুনে ক্ষেপে গেলেন তিনি। সদরে মামলা করে কতটুকুই বা প্রতিকার হবে, ক-জনের তাগত আছে সদর অবধি হাজির হবার। ওকালতি ছেড়ে সদরের বাসা গুটিয়ে তিনি গাঁয়ে চলে গেছেন। বিধবা মা, স্ত্রী, ভাই-ভাইপো, নিজের দুই ছেলে এক মেয়ে, এত পশার-প্রতিপত্তি, এক রকম বিনা চেষ্টায় জোয়ারের জলের মতো বিপুল অর্থাগম—কোন-কিছুই আটকে রাখতে পারল না তাঁকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতেন। কী বীভৎস চেহারা হয়েছিল শেষ অবধি! বড় বড় চুলদাড়ি, ময়লা শতচ্ছিন্ন কাপড়। কে বলবে ইনিই রামনিধি সরকার, একদিন সদরের বড় উকিল ছিলেন। সত্যি সত্যি ক্ষেপে যাওয়া যাকে বলে। অঞ্চলসুদ্ধ সকলে সেই রকম ভেবে নিয়েছিল। বাড়ির লোকজন তো বটেই। বাড়ির কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কান্নাকাটি, হাত-পা ধরাধরি—শেষটা গালিগালাজ, যাচ্ছেতাই অপমান। এই জন্য নিজের গাঁয়ে এসে ভদ্রপাড়ায় ঢুকতেন না তিনি, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতেন।

ফাঁসি হল এই রামনিধির। কুসুমপুর কুঠিতে আগুন দিয়েছিল, একটা সাদা সাহেব পুড়ে মরেছিল। তার বদলি একগণ্ডা নেটিভের প্রাণ তো চাই। সাক্ষি সাজিয়ে প্রমাণ করে দিল, রামনিধি নিজ হাতে সাহেবটাকে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। বিচারান্তে ফাঁসি। এতকাল বাদে বিশ্বেশ্বর প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে দেখালেন, রামনিধি সে রাতে বন্ধু কাশীশ্বরের কলকাতার বাড়িতে রয়েছেন। নির্ভুল তাঁর সিদ্ধান্ত। রামনিধিকে সাহেবরা হত্যা করেছে বিচারের ছলনা করে।

হত্যা এই একটিমাত্র নয়—আরো একটা আছে। বদলি ঠিক একগণ্ডা না হোক, একজোড়া হয়েছে। আর যাঁকে মারল, তিনি হলেন রামনিধির অভিন্নহৃদয় বন্ধু কাশীশ্বর। রামনিধির ফাঁসি নিয়ে

বিস্তর হৈ-চৈ হয়েছিল, কাশীশ্বরকে তাই আর আদালতে দাঁড় করাতে সাহস করে নি। নেমন্তন্ন খেয়ে কাশীশ্বর গঙ্গার ধারে ধারে ঘোড়ার গাড়িতে ফিরছেন। পরদিন দেখা গেল, চাঁদপাল-ঘাটের পাশে মরে পড়ে আছেন তিনি। পিটিয়ে শেষ করেছে। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানকে জেরা করে বেরুল, মুখোস-পরা জন পাঁচ-ছয় মানুষ গাড়ি আটকে গাদা-বন্দুক তাক করল; গাড়োয়ান কোচবাক্স থেকে লাফিয়ে পড়ে দে ছুট। কিসে কি হল, কিছুই সে বলতে পারে না।

সে না পারুক, বিশ্বেশ্বর এত কাল পরে সবিস্তারে বলেছেন তাঁর বইয়ে। পুরানো কাগজপত্র ঘেঁটে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা উত্তম রূপ হিসাবপত্র করে, নানাবিধ পরোক্ষ প্রমাণের বিচারে শেষ অবধি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন, নীলকর সাহেবরাই লোক লাগিয়ে কাশীশ্বরকে চুপিসারে হত্যা করেছে। এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। রামনিধির ফাঁসির কথায় আজও লোকের চোখ সজল হয়ে ওঠে—রামনিধি নামের কত ইজ্জত! অথচ, দেখ, কাশীশ্বর রায় ঠিক একই ব্যাপারে প্রাণ দিলেন—বঙ্গবাসী কেউ কোন খবর রাখে না। সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হল এতকাল পরে 'ভারতে ইংরাজ' বইয়ে। বিশ্বেশ্বর বাঙালি জাতির কলঙ্ক-মোচন করলেন।

পড়তে পড়তে অরুণাক্ষ লাফিয়ে ওঠে। তাই তো—এ কাশীশ্বর তারই প্রপিতামহ, সংশয়ের কিছু নেই। কাশীশ্বরের সেজ ছেলে কমলাক্ষ, তাঁর ছেলে অম্বুজাক, অম্বুজাক্ষের ছেলে অরুণ। ঠিক বটে, সাহেববাড়ি খানা খেয়ে ফিরতি পথে কাশীশ্বর মারা যান। একটা গোলমেলে সম্পত্তি কিনেছিলেন—এরা বরাবর জেনে বুঝে এসেছে, সেই সম্পত্তির এক বা একাধিক শরিক আক্রোশ বশে এই কাজ করেছে। কিন্তু ব্যাপার দেখা যাচ্ছে একেবারে আলাদা। বিশ্বেশ্বরই প্রথম দেখিয়ে দিলেন। রায় বংশের নতুন গৌরব এনে দিলেন তিনি।

বাবা বাড়ি নেই। রোগি দেখে দেখে বেড়াচ্ছেন। ফিরবেন সেই কত রাত্রে। অরুণ থাকতে পারে না।

জান মা, কত বড় কুলীন আমরা—

সুহাসিনী হেসে বলেন, কি বলিস—কায়েতের মধ্যে ঘোষ-বোস-মিত্তির হল কুলীন। সে বটে আমার বাপের বাড়ি। তোদের বাড়ি বিয়ের পরে আমি তো জাতে নিচু হয়ে গেলাম।

অরুণাক্ষ ঘাড় নেড়ে জোর দিয়ে বলে, তোমার বাবার চেয়ে অনেক বড় কুলীন আমরা।

ছেলের ক্ষেপানো কথা, সুহাসিনী বুঝতে পারলেন। পানের পিচ ফেলে হেসে তিনি বললেন, সে আর হতে হয় না। বাগুটের ঘোষ—কুলীনের সেরা কুলীন, মুখ্যি হলেন আমার বাবা। তোরা তো মৌলিক। গোষ্ঠীপতি বলে দাম বাড়াস, তা হলেও অনেক নিচুতে আছিস আমার বাপের বাড়ির চেয়ে।

অরুণ বলে, না মা, বল্লালি কুলের কথা কে বলছে? এ যুগে তা কেউ পোঁছে না। আমার ঠাকুরদাদার বাবা হলেন কাশীশ্বর রায়। বিদেশির অত্যাচার রুখতে গিয়ে যাঁর প্রাণ গেল। প্রাণ দিয়ে দেশের মধ্যে আমাদের সকলের বড় কুলীন করে দিলেন।

কি করবে, অরুণ ভেবে পায় না, কোথায় গিয়ে মনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে? ছুটে যাবে বিশ্বেশ্বরের বাড়ি—ইরার কাছে? মুখস্থ আছে বলেছিলাম 'ভারতে ইংরাজ'—বিদ্রূপ করেছিলে। চোখে আগুন বেরিয়েছিল। আগুন আর অশ্রু একসঙ্গে। দাঁড়ালাম এবারে এই সামনে এসে। যত রকমে যেমন খুশি করো এগজামিন।

কিন্তু রাত হয়ে গেছে, কি অজুহাতে সেখানে গিয়ে ওঠা যায়? শাড়ি ফেরত দেবার নাম করে? ধুতি-ছাতা ইরাবতী কবে দিয়ে গেছে—শাড়িটা আছে পড়ে আজও এখানে। হরিহর ঘোষার বাড়ি

পাঠিয়েছিল, কেচে এনেছে—কিন্তু তার পরেই ঝগড়াঝাটির দরুন আর খেয়াল হয় নি। কিংবা লজ্জা বোধ করেছে শাড়ি হাতে ঐ বাড়ি গিয়ে দাঁড়াতে। অথবা ভয়। অথবা অন্য-কিছুও হতে পারে, শাড়িটা হয়তো রেখে দেবারই ইচ্ছা। অমন মিষ্টি মেয়ে এক লহমায় যেন ক্রুদ্ধ সিংহী হয়ে উঠল। অন্যায়টা অরুণেরই। বিশ্বেশ্বরকে এত ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে—অথচ, দেখ, বংশ ধরে এত বড় সম্মান দিলেন তিনিই। সম্মান শুধু আজকের নয়, সর্বকালের মানুষের কাছে।

খানিক বাদে অম্বুজাক্ষ চৌরঙ্গির চেম্বার থেকে ফিরলেন। এখন পুজা-আহ্নিক, তার পরে সামান্য আহারান্তে শুয়ে পড়বেন। মতলব ঘুমানোর বটে, কিন্তু প্রায় তা হয়ে ওঠে না। মানুষ তখনো এসে হাঁকডাক লাগায়। সাড়া না দিলে দরজা ভেঙে ফেলবে, এই রকম গতিক। ঘুম ভেঙে উঠে বিরক্তমুখে গজর-গজর করতে করতে উপরের বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ান।

কি হয়েছে?

কালীঘাটে বিয়ের নেমন্তন্ন ছিল। বাড়ি এসে ভেদবমি হচ্ছে বড় ছেলেটার। পেটে বিষম যন্ত্রণা—

ভোজে খুব ঠেসেছে, এই আর কি। সে না হয় ছেলেমানুষ—আপনার খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে জিনিসপত্র পরের হলেও পেট নিজেদের।

যা ইচ্ছে বলুন ডাক্তারবাবু। একবার আপনাকে দেখতে যেতে হবে।

কিছু দেখতে হবে না। আমি একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। এই রাত্রে ওষুধই বা কোথায় খুঁজে বেড়াবে—দুই মোড়ক দিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। ঐ খাইয়ে দাওগে, পেট ভাল হয়ে যাবে।

না ডাক্তারবাবু—কেঁদেই ফেলল লোকটা। বলে, এক নজর আপনি দেখে যান। ওষুধ লাগবে না, চোখে দেখলেই আরাম হয়ে যাবে। আপনি আসুন।

তাই বটে। লোকের এমন আস্থা, অম্বুজাক্ষ একবার দেখে দু-চারটে মিষ্টি কথা বললে অর্ধেক রোগ নিরাময় হয়ে যায়। মোটা ভিজিট করেছেন—টাকার জন্য তত নয়। এর ফলে রোগির সংখ্যা কমে যায় যদি। কিন্তু কিছুতে কিছু হল না। লোকে তাঁকে দেখাবেই জলের মতো টাকাকড়ি আসছে। করপোরেশন ইলেকশনে নিজে দাঁড়াতে চান নি, দশজনে বলেকয়ে দাঁড় করিয়েছিল। এত জনপ্রিয়তা—তাই ভরসা হয়েছিল, অবাধে তরে যাবেন। কিন্তু দশচক্রে ভগবান ভূত হয়ে দাঁড়াল—হেরে গেলেন, তা-ও ঐ ভূতনাথ গুঁইয়ের কাছে।

বাড়ির লোকের মুখ অন্ধকার। অম্বুজাক্ষের মনে মনে যাই হোক, বাইরে দেখাচ্ছেন বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি তিনি। বলেন, অঢেল রোজগার-পত্তোর করছি। টাকাপয়সার দিক দিয়ে যদি বল, আমার জীবন সার্থক বলতেই হবে। কিন্তু নিজের ছাড়া দশের কাজ কবে কি করলাম, বাইরের মানুষ কোন সুবাদে আমায় ভালবাসবে? বন্ধুরাও সান্ত্বনা দেয়, ভাল হয়েছে। করপোরেশনের হল ছ্যাঁচড়া কাজকর্ম। এর নর্দমা আটকে গেছে; ওর কলে জল আসছে না; পাঁচসিকে ট্যাক্সবৃদ্ধি ঘটেছে; ঐ লোক বে-আইনি এক বারাণ্ডা তুলে বসে আছে। গুঁই মশায় এরই ভিতরে ঢুকে পড়ে দুটো পয়সা বের করে নেবেন, সকলে তো ঐ কর্ম পারে না। আপনি না গিয়েছেন, ভালই হয়েছে। অ্যাসেম্বলিতে চলে যাবেন ডাক্তারবাবু, মন্ত্রী হয়ে বসবেন—আধা-সিকি নয়, পুরোপুরি মিনিস্টার।

হেরে গিয়ে তার পরে অম্বুজাক্ষ মানুষ হিসাবে খানিকটা আলাদা হয়ে উঠলেন। দয়াধর্ম খুব এখন, একটু কাতর হয়ে পড়লে খিনাপয়সায় দেখেন, মুফতে ওষুধপত্র দেন। গ্রামের দিকে বিশেষ নজর পড়ছে। বলেন, গ্রামের মানুষ শহরে এসে গাদা হবে, এ সমস্ত চলবে না। শহরে মানুষই ছড়িয়ে পড়বে গ্রামের আলো-হাওয়ায়। গ্রামের সমাজে সর্বসাধারণের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে থাকা—এতে দেশের ভাল, নিজেরও ভাল।

এবং মুখের কথা মাত্র নয়। গ্রামে শহরে খুব টানা-পোড়েন চলছে তাঁর ইদানীং। দিনকে দিন কলকাতায় দুর্লভ হয়ে পড়ছেন। তাই যে ক'টা দিন থাকেন, রোগিরা ছেঁকে ধরে, তিলেক নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত দেয় না। রোগি দেখা শেষ করে অনেক রাত্রে অম্বুজাক্ষ বাড়ি ফিরে এলেন। অরুণ পারতপক্ষে বাপের মুখোমুখি হয় না। কিন্তু আজ ব্যাপার আলাদা। আজকের এই পরম আবিষ্কার প্রতিজনকে না জানিয়ে সোয়াস্তি পাচ্ছে না। বাইরের পোশাক ছেড়ে ফেলে গামছা পরে অম্বুজাক্ষ স্নান-ঘরে যাচ্ছেন, তারই মধ্যে অরুণ গিয়ে পড়ল। হাতে সেই অতিকায় 'ভারতে ইংরাজ'। বইয়ের ভিতর আঙুল ঢোকানো ছিল। সেই জায়গাটা খুলে বলল, পড়ে দেখুন বাবা।

অম্বুজাক্ষ এক নজর তাকিয়ে বইয়ের নাম দেখে নিয়েছেন। বললেন, তোর এগজামিনে লাগবে—তুই পড়বি। আমি কোন দুঃখে ইতিহাস পড়তে যাব রে, আমার কোন দায়?

কাশীশ্বরের কথা আছে—

অম্বুজাক্ষ নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন, কাশীশ্বর কবে মারা গেছেন—স্বর্গধামে সোয়াস্তিতে আছেন। তাঁকে নিয়ে টানাটানি কেন এতকাল পরে?

উত্তেজনার বশে অরুণাক্ষ খানিকটা পড়ে গেল। সেই মোক্ষম জায়গাটা—চাঁদপালঘাটে মৃতদেহ পড়ে আছে কাশীশ্বরের। ভাল মানুষ পাল্কি-বেহারা লোক-লস্কর নিয়ে নিমন্ত্রণে গেছেন—কে তাঁকে মারল, দেহটা কি ভাবে এখানে এসে পড়ল, তারই সবিস্তার আলোচনা। আলোচনা করছেন ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বর—তাঁর ধরন-ধারণই আলাদা, এমন সাবধানী লেখক বাংলা দেশে আর দ্বিতীয় নেই। এক একটি কথা লিখছেন—তার আটঘাট-বাঁধা যুক্তি। এক লাইন লিখতে গিয়ে লাইন আষ্টেক ফুটনোট। সন্দেহের এতটুকু ফাঁক রাখেন না।

অম্বুজাক্ষ শুনতে শুনতে গম্ভীর হলেন। ঝুঁকে পড়ে জুতোর ফিতে খুলছিলেন, ফিতে ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই রইলেন তিনি। পড়া শেষ হয়ে গেলে বললেন, বইটা রেখে যাও। আরও খান পঁচিশেক কিনে এনো কাল।

অরুণ পুলকিত হল। তবু কিঞ্চিৎ আপত্তির ভাব দেখিয়ে মৃদুস্বরে বলে, দাম ভয়ানক। পঁচিশখানায় পড়বে তো দু-শ' টাকার মতো।

তোমার টাকায় কেনা হচ্ছে না, টাকার ভাবনা তোমার নয়।

অরুণ তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, এ কাজে উৎসাহ দেওয়াই উচিত। দামি বই বেশি লোকে তো কেনে না।

শনিবারে গাঁয়ে যাচ্ছি। রথের মেলা বসাব এবার। আর তল্লাটে যত লাইব্রেরি আছে, একটা করে ঐ বই দিয়ে দেবো। কাশীশ্বরের কথা সকলের জানা উচিত।

কালই কিনে আনব বাবা।

অরুণ চলে যাচ্ছিল, অম্বুজাক্ষ ডাকলেন।

লেখক বিশ্বেশ্বর সরকার কোথায় থাকেন, ঠিকানা বের করতে পার?

অরুণাক্ষ কিঞ্চিৎ চিন্তার ভান করে। ভেবেচিন্তে বলল, তা বোধ হয় পারা যায়। সম্বর্ধনা-সভা হয়েছিল, সেই সময় কাগজে যেন ঠিকানা দেখেছিলাম। খুঁজলে পাওয়া যাবে।

বের করো খুঁজে। গিয়ে একবার আলাপ করে এসো।

পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করে অরুণাক্ষ বলে, ইতিহাসের ছাত্র—অমন এক দিকপালের কাছে যাতায়াত থাকলে পরীক্ষাতেও ভাল হবে।

সে জন্য বলছিনে। একবার ওঁকে গাঁয়ে নিয়ে যেতে পারলে কিছু হৈ-চৈ করা যায়। ইলেকশনের পুরো বছরও নেই। ইংরেজ যাদের উপর অত্যাচার করেছে, স্বাধীন-ভারতে তাদের পোয়া-বারো। ওঁকে নিয়ে মীটিং করে নীলকরদের কথা-টথা বলে অঞ্চলের মধ্যে খাতির বাড়ানো। এই চাউশ বই পড়বার বিদ্যে ক'টা লোকের আছে?

অরুণ বলে, বিদ্যে যত না হোক—ধৈর্যের বেশি দরকার। পরীক্ষার ভয়ে পড়তে হয় আমাদের, আধ-মুখস্থ রাখতে হয়। বাইরের লোকের গরজ নেই—তারা কষ্ট করতে যাবে কেন?

পঁচিশখানা বই দোকান থেকে আবার ঠিক তেমনি ভাবে কিনে আনা যায়। কিন্তু বাবার হুকুমে ও-বাড়ি যেতে হবে। এবং যাবে যখন, কেনাবে ইরাবতীকে দিয়ে। মেয়েটা শত্রু ভেবে বসে আছে, ঠাট্টা-তামাসার কথাটাই মনে গেঁথে রাখে। জানুক, কত বড় গুণগ্রাহী আমরা।

—সাত—

রাত্ যেন আজ ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে গরুর গাড়ির চালে চলেছে। সকাল আর হতে চায় না। ফর্শা হয়েছে দেখে অরুণ ধড়মড় করে শয্যায় উঠে বসল একবার। উঁহু, পাংশু চাঁদ এখনো আকাশে।

তারপর ভোর হল তো ভাবছে, এত সকালে যাওয়া ঠিক হবে না—বিশ্বেশ্বররা কি ভাববেন? বিশেষ ঐ খাণ্ডারনী মেয়েটা। ভাববে, পঁচিশ কপি বই কেনার খবরটা দেবার জন্য মুকিয়ে বসে ছিল। যে রকম বদমেজাজি, হয় তো বা এই নিয়েই বেধে যাবে একখানা। বড়লোকপনা দেখাতে এসেছ—উঁ? দু-শ' টাকার বই কিনে কৃত-কৃতার্থ করছ, সেইটে আমাদের জানান দেওয়ার দরকার? যা একখানা মেজাজ—কিসে কি হবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। স্ফুরিতাধর—মুখে বজ্রগর্জন, দু'টি চোখ অথচ জলে ভরে আছে। চোখের জল ওদের সাধাই থাকে, বিনা নোটিশে বেরিয়ে আসে যখন-তখন। লেখাপড়া শিখেছে, বাইরে বেরিয়ে কাজকর্মও করা হয় নাকি, তবু তো শিশিরে-ভেজা জুঁইগাছটি—হাওয়া লেগেছে কি না লেগেছে, টপ-টপ করে জল ঝরে পড়বে। আচ্ছা, অত বড় মেয়ের বিয়ে দেবে না? ওর যে বর হবে, তার দুঃখে শিয়াল-কুকুর কাঁদবে। সারা জীবন নাকানি-চোবানি খেতে হবে সেই ভদ্রলোকের!

চা-টা খেয়ে তবে বেরুনো যাক। ওদের বাড়ি চা গিলতে বলা হবে না। একদিনের সেই যে অভিজ্ঞতা—আবার তার উপরে! চা দিয়ে খাতিরও করবে না আর। রোদ উঠে গেছে। দীপক ও আর কয়েকটি ছেলে অরুণকে ডাকতে এলো। বিদেশি কয়েকজন

ফুটবল-খেলোয়াড় কলকাতায় এসেছে, তাদের নিমন্ত্রণ করে আনছে আজ ক্লাবে। সমারোহ ব্যাপার।

যাব তো ঠিক করেছিলাম ভাই। হাজার বার যাওয়া উচিত। কিন্তু বাবার বই কিনতে যাচ্ছি—বই নিয়ে বাবা সন্ধ্যাবেলা দেশে রওনা হয়ে পড়বেন। দুষ্প্রাপ্য বই, খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। সাধারণ বই হলে তো দশটার পর যে কোন দোকানে গিয়ে চাইলেই হত। ধাওয়া করতে হচ্ছে এখন লেখকের বাড়ি অবধি। সেখানে গিয়েও কী হবে, কে জানে! বাবা যদি শোনেন, বইয়ের ব্যবস্থা না করে ক্লাবে গিয়েছি, তবে রক্ষা থাকবে না। তোমরাই যাও ভাই।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পরের মুখ চেয়ে থাকতে হলে এই রকমই ঘটে। তোমরাই যাও, আমার যাওয়া হয়ে উঠবে না।

ওদের বিদায় করে দিয়ে অরুণাক্ষ তারপর বুক ফুলিয়ে চলেছে ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বরের বাড়ি। নাও পরীক্ষা ইরাবতী, ফুটনোটে কণ্টকিত 'ভারতে ইংরাজ' যত দুর্গমই হোক, আমার তথায় অবাধ বিচরণ। বংশ ধরে গৌরব দিয়ে বিশ্বেশ্বর আমাদের কিনে রাখলেন।

আজও মানুষ জানলার ধারে। ভিড়টা জমে নি আজ এখনো—শুধুমাত্র একজন। না, ইরাবতী ঠিকই করে। চায় পাতার চটি কাগজটাও এক ঢাউশ পূজা সংখ্যা বের করে পয়সা পিটবার তালে আছে। পাঠকে পড়ুক না পড়ুক, একটা-দুটো ওজনদার লেখা চাই কাগজের কদর বাড়াবার জন্য। অতএব ছোট ঐ ভাল মানুষটার কাছে! লেখা তো একেবারে মুফতে, তার উপরে আবার চোখ গরম করবে একবারের বেশি দু-বার আসতে হলে! ইরাবতী আছে বলে

তবু যা হোক কিঞ্চিৎ ভয় রেখে চলে, নইলে ভদ্রলোককে সকলে মিলে পাগল করে ছাড়ত।

লোক আজ একটি মাত্র। কিন্তু প্রতাপ ভয়ানক—খানিক পরে সে দমাদম জানলায় ঘা দিতে লাগল। আস্পর্ধার সীমা থাকা উচিত। 'ভারতে ইংরাজ'-এর লেখক বিশ্বেশ্বর আজকে কেবল ইরাবতীর নয়, অরুণাক্ষদেরও। ইরা কখন হুমকি দিয়ে পড়বে, ততক্ষণ ধরে এই অত্যাচার চোখে দেখা যায় না। মোড় ঘুরে তাড়াতাড়ি সে লোকটার সামনাসামনি চলে এলো।

কাকে চাই ?

লোকটা মুখ ফিরিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বলে, এ বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে কি মহারাজ রাজবল্লভের খোঁজ নিচ্ছি মশায় ? ডেকে ডেকে খুন হয়ে গেলাম—সরকার মশায় আছেন কি নেই, হ্যাঁ-না একটা জবাব দেবে না ?

অরুণাক্ষও তেমনি সুরে বলে, নেই—

লোকটা আগুন হয়ে উঠল। অবিকল সেই আর একদিনের ব্যাপার। বলে, কে বটেন আপনি ? মেয়েটা তো মনে হচ্ছে বাড়ি নেই এখন—তার জায়গায় আপনি এলেন মিথ্যে কথার উকিল হয়ে ? সকালবেলা ঘরের মধ্যে থেকেও যদি বাড়ি না থাকেন, আমার তবে চলবে কি করে ?

না চলে তো তুলে দিন। কে মাথার দিব্যি দিয়েছে, কি দরকার কষ্ট করে চালাবার ?

সেই বন্দোবস্ত হচ্ছে মশায়! তুলেই দেবো। রেন্ট-কন্ট্রোল হয়ে ভেবেছেন কলা দেখিয়ে লঙ্কা পার হবেন। চোদ্দ মাসের ভাড়া বাকি—যত নাকে কাঁদুন, তারা কানে নেবে না। তা আমার মনের

কথাটা মুখ ফুটে বলে দিলেন আপনি মশায়। তুলেই দেবো বাড়ি থেকে—না তুলে উপায় নেই—

অরুণ বেকুব হয়ে তাড়াতাড়ি বলে, বাড়িওয়ালা আপনি? আমি ভেবেছিলাম কাগজের লোক, কাগজ তুলে দিতে বলছিলাম। শহরের অবস্থা তো দেখছেন—আধখানা ঘরের জন্ত মানুষে মাথা কুটে মরছে। বাড়ি থেকে তুলে দিয়ে কি রাস্তায় ফেলে মারবেন ভদ্রপরিবারকে?

লোকটি খারাপ নয়। অরুণের কথায় নরম হয়ে বলে, এক বছরের উপর ভাড়া বাকি, আমার দিকটাও দেখবেন তো! নানান দুয়োর থেকে কুড়িয়ে এনে আমায় সংসার করে খেতে হয়। নইলে পুরানো ভাড়াটে এরা—লোক ভাল, বরাবর দিয়েও এসেছে। বলব কি, দোসরা তারিখে না এসেছি তো তেসরা বাড়ি বয়ে গিয়ে ভাড়া দিয়েছে। চাকরি-বাকরি গিয়ে ভদ্রলোক এই বছর তিনেক গোলমালে পড়েছেন। জানি যে ভাড়াটে তুলতে পারলে ভাড়া সঙ্গে সঙ্গে ডবল। কিন্তু বিশেষ জানাশোনা হয়ে গেছে, সেটা আর করতে চাইনে মশায়।

অরুণাক্ষ বলল, ঠিকানা দিচ্ছি, সেখানে যাবেন কাল একবার দয়া করে।

বাড়িওয়ালা চোখ বড় বড় করে বলে, বলেন কি? আপনি দিয়ে দেবেন নাকি? নবলগ টাকা—

তা দিলামই বা! ভবিষ্যতেও যাতে নিয়মিত পান, তার ব্যবস্থা হবে। মস্তবড় লেখক—এই সব ছোটখাট ব্যাপারে ওঁদের মাথা দিতে গেলে সাধনার ব্যাঘাত হয়। এ বাড়িতে আর তাগিদপত্তোর করবেন না।

করে লাভ নেই, সে তো দেখাই যাচ্ছে। আপনি যদি দিয়ে দেন, কেনই বা করতে আসব বলুন। উঃ মশায়, আমার মাথা ঘুরছে।

অরুণ ব্যস্ত হয়ে উঠল, সে কি, কি হল হঠাৎ ?

মাথার দোষ নেই। পাপ কলিযুগে এমন দাতাকর্ণ—চোখে দেখেও বিশ্বাস করা দায়।

জিভ কেটে অরুণাক্ষ বলে, ছি-ছি! দানের কথা উঠছে কিসে ? আমাদের আত্মীয়জন—

পুরানো ভাড়াটে—এঁদের নাড়িনক্ষত্র সমস্ত জানা। ঝনাঝন এক কাঁড়ি টাকা ফেলবার মতন এত বড় আত্মীয় আছেন বলে তো জানিনে।

আমাদেরও ঠিক তাই। কাল অবধি জানতাম না যে এত বড় আত্মীয় আছেন এই কলকাতার শহরে।

তারপর একটু বিরক্ত ভাবে বলল, সে যাই হোক—আপনারই বা অত সাত-সতেরো খবরে কি দরকার ? ভাড়ার টাকা পেয়ে গেলেই তো হল !

ইরাবতী বাড়ি নেই, মুখের উপর দড়াম করে কেউ দরজা দেবে না। ঢুকে পড়বার এই মহেন্দ্রক্ষণ। বাড়ি ফিরে ফণিনীর মতো ফোঁস-ফোঁস করবে—ইতিমধ্যে জমিয়ে বসে আছি মহৎ মানুষ বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে। নিঃশঙ্ক আশ্রয়। আশে-পাশে অকারণ ফণা দুলিয়ে বেড়াবে তুমি, ছোবল মারার ফাঁক পাবে না।

ডাকাডাকি করতে—সরমা রান্নাঘরে ছিলেন, খুট করে ছিটকিনি খুলে দিলেন। অল্প একটু দরজা ফাঁক করে আড়াল থেকে প্রশ্ন করলেন, কোত্থেকে আসছেন আপনি ? কি দরকার ?

অরুণাক্ষ মরীয়া। অমন ব্যবধান রেখে কথাবার্তা চলবে না। সোজা ঢুকে পড়ে সরমার পায়ে প্রণাম করল। বলে, সন্তান আমি মা। 'আপনি' বলছেন কেন—ইরাবতীকে তো আপনি বলেন না।

সুন্দরকান্তি এমন ছেলেটি প্রণাম করে ভক্তিভরে পায়ের ধুলো নিচ্ছে। সরমা গলে গেলেন। অরুণাক্ষ বলে, ইতিহাসের ছাত্র আমি মা। অত বড় ঐতিহাসিকের পায়ের নিচে বসে দুটো কথা শুনব বলে এসেছি। 'ভারতে ইংরাজ' পঁচিশখানারও ভারি দরকার।

সরমা পথ দেখিয়ে আগে আগে যাচ্ছেন: দোতলার ঘরে আছেন তিনি। চলো—

সেই তপোবন। তুলট-কাগজে লেখা জীর্ণ এক পুঁথি নিয়ে বিশ্বেশ্বর নিবিষ্ট হয়ে আছেন। ভ্রূ কুঞ্চিত, পুঁথির উপরের গোল গোল প্রাচীন লেখাগুলো ধরে এক বিচিত্র রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি যেন। দু-দুটো মানুষ চোখের উপর দিয়ে সঙ্কীর্ণ কুঠুরিতে ঢুকল, তিনি তা টের পেলেন না। কুঠুরিতে ঢুকে পড়ে অরুণের কেমন গা ছমছম করে। কলকাতার জনতা ও সমারোহের কাছে তাড়া খেয়ে পুরানো কাল এইখানে যেন বাসা বেঁধেছে। আলুথালু কাপড়-চোপড় আধ-পাকা দাড়ি ডাঁটি-ভাঙা নিকেলের চশমা—সমস্ত মিলে বিশ্বেশ্বরও যেন প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষ। অরুণাক্ষ সহসা কথা বলতে পারে না—এই ঘরের পুঁথিপত্র, তদগত ঐ ইতিহাসের মানুষটি—সকলের সঙ্গে শিলামূর্তির মতো সে-ও জমে গিয়েছে যেন।

সরমা অত শত ধার ধারেন না। শব্দসাড়া করে তিনি ডাকলেন, শুনছ? এদিকে দেখ একবার।

বিশ্বেশ্বর মুখ তুললেন। জবাব দিতে হয়, তাই যেন বললেন, অ্যাঁ?

এই ছেলে তোমার কাছে এসেছে।

অরুণাক্ষের দিকে চেয়ে বিশ্বেশ্বর বিরক্ত ভাবে বললেন, একেবারে উপর অবধি ধাওয়া করেছেন কেন? বলে দিয়েছি তো মঙ্গলবারে দেব।

অরুণ হেসে ঘাড় নেড়ে বলে, আজ্ঞে না, বলেন নি তো।

কি বলেছি তবে? শুক্রবারে?

তা-ও নয়—

বিশ্বেশ্বর অতি বিব্রতভাবে বললেন, কোন বারে বলেছি তা হলে?

অরুপাক্ষ বলে, বারের কি দরকার? আমি কাগজের লোক নই।

কাগজের নন—আমার কাছে এসেছেন, কে আপনি তবে?

অরুণাক্ষ বলে, আপনার ভক্ত। সেই সভার দিন আপনার ঠিক সামনেই তো বসেছিলাম। দেখেন নি?

বিশ্বেশ্বর আমতা-আমতা করেন, হ্যাঁ—দেখেছি বই কি। সামনে বসেছিলেন যখন, ঠিকই দেখেছি।

ইরা কথা বলে ওঠে। কখন সে ইতিমধ্যে বাড়ি এসেছে, ঘরের মধ্যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলে, মস্ত বড়লোক এঁরা বাবা। গাড়িখানা দেখে এসো একবার। গলির সমস্তটা মুখ জুড়ে রয়েছে, মানুষজন ভাঙা নর্দমার উপর দিয়ে নোংরা জলকাদা মেখে চলাচল করছে।

অরুণ ব্যস্ত হয়ে বলে, কী অন্যায়! ড্রাইভার সরিয়ে রাখে নি? তাড়াতাড়ি সে উঠে দাঁড়াল: আমি বের করে দিয়ে আসছি।

ইরা হেসে বলে, বড়লোকের ড্রাইভার—সকলকে তুড়ে দিচ্ছিল। আমি হলাম ডাকসাইটে ঝগড়াটে—পেরে উঠবে আমার সঙ্গে? আমার হুঙ্কার শুনে তার পরে প্রভু সদয় হলেন। আপনার যেতে হবে না, নিজেই সে সরিয়ে নিচ্ছে।

অরুণ বলে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। এর পরে আবার যখন আসব, গাড়ি আনব না। পায়ে হেঁটে আসব।

সরযূ বলে ওঠেন, কি জন্যে বাবা? ও মেয়ে কটকট করে অমনি বলে। ওকে নিয়ে পারবার জো নেই।

ঠিক কথাই তো মা। আমি ইতিহাসের ছাত্র—এ-বাড়ি এই ঘর তীর্থভূমি আমার কাছে। পায়ে হেঁটে কষ্ট করে তীর্থ আসতে হয়, নইলে তীর্থফল পুরোপুরি মেলে না।

বলেই খেয়াল হল, ইরাবতী এসে গেছে—বাঁকাহাসি ফুটল বোধহয় তার মুখে। ভয়ে ভয়ে আড়চোখে একটু দেখে নেয়। না শ্রীমতীর মেজাজ মোটামুটি ভালই, চাটুবাক্যগুলো কানেই যায় নি যেন। এবং যেখানে যাওয়ার দরকার, সেখানে ঠিক পৌঁছে গেছে। বিশ্বেশ্বর আহ্লাদে শতখান হয়ে এতক্ষণে পরিচয় নিচ্ছেন, তুমি কে বাবা ?

ইরা মাথা বাড়িয়ে বলে, এঁর বাবা মস্ত বড় ডাক্তার—অমৃতাক্ষ রায়। সেই যে কর্পোরেশন-ইলেকশনে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন। যুগচক্র তাঁর হয়ে গোড়ায় হৈ-চৈ করেছিল। শেষটা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে ভূতনাথ গুঁইকে ধরে।

বাপের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। এত কথার পরেও বিশ্বেশ্বর কিছুমাত্র আলো পেয়েছেন, এমন মনে হয় না। বলে, বাবা, কৃতান্ত কাকাবাবু যে রাগ করেন সে-কিছু অন্যায় নয়। যুগচক্র কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়েও দেখ না। তা-ই বা কেন—দশ-বিশ বছরের মধ্যে যা ঘটছে, কোনটারই বা খবর রাখ তুমি। তোমার নজর শুধু ইতিহাসের এলাকায়।

অরুণাক্ষ বলে, তাই যদি হয়—হালফিলের আজেবাজে কথা না বলে সেই ইতিহাসের পরিচয় হোক তবে। আমার প্রপিতামহ হলেন কাশীশ্বর রায়।

চকিত দৃষ্টি মেলে বিশ্বেশ্বর বলেন, কোন কাশীশ্বর ?

কাশীশ্বর রায়—যাঁর মাথা ফাটিয়ে গঙ্গার ঘাটে ফেলে দিয়েছিল। ইতিহাসেও তিনি মরেছিলেন, আপনি নতুন প্রাণ দিলেন। নতুন কথা বললেন তাঁর সম্বন্ধে।

বিশ্বেশ্বর চটে উঠলেন, নতুন কথা মানে বুঝি মিথ্যে কথা? যত সব মূর্খস্য মূর্খ! কিছু পড়বে না, খোঁজখবর নেবে না। রামনিধি আর কাশীশ্বরের দেহই দুটো, তা ছাড়া সর্বরকমে এক—এ-ও আজকে নতুন কথা তোমাদের কাছে।

তারই একটা গল্প শুরু হয়ে গেল। রামনিধির নামে হুলিয়া। ত্রিভুবন চুঁড়েও ধরতে পারছে না। ধরবে কি করে? কাশীশ্বর রয়েছেন যে—পক্ষীমাতা যেমন শাবক আগলে থাকে, তিনি আছেন তেমনি রামনিধিকে ঘিরে। নিয়ে তুলেছেন একেবারে তাঁর কলকাতার হাটখোলার বাড়িতে।

ইরাবতী বলে, সাহেবদের ঘাঁটি কলকাতা। তাদের অত বড় শত্রুকে ঐখানে নিয়ে তুললেন?

বিশ্বেশ্বর হাসতে হাসতে বললেন, সেই তো সব চেয়ে ভাল—বুঝতে পারলিনে? পাকা বুদ্ধি ধরেন কাশীশ্বর। নয় তো পথের ফকির থেকে ঐশ্বর্য করতে পারতেন? সাহেবেরা সারা দেশ পাতি-পাতি করবে—খুঁজবে না কেবল কলকাতা। আর কাশীশ্বরকে জানত একেবারে নিজেদের লোক বলে, তাঁর বাড়ি তো নয়ই। ওদের চোখে ধুলো দিয়ে কাশীশ্বর রামনিধিকে বরাবর বুদ্ধি আর টাকা জুগিয়ে গেছেন। শেষটা অবশ্য জানাজানি হয়ে পড়ল, কাশীশ্বরের মাথা ফাটিয়ে মেরে ফেলে তারা শোধ নিল।

অরুণাক্ষকে জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁ বাবা, হাটখোলার সেই বাড়িতেই আছ তো তোমরা?

অরুণাক্ষ বলে, আজ্ঞে না। আপনার বই পড়বার পর বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কাশীশ্বরের আমলেই সে বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়, এখন তার চিহ্ন নেই—ভেঙে চৌরস করে তার উপর দিয়ে নতুন রাস্তা হয়েছে।

তারপর বলল, সে বাড়ি না থাক—কাশীশ্বরের দেশের বাড়ি রয়েছে—সেইখানে একটিবার আপনাকে যেতে হবে। যেতেই হবে। বাবা বলে দিয়েছেন।

আমি? সে হয় না, কোথাও আমি যাইনে। বুড়ো হয়েছি, ক-দিন আর বাঁচব। তার মধ্যে অনেক কাজ বাবা—কাজের অন্ত নেই। কাশীশ্বর একলা নন, আরও কত জনে অমনি চাপা পড়ে আছেন। মিথ্যের কবর দিয়ে রেখেছে। অপচয় করবার সময় আছে কি বাবা?

তখন লোভ দেখিয়ে অরুণাক্ষ বলে, কাশীশ্বরের ছবি রয়েছে আমাদের মণিরামপুরের বাড়ি। ছবি আরও একখানা আছে—হয়তো বা রামনিধির। গিয়ে দেখতে পাবেন।

বিশ্বেশ্বর উদাসীনভাবে, বললেন, ছবিতে দেখবার কি আছে? দুটো হাত, দুটো পা, একটা মাথা—সে তো সব মানুষেরই। বলি, কাগজপত্র আছে কিছু—পুরানো চিঠি-চাপাটি? আকাট-মুখ্যুরা কাগজ-পত্র উই-ইঁদুরে খাইয়ে যত্ন করে শুধু ছবি রেখে দেয়।

অরুণ তাড়াতাড়ি বলে, কাগজ আছে বই কি। কাগজের আণ্ডিল—তিনটে কাঠের সিন্দুক বোঝাই।

সরমা চলে গিয়েছিলেন, আবার ফিরে এলেন। বিশ্বেশ্বর উচ্ছ্বসিত ভাবে বললেন, ছেলেটি কে জান? আমাদের বড্ড আপনার লোক।

সরমা স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, তা জানি—

কি করে জানলে তুমি? আমাদের মণিরামপুরে বাড়ি এদেরই। কাশীশ্বরের বংশের ছেলে—

অদ্দূর হাতড়াতে যাই কেন? ছেলে আমাদের। কী মিষ্টি ওর মুখের কথাবার্তা!

অরুণের দিকে চেয়ে বললেন, মিষ্টিমুখ করে যেও বাবা। সেদিন ঐ কাণ্ড হল, শুধু-মুখে তোমরা চলে গেলে।

ইরাকে দেখিয়ে অরুণাক্ষ ভালমানুষের মতো বলে, শুধু-মুখে যাব কেন মা? জিজ্ঞাসা করে দেখুন, বিস্তর খাইয়েছিলেন। তার পরেও আর একদিন। দেখা হলেই খাইয়ে থাকেন।

হো-হো করে হেসে উঠল। বলে, ভরপেট গালি খাওয়ান। খাওয়াতে ওঁর জুড়ি নেই।

সবাই হাসছেন। ইরাবতীও। সরমা বললেন, হিংসে—বুঝতে পারলে না? একেশ্বর হয়ে জুড়ে আছে—পাছে ভাগীদার হয়, কাউকে তাই ধারে-কাছে ঘেঁসতে দেয় না।

সহজভাবে সরমা বললেন। ইরা হাসছিল, সে গম্ভীর হয়ে গেল। তখন খেয়াল হল, কথাটার অন্য রকম মানেও তো দাঁড়াতে পারে! অরুণ কি ভাবে নিল, কে জানে? কী লজ্জা—ছি-ছি! বয়সে বুড়ো হলেন, দুটো কথা গুছিয়ে বলতে পারেন না আজও!

অরুণাক্ষ চলে গেলে ইরা ফেটে পড়ল: মা, কাণ্ডজ্ঞান হবে তোমার কবে? গরিব আমরা, তাতে লজ্জা নয়। কিন্তু তোমার ভিখারিবৃত্তি দেখে আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে।

সরমা কড়া ভাবে বললেন, যত আধিক্যেতা! কতটুকু কি বলেছি যে মুখ নাড়তে এলি? মেয়ে থাকলে অমন সবাই বলে থাকে। কিছু না বললে লোকে জানবেই বা কি করে? লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না।

আমি বিয়ে করব না—

উঁহু, চিরকাল ধিঙ্গি হয়ে বেড়িও। তোমার সাধবাসনা না থাক, আমাদের আছে। পেটের ছেলে ফাঁকি দিয়ে গেল, তাদের জায়গা খালি রয়েছে—

মায়ের ব্যথা বোঝে তো ইরাবতী, সে নরম হয়ে যায়। বলে, আমি তো আছি মা, আমায় ছেলে বলে ভেবে নিতে পার মা? করছি তো তোমাদের ছেলেরই কাজ।

হেসে উঠল সহসা। বলে, আঙুরফল বড্ড টক মা, নাগালের মধ্যে আসবে না। পাকা কথা হয়ে আছে। সে মেয়ে হঠাৎ একদিন দেখে ফেলেছি। তোমাদের মেয়ে সেখানে টক্কর দিয়ে পারবে না।

দু-তিন দিন পরে ইরার সঙ্গে অভাবিতভাবে সাবিত্রী দেবী ও সুনন্দার দেখা হয়ে গেল। যথানিয়মে সে শোভাদের বাড়ি পড়াতে গিয়েছিল—ওঁরা কানপুরে চলে যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে আত্মীয়বাড়ি দেখা করতে এসেছেন। অনেক আশা করে অসুস্থ স্বামী ঘরে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। কোন দিকে সুরাহা হল না। না স্বামীর চিকিৎসা, না মেয়ের বিয়ে। অম্বুজাক্ষ গ্রাম থেকে ফিরে এসে পয়মাল করে দিলেন। রোগি দেখে বললেন, বাতের অসুখ—দশ-বিশ দিনে সারবার বস্তু নয়। অষুধ লিখে দিচ্ছি, কমে যাবে, ভালই থাকবেন। বাড়বে, কমবে—এই রকমই চলবে, এই বয়সে একেবারে সারে না। আর সুনন্দার বিয়ের সম্পর্কে—ছেলের মায়ের আপত্তি, আর ছেলেও এখন বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। উপযুক্ত ছেলে—তার মতের বিরুদ্ধে কিছু করা যায় না। ভারি লজ্জিত সেজন্য অম্বুজাক্ষ। সে যাই হোক, এমন চমৎকার মেয়ের জন্য ভাবনার কিছু নেই—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

খানিকটা নিজের কানে, খানিকটা ছাত্রীর মারফতে শোনা গেল। কিসে কি হল, ইরা বুঝতে পারে না। ছাত্রী বলে, আচ্ছা বলুন তো, সুনন্দা-দি'র মতো মেয়েতেও আপত্তি—ছেলের মা কেমন ডানাকাটা পরী আনবে কে জানে?

ছাত্রী তো এমনিভাবেই গল্প জমাতে চায়, মাস্টার ইরা তাকে নিরস্ত করে। আজকে কি হল, সে-ও একটু গা ভাসিয়ে দেয় ঐ স্রোতে। হেসে বলে, পরী হতে পারে, পেঁচাও হতে পারে।

ঠিক বলেছেন। বেশি বাছাবাছি করতে গেলে পেঁচাই জোটে শেষ পর্যন্ত। আমাদের এক জেঠতুত ভাই আছেন, শুনুন, তিনি তো—

ইরাবতী সহসা কর্তব্যে অবহিত হয়ে তাড়া দেয়, আচ্ছা আচ্ছা, কাজ কর এবারে তুমি। পরের কুচ্ছো করতে হবে না।

পঁচিশখানা 'ভারতে ইংরাজ'—প্রায় এক গন্ধমাদন। একখানা অম্বুজাক্ষ পাঠিয়ে দিলেন প্রতুল দত্তর বাড়ি। কাশীশ্বরের পরিচ্ছেদটার জায়গায় জায়গায় দাগ দিয়ে দিলেন। নিজে গেলেন না। পড়ে বোঝ এখন কাশীশ্বরের কদর, অম্বুজাক্ষের বংশের মহিমা। বাকি চব্বিশ খানার বিপুল বোঝা নিয়ে মহাস্ফূর্তিতে আবার মণিরামপুর চললেন। একা গেলেন এবারে, সুহাসিনী যাচ্ছেন না। ঝুপঝুপে বৃষ্টি, ব্যাঙ ডাকে দালানের কানাচে ডোবার ভিতর, সুপারিগাছ মাথা-ভাঙাভাঙি করে—ভেঙেচুরে ছাতের উপর পড়ে বুঝি বা। জোঁকের জন্য রোয়াকের নিচে এক-পা নামা যায় না—সুহাসিনীর ভারি অস্বস্তি লাগে, রাত্রি হলে ভয়ে কাঁপেন। এই তো সেদিন একবার ঘুরে আসা হল, রোজ রোজ যেতে হবে কেন? রথের মেলার বন্দোবস্ত করে এসেছ—ভালই তো, কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও, গাঁয়ে দশজন মাতব্বর আছে—যা করবার তারাই সব করুক।

অম্বুজাক্ষ হাসেন। গ্রাম থেকে দাঁড়াচ্ছেন যে এবার! দাঁড়ানোর আগে দেখাতে হবে হরিহর-আত্মা তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে। সুহাসিনীর ভরসা ছিল, তিনি বেঁকে বসলে শেষ অবধি যাওয়া বন্ধ হবে। অম্বুজাক্ষ

একলা বড় কোথাও যেতে চান না। কিন্তু এখন গতিক আলাদা—কেউ না যাবে তো একাই চললেন তিনি। বিয়ের পর থেকে সুহাসিনী মণিরামপুরের নাম শুনছেন, শ্বশুরদের তালুকমুলুক আছে—সেখান থেকে নায়েব এসে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা ইরশাল করে যায়। সেই গাঁয়ের অনেক পুরানো একতলা দালান—কাশীশ্বরের আমলের বাড়ি, তিনি কলিকাতায় ঘাঁটি করবার আগে বানিয়েছিলেন। কড়ি-বরগা নেই, খিলান-করা ছাত, পাকা আড়াই হাত পুরু দেয়াল, জানলা নয়—ছোট্ট ঘুলঘুলি দু-চারটে, দরজা দিয়ে একরকম গুঁড়ি মেরে ঢুকতে হয়। চোর-ডাকাতের ভয়ে সেকালের মুরুব্বিরা এমনি ব্যবস্থা করতেন। এতকাল পরে এবারে সুহাসিনী বাড়িটা চোখে দেখলেন, থেকেও এলেন মাস খানেকের উপর। গোটা দুই ঘর ভেঙেচুরে দুয়োর-জানলা বড় করা হয়েছে আজকালকার মানুষের বসবাসের মতো। এতেই বোঝা যাচ্ছে, অম্বুজাক্ষের মতলব এখন মাঝে মাঝে গাঁয়ে গিয়ে থাকবার।

তাই। এই যেমন মেলার বন্দোবস্ত করেছেন। নিজে ঘোরাঘুরি করবেন তিনি মেলার মধ্যে, ব্যাপারিদের সুখ-সুবিধা দেখবেন, যাত্রার আসরে জলচৌকি পেতে বসবেন সকলের মাঝখানে, একরাশ হাঁড়ি-বাঁশি ও আনারস কিনে বাচ্চাদের বিলোবেন। এই হল আসল, এই মেলামেশার জন্য যত উদ্যোগ-আয়োজন—আর সুহাসিনী বলেন কিনা, টাকা পাঠিয়ে দাও মাতব্বরদের নামে। মোটের উপর, রোগি-দেখা এবং নোটে-টাকায় দু-পকেট ভরতি করে বাড়ি ফেরা—এই নিয়ে অম্বুজাক্ষ আর খুশি থাকছেন না। টাকা ঢের হয়েছে, নাম-যশ চাই। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কত রামাশ্যামা লাটবেলাট হয়ে গেল—আর তিনি চিরকাল শুধুমাত্র ডাক্তারবাবু হয়ে থাকবেন, এটা কেমন করে হয়? কৃতান্ত যা বলেছিল—বাঘ কিঞ্চিৎ রক্তের স্বাদ পেয়েছে, ভাঁটির গাঙে

পুঁটিমাছ খেয়ে বেড়াতে তার মন চাচ্ছে না। কর্পোরেশনে ঢুকতে না পারুন, তার চেয়ে ঢের ঢের বড় মর্যাদা আছে। এসেম্বলির ইলেকশন আসছে। দাঁড়াবেন মণিরামপুর এলাকা থেকে, কাশীশ্বর এসে প্রথম যেখানে বসতি করলেন। যে কাশীশ্বরের গৌরবে স্বাধীন দেশের মানুষের বুক ফুলে উঠবার কথা। গৌরবটা সর্বমানুষের মধ্যে খুব ভাল করে জানান দেওয়ার দরকার।

যাই হোক, এবারে গাঁয়ে বেশি দেরি হল না। উল্টো-রথ চুকে যাবার পরেই অম্বুজাক্ষ ফিরে এলেন। বাড়িতে পা দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অরুণাক্ষের খোঁজ পড়ল: গিয়েছিলি নাকি রে?

অরুণ হকচকিয়ে যায়: কোথায় বাবা?

অম্বুজাক্ষ খিঁচিয়ে ওঠেন, এমন স্মরণশক্তি হলে পাশ করবি কি করে? 'ভারতে ইংরাজ' যিনি লিখলেন, ঠিকানা খুঁজে যাবার কথা ছিল না সেখানে? বিলকুল ভুলে বসে আছিস?

অরুণ বলে, ভুলব কেন? ভদ্রলোক যেখানটা থাকেন, গলির গলি তস্য গলি—

সাত সমুদ্দুর পার হয়ে কলম্বাস গোটা এক মহাদেশ আবিষ্কার করেছিলেন—

আমিও করেছি বাবা। খুঁজে খুঁজে হাজির হলাম সেই বাড়ি, বললামও অনেক করে। তা কলকাতা শহর ছাড়তে রাজি হচ্ছেন না তিনি। অনেক কাজ।

অম্বুজাক্ষ বলেন, ভাল করে বুঝিয়ে বলো। একবারের জায়গায় পাঁচবার যাও। গরজে পড়লে না গিয়ে উপায় কি? নিতেই হবে মণিরামপুরে। নিয়ে গিয়ে হৈ-হৈ করব, কাশীশ্বর রায়ের কথা বলবেন উনি।

ছেলে অতিশয় পিতৃভক্ত। ঐ যে বলে দিলেন একবারের জায়গায় পাঁচবার—তার পরে বাড়িতে অরুণের পাত্তা পাওয়া দায়।

সুহাসিনী একদিন বললেন, দিনকতক মরীয়া হয়ে তো পড়াশুনোয় লাগলি। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ, মোটে বাইরে বেরুচ্ছিস না। এখন বেরুনো ধরলি তো দিনরাত্রির মধ্যে টিকি দেখা যায় না। এই এক স্বভাব—যখন যা ধরবি, একেবারে চরম করে ছাড়িস।

অরুণাক্ষ বলে, কি করব মা? সে বুড়ো ভারি একগুঁয়ে—কিছুতে রাজি করানো যাচ্ছে না। বাবা নিজে যাবেন না, আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে খালাস। খোশামুদি করতে করতে প্রাণ যায়। অবিশ্যি, যে বই লিখেছেন—ঐ মানুষের কাছে একবার-দুবার কেন, দিনরাত গিয়ে পড়ে থাকলে অন্যায় হয় না। ঠাকুরদাদা রায় বাহাদুর—লোকে থুক-থু করত, চিরকাল আমরা ইংরেজের পা-চাটা। ইংরেজ সরেছে, কাশীশ্বরের আসল চেহারাও সঙ্গে সঙ্গে অমনি বেরিয়ে পড়ে সকল দোষের খণ্ডন হয়ে গেল। যাই বলো মা, আমরা কিন্তু চিরটা কাল বড্ড ভালো কাটিয়ে গেলাম। যেমন ইংরেজ আমলে, তেমনি এই স্বাধীনতার আমলে।

ও-বাড়িতে বিশ্বেশ্বর হচ্ছেন মেসোমশায়, সরমা হয়ে গেছেন মা। অরুণাক্ষ গিয়ে বলে, মেসোমশায় কোথায় মা?

সরমা বলেন, যেখানে থাকেন এ সময়টা। লাইব্রেরিতে।

কালকে তো চললাম আমরা সকলে। আমার মা-ও যাচ্ছেন। মেসোমশায়ের কোন রকম অসুবিধা হবে না।

সেটা কি আর বলে দিতে হবে বাবা? আমার কথা যাক—নইলে কি ইরাই ছেড়ে দিত তার বাপকে? কী রকম আগলে থাকে দেখ না—অমনি করে করেই আরও ওঁকে কাজের বা'র করে তুলেছে।

ইরা খুটখাট করছিল, এবারে উপরে বাপের তপোবন গোছাতে চলল। সেদিকে চেয়ে গাঢ়স্বরে অরুণ বলল, ইরা দেবীর মতন অবশ্য আমাদের সাধ্য নেই—কিন্তু এইটে জেনে রাখুন, মেসোমশায় আমাদেরও অতি-আপনার। একা আমি বলছিনে, বাবা-মা সর্বদা এই বলেন।

একটু হেসে বলে, বাবা বলেন—ফুলচন্দন দিয়ে ওঁকে পুজো করা উচিত। এই যে দেশের বাড়ি নিয়ে যাওয়া—সে-ও ঐ ব্যাপার, অঞ্চলসুদ্ধ মানুষ মিলে ওঁকে মাঝখানে বসিয়ে শাঁখ বাজিয়ে খৈ আর ফুল ছড়িয়ে আমোদ-আহ্লাদ করা।

সহসা গলা নামিয়ে অতি অতি অন্তরঙ্গ সুরে বলে, বাবা বলছিলেন, কিছু যদি করতে পারতাম ওঁদের জন্যে, মনে তৃপ্তি হত। আচ্ছা মা, কোন-কিছু চান না আপনারা? কোন দরকারেই লাগতে পারিনে?

সরমার দৃষ্টি সজল হয়ে উঠল। বললেন, চাইনে আবার! ভিখারির হাল দেখতে পাচ্ছ—তুমি তো বাবা বোকা ছেলে নও, সবই জান, সমস্ত বোঝ। ওঁর ওই গতিক। ছেলে ধরেছিলাম পেটে—একটা নয়, দুটি। কেউ তারা নেই। দুই ছেলের পর কত আহ্লাদের মেয়ে। সে আজকে টাকার ধান্দায় বাড়ি বাড়ি ট্যুইশানি করে বেড়ায়।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে আবার বললেন, কিন্তু একদিন হাত পেতে নিয়ে তো অভাব মিটবে না। তার চেয়ে একটা কথা বলি তোমায়। এঁদেরও বাড়ি মণিরামপুরে। ঘরবাড়ি নেই, শুনেছি পোড়ো-ভিটে আছে, আম-কাঁঠাল নারকেল-সুপারির বাগান আছে। ধানজমি কিছু ছিল, সে সব বারোজনে দখল করে নিয়ে খাচ্ছে। শুধু ফুল-খই না ছড়িয়ে, দেখো তো বাবা, হকের জমিজিরেত যা আছে সেইগুলো যদি আমাদের ছেড়ে দেয়।

অরুণাক্ষ বলে, আলবত্ত দেবে। আপোসে না দিলে আমাদের পাইক-বরকন্দাজ লাঠি মেরে জমি থেকে উচ্ছেদ করবে। ওখানে বাবার খুব প্রতাপ।

সরমা তাড়াতাড়ি বলেন, উঁহু, গণ্ডগোল না হয়। এমনি তো বাপ-মেয়ে শহর ছেড়ে এক পা নড়তে চায় না। তার পরে হাঙ্গামা-হুজ্জুতের ব্যাপার শুনলে একেবারে বেঁকে বসবে।

অরুণ আশ্চর্য হয়ে বলে, গাঁয়ে চলে যাবেন আপনারা?

না গিয়ে উপায় কি? অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল। বই লিখে ফুল আর হাততালি খুব মেলে, তাতে পেট ভরে না। মেয়ে আইবুড়ো থেকে চিরকাল বাপ-মায়ের অন্ন জোগাবে, সে তো হয় না! তার জীবনের সাধ-আহ্লাদ আছে, বিয়েথাওয়া দিতে হবে।

অরুণ ঘাড় নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, সে তো বটেই—

সেই তো ভাবনা বাবা, সকলের বড় ভাবনা—মেয়ে উপযুক্ত পাত্রে দেওয়া। উনি নিজের খেয়ালে মেতে আছেন। কে কি করবে—কোথায় টাকাকড়ি, কোথায় বা ছেলে।

অরুণাক্ষ বলে, আমি বলছি কি, এই ব্যাপারে মেসোমশায় বাবাকে একটুখানি বলুন। বাবা এখন দিলদরিয়া, জোর করে ধরলে কোন-কিছুতে 'না' বলবেন না। বুঝলেন মা, ইরা দেবীর বিয়ের কথা আমার বাবার কাছে অতি অবশ্য যেন পাড়েন, আপনি মেশোমশাইকে বিশেষ করে বলে দেবেন।

সরমা বললেন, না বাবা। সে হয় না। উনি কিছু বলবেন না, মেয়েও বলতে দেবে না।

অরুণাক্ষ মুখ শুকনো করে বলে, বিয়ের ব্যাপার—এমনি-এমনি হবে কি করে? কাউকে না কাউকে বলতেই হবে।

তা বলে অন্যের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে বিয়ে—উনি তাতে কক্ষনো রাজি হবেন না। মেয়েও শুনতে পেলে ক্ষেপে যাবে। জান তো ওকে।

জানি বই কি। অরুণাক্ষ জোর দিয়ে বলে, খুব ভাল করেই জানি। কিন্তু সাহায্য বলতে টাকাকড়ির কথা কেন ভাবছেন বলুন তো? সাহায্য কত রকমের হয়। বিয়ের ব্যাপারে ধরুন পাত্র চাই সকলের আগে—

হেসে উঠে বলে, না কি, গাছের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে? সে অবশ্য ভালই হয় মা। গাছকে গালমন্দ করুন, যত খুশি হেনস্তা করুন—চাই কি দু-এক ঘা বসিয়ে দিলেও গাছ কিছু বলতে পারবে না।

ইরাবতী নেমে এলো, এসে হুমকি দিয়ে পড়ল। তাকে দেখতে পেয়েই হয়তো অরুণাক্ষ শেষ কথাগুলো বলেছে। ইরা বলে, আমার কুচ্ছো হচ্ছে বসে বসে?

সরমা বলেন, মিথ্যে তো নয়। অরুণ তোকে ঠিক ঠিক চিনেছে। মেয়েমানুষের অমন মেজাজ—বলব কি বাবা, মেয়ের কথা ভাবতে গিয়ে হাতে-পায়ে খিল ধরে আসে। বিয়েথাওয়া ওর কপালে নেই, দেখেশুনে কোন পাত্তোর ঐ মা-মনসা ঘরে তুলবে? ভরসাই পাবে না।

অরুণাক্ষ ভয়ে ভয়ে ইরার দিকে তাকায়। ইদানীং যত আসা-যাওয়াই হোক, তবু সে বাইরের লোক—আরও বড় অপরাধ, বড়লোক তার বাবা। কিন্তু পরমাশ্চর্য ব্যাপার, এত কথা-কথান্তরের পরেও হাসিমুখ ইরার। ও-মেয়ের মেজাজ বোঝা ভার। ভরসা পেয়ে তখন সে সরমার কথার প্রতিবাদ করছে, তাই কি বলা যায় মা? পাত্র কত রকমের আছে। মাথা-খারাপও থাকতে পারে—মিনমিনে মেয়ে নয়, সিপাহি-সান্ত্রী যার পছন্দ।

ইরা কলকলিয়ে ওঠে, ঐ হল। শুনলে তো মা, মাথা-পাগলা ছাড়া তোমার মেয়ের গতি নেই। তার চেয়ে যেমন আছি, সেই তো বেশ ভালো। কি দরকার ঝামেলা জোটানোর?

হাসতে হাসতে সে রান্নাঘরে ঢুকল। ক্ষণপরে চা করে এনে বসে গেল একসঙ্গে।

এর পরে বুঝতে বাকি থাকে কিছু? ভোরে সূর্য ওঠার সময় সরমা ছাতে গিয়ে প্রণাম করে আসেন। অনেক কালের অভ্যাস। অরুণাক্ষ চলে গেলে এই আসন্ন সন্ধ্যায় তিনি ছাতে উঠে গেলেন, করজোড়ে ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কত কি কামনা করলেন। বিশ্বেশ্বর লাইব্রেরি থেকে ফিরলে বললেন, অরুণ এসেছিল। সকালবেলা ওদের মোটরে তোমায় তুলে নিয়ে যাবে।

বিশ্বেশ্বর গজর-গজর করছেন, শুধু বুঝি মোটর! মোটর থেকে ট্রেনে নিয়ে তুলবে। কোথাকার কোন স্টেশনে নেমে তারপরে মোটরবাস। কাঁচা-রাস্তায় পড়লে তখন আবার পালকি। যা ফিরিস্তি দিল, শুনে ভয় হয়ে যাচ্ছে—হাড়-পাঁজরার জোড়গুলো পথের মধ্যে খুলে খুলে না পড়ে!

কিশোরীবালা পুরানো ঝি। সে বলে, সভা তো এই এখানেও হল। তবে অদ্দূর কর্তাবাবুকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

বিশ্বেশ্বর বললেন, শুধু সভা হলে কে যেত? ফুলের মালার কটা পয়সা দাম যে অত কষ্ট করতে যাব? হেঁ-হেঁ, অন্য ব্যাপার আছে। বিষম লোভ দেখিয়েছে। সৎ ছেলে অরুণ—ও কখনো বাজে কথা বলবে না। ওর কথার উপরে যাচ্ছি।

সোল্লাসে সরমা বলেন, তোমাকেও বলেছে তা হলে? বড্ড ভালো ছেলে, ভালো হোক বাছার—

মুখ টিপে হেসে বলেন, ভালো ছেলে হোক যাই হোক, আজ-কালকার ওরা বজ্ড বেহায়া কিন্তু। আমাকে বলে সোয়াস্তি হয় নি, আবার তোমা অবধি গিয়েছে। যেমন যেমন বলে দিয়েছি, সেই সব কথা বোলো তুমি অরুণের বাপকে।

বিশ্বেশ্বর মাথা নাড়েন, নিশ্চয়—নিশ্চয়। যাচ্ছি তো সেইজন্যে।

স্বামীর উপর তবু সরমা পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারেন না।

কি ভাবে উত্থাপন করবে, বলো দিকি?

বুদ্ধিমান বিষয়ী লোকের মতোই বিশ্বেশ্বর জবাব দেন, দেখ, ঘুরিয়ে বলতে গেলেই যত গোলমাল বাধে। আমি সোজাসুজি বলব। যে আমার বই সত্যি সত্যি যদি ভালো হয়ে থাকে, আরও যাতে ভালো ভাবে কাজ করতে পারি সেই সাহায্য করুন।

এ-ও তো ঘোরপ্যাঁচ হয়ে গেল। কত কি হতে পারে, কি বুঝবেন ওর থেকে? স্পষ্টাস্পষ্টি বলবে, কন্যাদায় উদ্ধার করুন। অরুণের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বউ করে ঘরে তুলে নিন, নিশ্চিন্ত হয়ে যাতে লেখাপড়ায় লাগতে পারি। এমনি ভাবে বোলো।

বিশ্বেশ্বরের চোখে পলক পড়ে না: এ তুমি কি বলছ?

সরমা হাসতে লাগলেন, বলছি ঠিক। অত ভাবনা করতে হবে না গো! যাদের গরজ, তারাই ভাবাভাবি করছে। তুমি শুধু কথাটা অরুণের বাপের কানে তুলে দিও, বুঝতে পারবে তখন।

বিশ্বেশ্বর ইতস্তত করেন: এ যেন কৈকেয়ীর বর চাওয়ার মতন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারা কত বড়লোক, খবর রাখ না। গুণগ্রাহী মানুষ—সমাদর করে ডেকেছেন তো অমনি একেবারে বেয়াই হতে বলব?

সরমা বলেন, তোমরাই বা কম লোক কিসে? রামনিধির নামে বাপ-মেয়ে এত দেমাক কর। সে তো আর মিথ্যে কিছু নয়!

তারাও কাশীশ্বরের বংশের। বংশগৌরবে এক তিল আমাদের চেয়ে কম নয়।

সরমা বলেন, জাতে তুলে দিয়েছ তুমিই। কি করে তার ঋণ শুধবে, ভেবে পাচ্ছে না। শোন তবে, কথাটা উঠেছে ওই তরফ থেকেই। অরুণ এই যে ঘটা করে নিয়ে যাচ্ছে, মূলে তার ওই। হ্যাঁ, ব্যাপার বিয়েরই।

বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস করতে পারেন না। বলেন, যাও—ভারি তুমি খবর রাখ! কাশীশ্বরের আমল থেকে পুরানো কাগজপত্র রয়েছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইতিহাসে লিখা আছে ছোঁড়াটার—কোনটার কি দাম, ওরা তো ঠিক বোঝে না, ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সেইজন্যে।

সরমা হেসে বলেন, তাই বলেছে বুঝি? ঐ সব না বললে তোমায় টেনে বের করা কি সোজা?

বিশ্বেশ্বর অবাক হয়ে যান। বিয়ের সম্বন্ধ এক সাধারণ ঘটক দিয়েই তো হতে পারে। সেই কাজে তাঁকে কষ্ট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—হতে পারে না, এমন ফন্দিবাজ অরুণাক্ষ কখনো নয়।

একা বিশ্বেশ্বর নন, পঞ্চানন সঙ্গে যাচ্ছে। বিশ্বেশ্বরের কাছ থেকে লেখা নেওয়ার ব্যাপারে প্রথম আসা-যাওয়া—তারপর কি রকম টান পড়ে গেছে, পঞ্চানন সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী এদের। অরুণাক্ষ আছে অবশ্য, তবু এ তরফের একজন পাকা লোক থাকা ভাল। বিশ্বেশ্বরকে বিশ্বাস নেই—শুভকর্মের প্রসঙ্গ যখন উঠবে, কি বলতে তিনি কি বলে বসবেন। কৃতান্ত একবার বলেছিল, সে নিজে যাবে। কিন্তু যুগচক্রে যে ভাষায় অম্বুজাক্ষের নামে লিখেছে, তার পরে তাঁর নিজস্ব এলাকার মধ্যে ঢুকতে ভরসা পায় না। ওই অঞ্চলে শোনা যায়, হাতে মাথা কাটেন ওঁর নায়েব-গোমস্তারা। সেখানে স্বেচ্ছায় মাথা ঢোকানো বুদ্ধির কাজ হবে না। আর অম্বুজাক্ষও নিশ্চয় বেজার হবেন তাকে দেখে। পঞ্চাননই চলল তাই। বয়স কম হোক যাই হোক, কৃতান্তর সাকরেদি করছে এতদিন, সে-ও নিতান্ত হেলাফেলার বস্তু নয়। বিশ্বেশ্বরকে সেরে সামলে নিয়ে বেড়ানোর কাজ তাকে দিয়েও হবে।

সন্ধ্যাবেলা তাঁরা এসে পৌঁছলেন। অম্বুজাক্ষ ও সুহাসিনী আগে এসে আছেন। বিশ্বেশ্বরের পালকি সোজা ওঁদের বাড়ি চলে আসবে, ফরাস সাজিয়ে বসে আছেন অম্বুজাক্ষ। কয়েকটি ভদ্র-সজ্জনও এসে বসেছেন, গড়গড়ায় তামাক চলছে। এমন একজন মানুষ গাঁয়ে আসছেন—আলাপ-পরিচয় ও অভ্যর্থনার জন্য বসে আছেন সকলে। কিন্তু কোথায় কি। নদী-পারে হাটখোলার রাস্তায় বাস ওঁদের নির্বিঘ্নে নামিয়ে গেছে, সে খবর পেয়েছেন ঘণ্টা দুই আগে। পালকিতে এইটুকু পথ ইতিমধ্যে বার দুই-তিন

আসা চলে, অথচ কান খাড়া করে আছেন—রাতের নিস্তব্ধতায় অনেক দূরেও বেহারার ডাকের নিশানা মেলে না। অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন মনে মনে। পালকি মাঝপথে ভেঙে পড়ল নাকি? নয় তো আর কোন দুর্ঘটনা? অরুণের কাছে শোনা, নিপাট ভালো মানুষ বিশ্বেশ্বর লোকটি। দুর্গম অঞ্চলে টেনে নিয়ে এসে না জানি কোন বিপদে ফেলা হল মানুষটিকে!

পূজাটা এবার কিছু পিছিয়ে—কার্তিক মাসে। তার আগে এই বিশাল উৎসবের জোগাড় হয়েছে। যা গতিক, পূজার উৎসব চাপা পড়ে যাবে এর কাছে। হাটখোলার অবস্থা দেখে অরুণাক্ষ অবধি অবাক হয়ে গেছে। গোটা অঞ্চল ভেঙে এসেছে, লোকে লোকারণ্য। বেশির ভাগ লোকেরই হয়তো অক্ষর-পরিচয় নেই—'ভারতে ইংরাজ'-এর মহিমা তারা বুঝল কি করে? বাঘা বাঘা গুণী-জ্ঞানীরা যে বই কায়দা করে উঠতে পারেন না? কেমন করে যে বিশ্বেশ্বরকে ভালোবাসা দেখাবে, লোকে ভেবে পায় না। পালকি-বওয়ার বেহারাগুলোকে হাঁকিয়ে দিয়েছে: তোমরা বসে বসে তামাক খাওগে যাও, পালকি আমরা নিয়ে যাব। এত বড় একজনকে কাঁধে তুলে গ্রামে নিয়ে যাওয়ার গৌরব পেশাদার বাহকদের ছেড়ে দেবে না। এই নিয়েও বচসা, হাতাহাতির জোগাড়। সবাই কাঁধ দিতে চায়—কিন্তু পালকির দু-দিককার ডাণ্ডায় খুব বেশি তো আট আট ষোল কাঁধের জায়গা হয়, তার অধিক কি করে কুলোয়? তখন গতিক দাঁড়াল—দু-পা না যেতে অন্য দল এগিয়ে আসে: সরে যাও—সরে যাও, এবারে আমরা।

কোথায় কলকাতায় ছাতের উপরে সভা, আর গ্রাম অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষের এই বিরাট অনুষ্ঠান। পালকিতে উঠতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের মেয়ের কথা মনে পড়ছে। আহা, সে যদি চোখে

দেখত এই ব্যাপার! পঞ্চাননকে চুপি চুপি বললেনও একবার, ইরাকে নিয়ে এলে কেমন হত পঞ্চানন? তুমি এলে, সে-ও যদি আসত!

পঞ্চানন হেসে বলে, এখন আসতে যাবে কেন? পরে আসবে। কপালে থাকলে কতবার আসাযাওয়া করবে। আজ আমি তার কাজে এসেছি। আবার তারই নেমন্তন্নে হয়তো বা কোনদিন এখানে আসব।

তখন ধ্বক করে বিশ্বেশ্বরের সেই দায়িত্বের কথা মনে পড়ে যায়। সরমার মতে যা হল আসল কাজ। ভাবতে গিয়ে বিশ্বেশ্বর থই পান না। এই বিপুল সমারোহের মধ্যে কোন কৌশলে তিনি মেয়ের বিয়ের কথা পাড়বেন? লোকের ভিড়ে অবসরই পাবেন না। আর অম্বুজাক্ষই বা কি ভাববেন? এমন স্বার্থবুদ্ধি রামনিধি সরকারের প্রপৌত্রের পক্ষে মানানসই হবে না।

দেড় ক্রোশ পথ নিয়ে যেতে দু-ঘণ্টার উপর লাগল। অম্বুজাক্ষের বাইরের উঠানে নারিকেলতলায় পালকি নামল অবশেষে। অম্বুজাক্ষ প্রসন্ন নন। বিশ্বেশ্বরকে গাঁয়ে এনে হৈ-চৈ করবেন, উদ্যোগ-আয়োজন সমস্ত তাঁর—এখন টের পাচ্ছেন, কর্তৃত্ব তাঁর হাত থেকে পিছলে সর্বসাধারণের মধ্যে চলে গেছে। উঠানে নেমে অভ্যর্থনা করে বিশ্বেশ্বরকে ফরাসের তাকিয়ার পাশে এনে বসালেন—গ্রামের আরও দশটি ভদ্রলোক অভ্যর্থনায় এসেছেন, তাঁদের থেকে যেন আলাদা কিছু নন। সুহাসিনী ও আর কয়েকটি বউ-গিন্নি অন্দরের জানলায় দাঁড়িয়ে। বাইরে এসে দাঁড়াতে অসুবিধা নেই, এমন ক্ষেত্রে সুহাসিনী এসেও থাকেন। কিন্তু অম্বুজাক্ষ সামাল করে দিয়েছেন, চালচলনে হাবেভাবে শহুরে ভাব তিলেক ধরা না পড়ে। ভয়ে ভয়ে তাই আরও অতিরিক্ত মাত্রায় তিনি গাঁয়ের মেয়েলোক হয়ে আছেন।

বিশ্বেশ্বরের এই প্রথম দেখা অম্বুজাক্ষের সঙ্গে। সাধারণ ছুটো ভদ্রতার কথায় সবুর সয় না—আসবার আগে সরমা যে ভয় ধরিয়ে

দিয়েছেন সেই প্রশ্ন করে বসেন, কাশীশ্বর রায়ের আমলের পুরানো কাগজ আছে নাকি অনেক ?

আছে বই কি।

তখন কিঞ্চিৎ সুস্থির হলেন। ধাপ্পা দিয়ে এত কষ্টের পথে নিয়ে আসবে, সে ছেলে অরুণ নয়—জোর গলায় তাই বলে এসেছিলেন। তাঁর কথা খাটল। অধীর হয়ে বলেন, কোথায়—কোথায় ?

অর্থাৎ জায়গাটার নিশানা পেলে হাত-পা না ধুয়েই বসেন গিয়ে সেখানে। সহাস্য মুখে আবার প্রশ্ন করেন, তিনটে সিন্দুকে ঠাসা শুনতে পেলাম, সত্যি ?

অম্বুজাক্ষ বলেন, শুনেছেন মিথ্যে নয়। লোহার নয়, সেকেলে কাঠের সিন্দুক। ছাত দিয়ে জল পড়ত, জানলা-দরজায় কবাট ছিল না—একটু বৃষ্টি হলে জলের সমুদ্দুর খেলত ঘরের মধ্যে। আমি এই কিছুদিন আসা-যাওয়া করে যা হোক একটু ভদ্রস্থ করেছি।

শেষ করতে দেন না বিশ্বেশ্বর, হায়-হায় করে ওঠেন : মণিমাণিক্য অমন ভাবে রাখে কখনো ? সব বোধ হয় পয়মাল হয়ে গেছে।

অম্বুজাক্ষ হাসিমুখে ঘাড় নাড়লেন : জলে কিছু নষ্ট হয়েছে, উই-ইঁদুরেও কেটেছে কতক। ঘাবড়াবেন না—এখনো যা আছে, সে এক গন্ধমাদন।

বিশ্বেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান : চলুন তো—

অম্বুজাক্ষ অবাক হয়ে বলেন, সে কি—এখন কী তার। কষ্ট করে এলেন, বিশ্রাম করুন। কাগজপত্তোর রাতের মধ্যে তো পালিয়ে যাচ্ছে না ?

বিশ্বেশ্বর বললেন, তা নয়। তবু একটিবার চোখের দেখা দেখে আসি রায় মশায়। কণ্ঠে কাতর সুর। যেন পরমপ্রিয় একজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে এঁরা বাগড়া দিচ্ছেন।

সতীশ চাষীদের মধ্যে মাতব্বর। ভারি উৎসাহ তার। হাটখোলা থেকে সে সঙ্গে সঙ্গে আসছে। বিশ্বেশ্বরের পালকি নিজে বিশেষ কাঁধে তোলেনি। কিন্তু বড় এক বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে পাইক-বরকন্দাজের মতো পালকির আগে আগে এসেছে। সে বলল—হোক তাই ডাক্তারবাবু, দেখিয়ে দিন। এক নজর না দেখে সরকার মশায়ের সোয়াস্তি হবে না। সারা রাত্তির ছটফট করবেন। আপনারাও সুখ পাবেন না এমন অবস্থায় কথাবার্তা বলে। কেউ সঙ্গে করে ওঁকে নিয়ে যান।

অম্বুজাক্ষ ঘাড় কাত করে তাকালেন। হায় রে, মূর্খস্য মূর্খ সতীশ—সে এর মধ্যে কথা বলতে এসেছে। কিন্তু যে বিয়ের যে মন্তোর। এই গ্রামাঞ্চল থেকে অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়াবেন, এদেরই ভোটের আশায় আছেন। অতএব বাপু-বাছা করতেই হবে, কাউকে চটানো যাবে না। একটুখানি হাসির ভাব এনে বললেন, ইলেকট্রিক-আলো নেই, টিমটিমে হেরিকেনে কী-ই বা দেখবেন। বেশ, দেখে আসুন তাই—সকালবেলা আবার ভালো করে দেখবেন। মাঝের কোঠায় নিয়ে যাও ওঁকে অরুণ। সতীশও যাও না—একবারটি ঘুরিয়ে আনো।

রাতটুকু ভালো করে না পোহাতে অম্বুজাক্ষের বাড়ি লোকের আনাগোনা শুরু। অঞ্চলসুদ্ধ ক্ষেপে গেছে যেন। রামনিধি ফাঁসি গিয়েছিলেন, ইংরেজ তখন মাথার উপরে। দেশের মানুষ চুপিসাড়ে চোখের জল ফেলেছিল, গলা ছেড়ে কাঁদতে পারেনি। তিন পুরুষ পরে শোধ তুলছে তার এখন। সেই বংশের বিশ্বেশ্বরকে পেয়ে কি করবে, ভেবে পায় না। অম্বুজাক্ষ মৃদু প্রতিবাদ করেন, বয়স হয়েছে, এত ধকল কি সহ্য হবে ওঁর? এত জনের সঙ্গে গোনাগুনতি দুটো করে কথা বললেও খাটনিটা কী দাঁড়াবে আপনারা বুঝে দেখুন। বিকালে তার উপর সভা রয়েছে, সেখানে দু- চার কথা বলতে হবে।

বিশ্বেশ্বরেরও মনোভাব তাই। বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। ঘাড় নেড়ে অম্বুজাক্ষকে তিনি প্রবল সমর্থন করেন। লোকের ভিড়ে আসল কাজের গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। কাগজগুলো ঠাণ্ডা মাথায় একটুকু নেড়েচেড়ে দেখব, তা হচ্ছে না। আপনারা একটু রেহাই দিন তো ভাইসকল।

কেবা শোনে কার কথা! মানুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো—একটা দল চলে না যেতেই আবার এক দল। সতীশ বলে, পোড়ো ভিটে আছে আমাদের পাড়ায়। রামনিধির ভিটে। আর এক তেঁতুলগাছ —সে-ও শুনেছি সেই আমলের। সেইখানে নিয়ে যাব, একটিবার দেখে আসবেন।

কৃতান্তর শিষ্য পঞ্চানন—কাজকর্মের ব্যাপারে সদা সতর্ক। ফাঁক বুঝে অমনি কথাটা পাড়ল, শুধু ভিটে কেন—জমাজমি বাগবাগিচাও তো রয়েছে, বারো ভূতে বেদখল করে খাচ্ছে।

সতীশ বলে, এঁদের কারো আসা-যাওয়া নেই বলে এই অবস্থা। আসুন না গাঁয়ে—বছরে দু-একবার পদধূলি দিন। কার ঘাড়ে কটা মাথা দেখব, তার পরেও জায়গা বেদখল রাখে। ওসব কিছু নয়— গ্রামসুদ্ধ মানুষ পিছনে আছি, তার পরে ভাবনাটা কি?

এরই মধ্যে এক ফাঁকে পঞ্চানন সরাসরি অন্দরে ঢুকে সুহাসিনীর পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করল। বলে, দরবার নিয়ে এসেছি। বিশ্বেশ্বরবাবুর বাড়ির ছেলের মতো আমি।

সুহাসিনী কথা বললেন, বসুন—

বুড়ো মানুষটাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এলাম। কন্যাদায়ে বড় বিব্রত।

সুহাসিনী কুণ্ঠিত ভাবে বললেন, আমাদের সাধ্যপক্ষে যা করা চলে, নিশ্চয় তার ত্রুটি হবে না।

বললেন অবশ্য টাকাকড়ির দিকটা ভেবে। পঞ্চানন লাফিয়ে উঠল।

সাধ্য পুরোপুরি আছে। নয় তো আর বলি কেন? আপনার ঘরেই নিয়ে নিন মেয়েটাকে।

সুহাসিনী অবাক হয়ে রইলেন। পঞ্চানন বলে, ছেলের বউ করে নিন। সর্বাংশে উত্তম হবে। অমন মেয়ে হাজারে একটা মেলে না।

কেমন মেয়ে, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানেন না—তার উপরে এ ব্যাপারে অম্বুজাক্ষের মতামতই প্রচণ্ড। সুহাসিনী গোড়া থেকেই এড়িয়ে যেতে চান। মৃদুকণ্ঠে বললেন, ভালোই তো হত। কিন্তু কর্তার ছেলেবেলার বন্ধু কানপুরে থাকেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। ঠিকঠাক হয়ে আছে এরকম—

পঞ্চানন হেসে ওঠে, কানপুরের সম্বন্ধ তো ভেস্তে গেছে। জানেন না বুঝি?

জানেন সুহাসিনী সমস্ত, সাবিত্রীই এসে হাত ধরে কান্নাকাটি করে বলে গেছেন। কিন্তু কর্তার উপরে কথা বলতে যাবে কে? তা ছাড়া সুহাসিনীরও আগ্রহ নেই সুনন্দা মেয়েটার সম্পর্কে। সাত নয় পাঁচ নয়, ঘরের একটা মাত্র বউ—আরও সুন্দরী মেয়ে চাই। রঙ কটা হলেই সুন্দরী হয় না। সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে অম্বুজাক্ষ একটা সুযোগ করে দিলেন। কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছেন, এতদূর খবর এরা জানল কি করে? জেনেশুনে মেয়ের বিয়ের আশায় এদ্দূর এসেছে?

বলতে হয় তাই একবার বললেন, মেয়ে কেমন?

আমার মুখে কি শুনবেন, সেটা আপনার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করুন। হামেশাই যাচ্ছে আসছে ও-বাড়িতে, উনি ভালো জানেন।

পঞ্চানন খুব হাসতে লাগল। অর্থাৎ জোর আছে কন্যাপক্ষের, অরুণের পছন্দের মেয়ে। সুহাসিনীর চমক লাগে। অম্বুজাক্ষ

নাকি ছেলের মতামতের কথা তুলেছিলেন কানপুরের সম্বন্ধ ভেঙে দেবার সময়। কথাটা সুহাসিনী কানে নেন নি—একটা অজুহাত। এখন ভাবছেন, সত্যিই ঐ ধরনের কিছু হয়তো মূলে আছে। কিন্তু অম্বুজাক্ষ অন্যের মতামতের মূল্য দিচ্ছেন—এই বড় তাজ্জব! বিষম রকম বদলেছেন তিনি, সন্দেহমাত্র নেই। করপোরেশনে হেরে গিয়ে বিস্তর উপকার হয়েছে।

এতদূর যখন ঘটনা, পঞ্চাননকে সামাল করেছেন: অরুণের দেখা মেয়ে, খবরদার, এসব ওঁর কানে না যায়! তা হলে কাজ হবার আশা নেই। ওঁকে বলবেন, আপনিই দেখেশুনে যা করবার করুন। আগে থেকে দেখা আছে শুনলে এক কথায় কেটে দেবেন। সেই রকম ওঁর স্বভাব।

সেই উপদেশ মেনে নিয়ে পঞ্চানন ভিজে-বেরালটি হয়ে অম্বুজাক্ষের কাছে প্রস্তাব তুলল। বলে, বিবেচনা করে দেখুন—ঐতিহাসিক আত্মীয়তা আপনাদের মধ্যে। সেই কাশীশ্বরের আমল থেকে। নতুন করে সেইটে আবার ঝালিয়ে নেওয়া।

অম্বুজাক্ষের খুব বেশি উৎসাহ দেখা গেল না। আপত্তিও করলেন না। শুধু মাত্র বললেন, বেশ, মেয়ে তো দেখা যাক আগে—

পঞ্চানন শত-মুখে পরিচয় দিচ্ছে, ডানা-কাটা পরী না হলেও মেয়ে খারাপ নয়। গৃহস্থঘরে যেমন দেখেন, তার চেয়ে অনেক ভাল। নরম স্বভাব, বুদ্ধিমতী।

অম্বুজাক্ষ অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, ভালই তো—

তিনি বিকালের ভাবনা ভাবছেন। সভা বিষম জমবে। গরুর গাড়ি করে এখন থেকেই দূর-গাঁয়ের মেয়েছেলেরা এসে জমেছে। কিন্তু মেয়েছেলে কি বুঝবে বল তো? রথের সময় সেই যে অম্বুজাক্ষ মেলা বসিয়েছিলেন, তারই কাছাকাছি কিছু-একটা ভেবেছে। সে যাই

হোক, সভার মধ্যে বিশ্বেশ্বর যেন বেশ গুছিয়ে দু-কথা বলেন কাশীশ্বরের সম্বন্ধে। এবং কান টানলে যেমন মাথা আসে, অম্বুজাক্ষও এসে পড়বেন ঐ সঙ্গে। কিন্তু আক্কেল দেখ। কত উদ্যোগ-আয়োজন করে নিয়ে আসা হল—দু-জনে এসেছেন, এসে অবধি উভয়েই নিজ নিজ মতলব হাসিলের তালে রয়েছেন। সকালবেলা চক্ষু মুছে বুড়ো গিয়ে বসেছেন পচা কাগজপত্রের আণ্ডিলের মধ্যে, কলকাতায় একগাদা বয়ে নিয়ে যাবেন—তারই বাছাবাছি হচ্ছে। আর সঙ্গের সাগরেদটি ইত্যবসরে বুড়োর মেয়ে গছাবার ঘটকালি করে বেড়াচ্ছে। নির্বিকার দর্শক হয়ে থাকলে মতলব বানচাল হবে—বিশ্বেশ্বরকে হুঁশ করিয়ে দিতে হবে, কাশীশ্বরের কথা বলবার জন্যই তাঁকে মণিরামপুর নিয়ে আসা।

উঠে গিয়ে তিনি অরুণাক্ষকে ডাকলেন, সভার সময় হয়ে আসছে। তার কি বন্দোবস্ত ?

অরুণাক্ষ উল্লাসভরে বলে, সমস্ত হয়ে গেছে। একবার দেখে আসুন গিয়ে। অশ্বত্থতলায় বেদি—দেবদারু-পাতা আর গাঁদাফুলে সাজিয়েছে, আলপনা দিয়েছে।

অম্বুজাক্ষ খিঁচিয়ে ওঠেন : বেদির উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু উনি মশা মারবেন ? বলবেন-টলবেন না ?

তাড়া খেয়ে অরুণ হকচকিয়ে যায়।

বলবেন বই কি ! বক্তৃতা না হলে সভা কিসের ?

কি বলবেন, তার কিছু তালিম দেওয়া হল ? ধরো, উনি ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমির গল্প ফেঁদে বসলেন। আমাদের তাতে কোন কাজটা হবে ?

অরুণাক্ষ এবার হাসল : তা সত্যি, বক্তৃতা ওঁর একেবারেই আসে না। আগডুম-বাগডুম বকেন, খেই খুঁজে পাওয়া যায় না। লেখেন এমন চমৎকার—

অম্বুজাক্ষ বললেন, কচু লেখেন। গলদঘর্ম হয়ে গেছি, বই তবু শেষ করতে পারলাম না। দেবভাষা সংস্কৃতও স্ফটিক জল ওঁর ভাষার কাছে। বইয়ের বিষয়টা ভাল, কিন্তু কাঁটা ছড়িয়ে সে মৃণাল বের করবার তাগত ক-জনার?

অরুণ কি বলবে, সে নিজেই ভুক্তভোগী। অম্বুজাক্ষ বলেন, সভায় দাঁড়িয়ে মুখে মুখে উনি যা বলবেন, সোজাসুজি তাই সকলের কানে ঢুকে যাবে। সেইটে যাতে ঠিকমতো হয় দেখ তুমি। পাগল-মানুষের উপর ভরসা কোরো না—বক্তৃতা লিখে দাও, উনি পড়ে যাবেন।

সারা দুপুর বসে বসে অরুণাক্ষ অভিভাষণ বানাল। 'ভারতে ইংরাজ' পড়া আছে, তার শেষ অংশটা। এই মণিরামপুরের কথা যেখানে। নদীর ধারের জঙ্গলে ঢাকা ভাঙাচুরো ঐ নীলকুঠি—লেখার মধ্যে যেন জীবন্ত ও জমজমাট হয়ে উঠল। নীলখোলায় ভারে ভারে নীল এসে জমছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ টমাস সাহেব। ফাঁসির দড়ি মালার মতো গলায় ঝোলানো রামনিধি সরকার। আর আছেন রামনিধির অভিন্নহৃদয় বন্ধু রামনিধির সর্বকর্মের সহায়ক কাশীশ্বর—

অম্বুজাক্ষ এসে তাগিদ দেন, হল শেষ?

হয়েছে বাবা। উৎসাহভরে খানিকটা শুনিয়েও দেয়। অম্বুজাক্ষ গভীর মনোযোগে শুনে ঘাড় নাড়লেন, উঁহু—কাশীশ্বরকে বাড়াও। আরও বাড়াও। হাতে পেয়েছ যখন ছাড়বে কেন? রামনিধিকে দেশসুদ্ধ লোক চিরকাল ধরে জানে। কাশীশ্বরকে উল্টো জেনে বসে আছে। এখন খুব ফলাও করে না বললে মানুষের মনে ধরবে না। আমাদেরও গরজ তাই।

পাড়াগাঁয়ে এত বড় সভা—না দেখে কেউ ধারণায় আনতে পারবে না। নীলখোলার পাশে খানিকটা ডাঙা-জমি—সারি সারি তিনটে

অশ্বত্থগাছ, সামনে সরকারি রাস্তা, রাস্তার ওদিকে মাঠ। দুপুর না হতেই ডাঙা-জমিটুকু ভরতি হয়ে গেছে। তার পরে মাঠের উপর লোক বসছে। বর্ষাকাল সবে শেষ হয়েছে—জল না থাকুক, মাঠের মাটি নরম ভিজে-ভিজে, এখানে-ওখানে কাদাও রয়েছে। সে সব বাদ-বিচার করে না কেউ, কাদার উপরই জাপটে বসছে। যতখানি নজর চলে, সীমাহীন নরমুণ্ড। আর, ভূমির উপরে শুধু নয়—চারিদিকে গাছগাছালি, এক আমবাগান অদূরে—গাছের ডালে ডালে অগুন্তি মানুষ-ফল ফলে আছে যেন। রামনিধির নামে জয়কার উঠছে। কাশীশ্বরের কথা উঠছে না এমন নয়—অম্বুজাক্ষের লোকজন রয়েছে, মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে তারা। কিন্তু স্বল্পপরিচিত নাম নিয়ে উল্লাস করতে লোকের বোধ করি বাধো-বাধো ঠেকে।

রামনিধির চরম আত্মদানের গল্প ঘরে ঘরে রূপকথার মতো চলে আসছে এ তাবৎ। মা বলেছেন শিশুকে, সেই শিশু বড় হয়ে আবার তার সন্তানকে বলেছে। বলেছে এদিক-ওদিক তাকিয়ে, আশেপাশে কিম্বা ঘরকানাচে কেউ আছে কিনা। চেনা মানুষ বলে নিশ্চিন্ত হবার জো নেই; এমনও দেখা গেছে, ইংরেজ টাকা খাইয়ে পরম আত্মীয়কেও হাত করে রেখেছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, এক সময়ে এমনি হয়েছিল বটে! শ্বশুর সুধালেন, বউমা কোথায়? অনতিপরে পুলিশ এসে পড়ল। চর শুনে গেছে, বোমা কোথায়? বউমা বলতে বোমা শুনে গেছে।

রামনিধি গেলেন, তখন চোখের জল চেপে-চুপে রাখতে হয়েছে। এখন দিন বদলেছে। পুরুষানুক্রমে যে ভালবাসা জমে আছে রামনিধির জন্যে, আজকে তা সহস্র ধারায় কলকল নিনাদে বেরিয়ে পড়ল। সভার বেদির উপর বিশ্বেশ্বরের দিকে একনজরে তাকিয়ে তারা সেকালের এক পুরুষসিংহকে দেখছে। ওরই মধ্যে কাশীশ্বরকে

ঢোকাবার চেষ্টা হয়েছিল, দু-একজন বক্তা উল্লেখ করেছিলেন তাঁর নাম—কিন্তু জমল না। আর বিশ্বেশ্বর মানুষটাও তেমনি—হাতে রয়েছে অরুণাক্ষের লেখা অভিভাষণ, গোড়ায় দু-চার ছত্র পড়েও ছিলেন, তারপর অত সমাদরের মধ্যে ক্ষিপ্তবৎ হয়ে গেলেন। হাতের কাগজ পড়ে গেল মাটিতে। তাঁর নিজস্ব গালিগালাজ যথারীতি শুরু হয়ে গেল। পণ্ডিতেরা হলেন মূর্খস্য মূর্খ, ইতিহাসে আনাড়ি—তাবৎ দেশের মধ্যে সবজান্তা একমাত্র হলেন তিনিই। গতিক দেখে অম্বুজাক্ষ সভাস্থল থেকে উঠে বেরিয়ে গেলেন।

রাতে খেতে বসে প্রকাণ্ড মাছের মুড়ো সাপটাতে সাপটাতে পঞ্চানন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ধন্য আপনি রায় মশায়। পাড়াগাঁ জায়গায় এত বড় সভা ভাবতে পারা যায় না। সবই আপনার কৃতিত্ব।

অম্বুজাক্ষ বিরস কণ্ঠে বললেন, কিন্তু কাশীশ্বরের কথা একবারও হল না—

বিশ্বেশ্বরের খেয়াল হল। জিভ কেটে বলেন, ছি-ছি, ভুলে গিয়েছিলাম।

বক্তৃতা তো লেখাই ছিল।

তা বটে! বিষম ভুল হয়েছে।

একটু থেমে সান্ত্বনার ভাবে বলেন, যাকগে—অর্ধেক বলে কি হবে? কাশীশ্বরকে আরও ভাল করে পাব মনে হচ্ছে। পুরোপুরি পেয়ে যাব। তাঁকে নিয়ে পড়লাম এবার, খুব ভাল করে লিখে ফেলব তাঁর কথা। আবার কখনো যদি আসি, ভাল করে বলব।

—দশ—

সময়টা মোটামুটি জানা আছে, কোন সময়ে ট্রেন শিয়ালদহ পৌঁছবে, স্টেশন থেকে ট্রামে বাসে কতক্ষণ লাগতে পারে। সরমা এতক্ষণ রান্নাঘরের কাজকর্মে ছিলেন। কিন্তু উৎকণ্ঠায় ঘরের মধ্যে থাকা যায় না, ঘন ঘন বাইরে আসেন, রাস্তার দরজা খুলে গলির মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখেন বারম্বার। ইরাকে বলেন, কটা বাজল রে?

ইরা হেসে বলে, ঘড়ি দেখাদেখির কি আছে মা? এই ট্রেনে যদি আসেন, সন্ধ্যের ভিতর ঠিক এসে পড়বেন।

যেন জানেন না তিনি সেটা। ভাব দেখ মেয়ের! হাতে ঘড়ি বাঁধে—ঘরে গিয়ে ঘড়িটা একবার দেখবে, তাতেও আলস্য। এমন ঘর-বরেও উৎসাহ নেই—কী তার মনের কথা, কেবা জানে! টাইমপিস আছে দোতলার তপোবনে, রাগ করে সরমা থরথর করে উপরে চললেন।

গোটা দুই-তিন সিঁড়ি উঠেছেন, ঠুনঠুন করে দোরগোড়ায় রিক্সা থামল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের গলা, ওরে ইরা—

ছ্যাঁৎ করে উঠল সরমার বুকের ভিতর। রিক্সা করে আসতে হল, অসুখ-বিসুখ করে নি তো? কোনদিন কোথাও যান না, শরীর অপটু, দুবেলা দুটি দুটি পাখির আহার করেন—সেই মানুষ ধাপধাড়া জায়গায় গেলেন। সরমাও 'না' বলতে পারলেন না মেয়ের বিয়ের কথা ভেবে।

বিশ্বেশ্বর বললেন, দুয়োর খোল গো—

ততক্ষণে কিশোরীবালা দুয়োর খুলে দিয়েছে। সরমা তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ালেন।

খবর কি ?

ভালো খবর।

উল্লাসে বিশ্বেশ্বর যেন মাটির উপর পা রেখে হাঁটছেন না, আকাশে উড়ছেন। সরমাও খুশি হয়ে বললেন, কার্যসিদ্ধি হয়েছে তা হলে ?

সিদ্ধি মানে ? এতখানি আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

গলির উপর অদূরে রিক্সা দাঁড়িয়ে। রিক্সাওয়ালা বলে ওঠে, আমায় বাবু ছেড়ে দিন।

তখন ঠাহর হল, রিক্সায় মানুষ আসে নি, এসেছে বিস্তর পোঁটলা-পুঁটলি। পঞ্চানন নামিয়ে নামিয়ে সেগুলো দরজার চাতালে জড় করছে।

কিশোরীবালা সকৌতুকে বলে, অত সব কি এলো কুটুম্ববাড়ি থেকে ? বিয়ে না হতে তত্ত্বতালাস ?

সরমা বলেন, কি রকম কি কথাবার্তা হল, দু-চার কথা বলো দিকি শুনি ?

বিশ্বেশ্বর একনজরে ঐ বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, বলছি। ঠাণ্ডা হয়ে বসে সমস্ত বলব। শোনাবার মতোই ব্যাপার বটে।

সহসা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন : ফেলে দিলে পঞ্চানন ? ছি-ছি, রাস্তার ধুলোয় পড়ে গেল। তোমার দ্বারা হবে না, তোমার নিষ্ঠা নেই—সরো।

একটা পুঁটলি পঞ্চাননের হাত ফসকে পড়েছিল, বিশ্বেশ্বর ছুটে এসেছেন। সন্তান মাটিতে পড়লে যেমন করে, তেমনি ব্যাকুলতায় দু-হাতে পুঁটলিটা তুলে ধরে তিনি ধুলো ঝাড়ছেন। রোষ-দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন পঞ্চাননের দিকে।

সঙ্গে যাও।

পঞ্চানন বেকুব হয়ে বলে, এত বোঝা আপনি দোতলায় তুলবেন কেমন করে? আর পড়বে না, দুটো-তিনটে করে নেবো না, খুব সামাল হয়ে একটা একটা করে নিয়ে যাব।

না, অত বড় অপরাধের ক্ষমা নেই বিশ্বেশ্বরের কাছে। পঞ্চাননকে ঘেঁসতে দিলেন না। বিশ্বেশ্বর সিঁড়ি ভেঙে কাগজপত্র একাই তপোবন-ঘরে তুলে ফেলছেন।

তখন ইরাবতী হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়ে: এই কষ্ট করে এলে বাবা, আবার এখন উপর-নিচে করতে হবে না।

পঞ্চাননের সঙ্গে যে মেজাজ চলে, মেয়ের উপর তা চলবে না। নরম হয়ে বললেন, কি জিনিস জানিসনে তো! বলি, হীরেমুক্তো বয়ে নিতে কষ্ট হয় নাকি? মেয়েলোকে তা হলে অত গয়না পরে ঘোরে কেমন করে?

হেসে উঠলেন তিনি। কিন্তু ভবী ভোলে না। কাগজের বোঝা কেড়ে নিল বাপের হাত থেকে। বলে, সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ বাবা, তোমার হীরে-মুক্তোর এক কণিকা খোয়া যাবে না।

এইটুকুতেই বুড়ো মানুষ হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তা ছাড়া এ সব ব্যাপারে দ্বিতীয় ব্যক্তি কারও উপর যদি আস্থা করা যায়, সে ঐ ইরাবতী। পঞ্চাননটার মতন হাঁদারাম নয়। অতএব দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বেশ্বর, ইরাই তুলছে সমস্ত। তাকে কে ঠেকাবে?

সরমা কাছে এসে আবার সেই কথা তুললেন: শুভকর্ম কোন নাগাদ হতে পারে, তার কিছু হল? দিতেথুতে কি হবে?

বিশ্বেশ্বর প্রমাদ গণেন। মুখের হাসি নিমেষে মুছে গেল। তাই তো!

সরমা কঠিন হলেন, বিয়ের কথা হয় নি বুঝি কিছুই?

বিশ্বেশ্বর আমতা-আমতা করেন : হয়েছে বই কি! পঞ্চানন ছিল,- সে কাজ ভোলবার ছেলে নয়। কথাবার্তা অনেক হয়েছে।

বলতে বলতে পঞ্চাননের উপর হাঁক দিয়ে ওঠেন : চুপচাপ আছ কেন? আচ্ছা মানুষ! এরা ব্যস্ত হয়ে আছে, বলে ফেল সমস্ত।

সরমা বলেন, কথাবার্তা পঞ্চাননই বলেছে—মেয়ের বাপ তোমার কোন চাড় নেই?

আমি ফুরসৎ পেলাম কখন? কাগজ দেখতে দেখতে সময় চলে গেল। তা-ও কি হয়েছে, গন্ধমাদন তাই এদ্দূর ঠেলে নিয়ে আসতে হল। ধীরেসুস্থে এখানে বসে বাছাবাছি করব।

বলতে বলতে বিশ্বেশ্বর চটে উঠলেন : বৃষ্টির ছাট আসে—সেই জায়গায় সিন্দুক রেখে দিয়েছে। কত জিনিস বরবাদ হয়ে গেছে, ঠিক নেই। ওদের মতন বোকা আছে দুনিয়ার উপর! উঁহু, বোকা বললে হয় না, কি বল পঞ্চানন? সর্বনেশে লোক, খুনীর বেহদ্দ! কাগজপত্র যা নষ্ট করেছে, ফাঁসিতে লটকালেও রাগের শেষ যায় না।

সরমা গর্জন করে ওঠেন : পচা কাগজের আণ্ডিল উনুনে দেব আজকে আমি—

পঞ্চানন তাড়াতাড়ি প্রবোধ দেয় : রাগ করেন কেন মাসিমা। সে এক এলাহি কাণ্ড—অগুন্তি মানুষের ভিড়। তার মধ্যে বেশি কথাবার্তার সময় কখন? আমি প্রস্তাব তুলেছি। সমস্ত শুনে মোটের উপর ডাক্তারবাবু 'হাঁ'-ই বললেন। বলেন, ভালই তো! অর্থাৎ নিমরাজি আছেন, মেয়ে দেখে পুরোপুরি মত দেবেন। ছেলের মা-ও আমায় আলাদা করে সেই কথা বললেন। বিষম রাশভারি মানুষ—ছেলের পছন্দে অমনি যে ঘাড় নেড়ে বলবেন তেমন মানুষ অম্বুজ ডাক্তার নন। আমিও ছাড়ন-পাত্র নই—আপনাকে

বলে রাখছি মাসিমা, এই মাসের ভিতরে ডাক্তারকে টেনেটুনে এনে মেয়ে দেখিয়ে লগ্নপত্তোর করিয়ে তবে ছাড়ব।

খাঁটি ছেলে পঞ্চানন, ফাঁকিবাজি জানে না। যে কথা বলল, ঠিক তাই। উঠে পড়ে লেগেছে অম্বুজাক্ষকে এনে মেয়ে দেখানোর জন্য। তাঁকে বের করা মুশকিল। অহরহ লোকের ভিড়। রোগিরা তো আছেই—তার উপর ইলেকশন যত এগিয়ে আসছে, হিতাকাঙ্ক্ষীর দল তত বৈঠকখানা জমিয়ে বসছে। দিনরাত্রি শলাপরামর্শ। করপোরেশনের ব্যাপারে ভরাডুবি হয়ে গেল, এবারে সকলে কোমর বেঁধে লাগছেন—পার ওঁরা করাবেনই। কোন পার্টি থেকে দাঁড়াবেন, কাদের কাছে কি সুবিধা, বিচার-বিবেচনা শেষ করে অবিলম্বে তোড়জোড় শুরু করতে হবে। এমনি দেরি হয়ে গেছে। যাদের এ মতলব—এমন কি, পাঁচ-ছ বছর আগে থেকেও কেউ কেউ পথ তৈরি করে। মাথায় খদ্দরের টুপি চড়ায়, কিম্বা মোটরগাড়ি পুত্র-পরিবারকে দান করে পায়ে হেঁটে বস্তিবাসীর সেবায় নেমে যায়। দেশ স্বাধীন, দেশের কাজ মানে মারধোর আর জেল-দ্বীপান্তর নয়—হেঁ-হেঁ, মজা আছে। ভিড়ও তাই অঢেল। প্রফুল্ল দত্তর কথা অন্যায় কিছু নয়; তাঁর উপরে চটবার হেতু নেই। অমুক পার্টি থেকে দাঁড়াব বললেই অমনি গদগদ হয়ে টিকিট হাতে এগিয়ে আসবে না, সেই পার্টি যত সামান্যই হোক না কেন। টিকিট যোগাড় করা সত্যি এক ধুন্দুমার ব্যাপার, আসন্ন ইলেকশনের পূর্ববর্তী আর এক ইলেকশন।

অম্বুজাক্ষ অতএব সেই কর্মে মরীয়া হয়ে লাগলেন। রোগিরা ছটফট করে, বেরিয়ে এসে ডাক্তারবাবুর একনজর দেখবার সময় হয় না। রোগি মারা যাচ্ছে, তবু না।

কিন্তু পঞ্চানন নাছোড়বান্দা। বার তিনেক ইতিমধ্যে হানা দিয়ে পড়েছে।

মেয়ে দেখতে যাবেন, তার কি হল ?

যাব, যাব—

বলেন তো ঐ রকম। কবে যাচ্ছেন, ঠিক করে বলে দিন।

এনগেজমেন্ট-বইয়ের কয়েকটা পাতা উল্টে ক্ষণকাল এচিন্তার ভান করে অম্বুজাক্ষ বললেন, মঙ্গলবারে—

সামনের এই মঙ্গলবারে তো ?

পঞ্চাননের কথায় খেয়াল হল, একবার ঘাড় নেড়ে দিলে আরও তো দিন সাতেক হাতে পাওয়া যায়। বললেন, ওরে বাস রে। এ মঙ্গলবারে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই। এই মঙ্গলের পরের মঙ্গলবার।

বেশ, এই মঙ্গলের পরের মঙ্গলে—তারিখটা হল ষোলই। আমি এসে নিয়ে যাব।

পঞ্চাননটা এমনই—যেন ছিনেজোঁক। নিজের খাতায় তারিখ টুকে নিল। অম্বুজাক্ষকে বলে, আপনিও লিখে দিন ডাক্তারবাবু। নয়তো —নানা কাজের মানুষ—মনে থাকবে না। বিকেল তিনটে নাগাদ চলে আসব আমি।

অম্বুজাক্ষ লিখে নিলেন। যাবেন বলে নয়। ঐ সময়টা রোগি দেখা বা অন্য কোন ছুতোয় বেরিয়ে পড়বেন। পঞ্চানন এসে ধরা না পায়। পঞ্চানন না হয়ে বিশ্বেশ্বর নিজে যদি আসতেন স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেওয়া যেত, না মশায়, মাথায় আগুন জ্বলছে—বিয়েথাওয়ার কথা এখন ধামা-চাপা থাকুক। কিন্তু পঞ্চানন হল যুগচক্রের মানুষ—যুগচক্র ভেল্কি দেখিয়েছে কর্পোরেশন-ইলেকশনের সময়ে। এবারে ওদের তোয়াজ করে যেতে হবে কাজ ফতে না হওয়া অবধি। আর ওরা বলে কথা কি—কাগজের লোক মাত্রই

গুরুঠাকুরের মতন এ সময়টা। তা বলে পাকা-কথাও দেবার জো নেই, টালবাহানা করতে হচ্ছে। আবার এক বিশেষ কারণ ঘটেছে। সেইটে প্রকাশ হয়ে পড়ল। অরুণকে একদিন ডেকে বললেন, বিকালবেলা পাত্রী দেখতে যাবে তুমি। আজকেই। আমি কথা দিয়ে এসেছি।

অম্বুজাক্ষ নিজ মুখে ছেলেকে পাত্রী দেখবার জন্য বলছেন। সুহাসিনী সেখানে ছিলেন, মুখ টিপে হাসলেন তিনি। সুনন্দার সম্বন্ধ ভেঙে দেবার সময়ও ছেলের মতামতের কথা তুলেছিলেন বটে। আত্মীয়-বন্ধুর ছেলেমেয়ের ব্যাপারে লম্বা লম্বা বচন ঝাড়া হয়—কচিকাঁচা ওরা সংসারধর্মের কি বোঝে, বিয়েথাওয়ার কাজে ওরা কি বলবে, আর বললেই বা শুনছে কে? প্রবীণ অভিভাবকেরা শুভাশুভ বিবেচনা করে যা ঠিক করবেন, ঘাড় হেঁট করে সেই নামে মন্ত্র পড়ে যাবে। ব্যস! সেই মানুষ, দেখ, নিজের ছেলেকে কনে পছন্দ করে আসতে বলছেন।

মুখ টিপে হেসে সুহাসিনী বলেন, তাই যাস। আগে দেখে থাকিস তো সে হল ভাসা-ভাসা দেখা। এবারে বেশ খুঁটিয়ে দেখে আয়। একা যেতে না চাস তো দু-একটি বন্ধুবান্ধব নিয়ে যাস সঙ্গে করে।

স্ত্রীর হাসির অর্থ অম্বুজাক্ষ বুঝলেন। বলেন, কেউ যদি যেতে চায়, সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। কন্যাপক্ষের আপত্তি নেই। মোদ্দা, তোমার নিজের যাওয়া যাই—বকলমে চলবে না। পাত্রীর দিদিমা কাশী যাওয়ার মুখে ক-দিনের জন্য কলকাতা এসেছেন; তিনি একটু দেখে নিতে চেয়েছেন। অন্য সকলেও দেখবে। তোমাকেই যেতে হবে। আমি তাই বলে এসেছি।

সুহাসিনী বলেন, দিদিমা হয় তো দেখেন নি, কিন্তু অন্য সকলের অনেকবার দেখা হয়ে গেছে।

তাই নাকি?

জান তুমিও, খেয়াল নেই। তোমার কথামতোই তো খুঁজে খুঁজে বিশ্বেশ্বর সরকার মশায়ের বাড়ি বের করল।

অম্বুজাক্ষ ভ্রূকুটি করেন: সরকার মশায়ের মেয়ে দেখাবার জন্য পঞ্চানন ছোঁড়া অস্থির করে মারছে। জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তা দেখব আমি সে মেয়ে, দেখতেই হবে, পঞ্চাননকে এড়ানো যাবে না। কিন্তু এটি সে নয়, এ হল এক নতুন সম্বন্ধ।

কার মেয়ে? বাড়ি কোথায়?

অম্বুজাক্ষ হেসে বললেন, মেয়ের বাপ হলেন প্রতুল দত্ত। কলকাতা শহরে প্রতুল দত্তর ঠিকানা বলতে হয় না। অরুণ গিয়েছে সে বাড়ি।

অতিশয়োক্তি নয়। রাজা-মহারাজা নন প্রতুল—তাঁদের অনেক বেশি। রাজা-মহারাজারা তো রাজ্যপাট হারিয়ে ফতুর হয়ে যাচ্ছেন। এঁরা চিরকাল দেশের কাজ করে এসেছেন, ইদানীং তার দাম উশুল হচ্ছে। স্বাধীন-ভারতের স্বর্গধামে ইন্দ্র-চন্দ্র বায়ু-বরুণদের ভিতর একজন। সেই খোদ প্রতুল দত্তর মেয়ে।

সুহাসিনী বলেন, ওঁর শালীর মেয়ের সঙ্গেই তো হচ্ছিল। কত কি বললেন যে আমাদের সম্বন্ধে! তুমি রাগ করে ভেঙে দিলে।

অম্বুজাক্ষ বললেন, বলেছিল, রায় বাহাদুরের নাতি আমি—ঠাকুরদাদা ইংরেজের জুতো বয়ে বেড়িয়েছেন। তখন বলেছিল, এখন আর বলবে না। যেচে নিজের মেয়ের কথা বলেছে। বর্তে যাবে কাশীশ্বরের বংশে মেয়ে দিতে পারলে। প্রতুল দত্ত ইংরেজের জেলই খেটেছেন, ইংরেজের লোকের লাঠি খেয়ে মরেন নি কাশীশ্বরের মতন। আমাদের মতো বড় কুলীন স্বাধীন-ভারতে কজন?

রায় দিয়ে অম্বুজাক্ষ চলে গেলেন। তখন অরুণ বোমার মতো ফেটে পড়ে: কক্ষনো যাব না। বয়ে গেছে। আমাদের বংশ ধরে গালি দিয়েছে, জামাই কর বলে দরখাস্ত নিয়ে দাঁড়াব সে-বাড়ি?

সুহাসিনী বলেন, সে তো সবাই বলত। লোকে ভিতরের ব্যাপার জানত না। একলা ওঁদের কি দোষ?

চিরকালের কলঙ্ক মুছে দিলেন বিশ্বেশ্বর সরকার। তার জন্ত কৃতজ্ঞতা নেই? মেয়ে বড় হয়ে পড়েছে—কন্যাদায়ে পড়ে মুখ ফুটে তাঁরা সাহায্য চাইলেন—

আবেগে কণ্ঠরোধ হয়। কথা থামিয়ে অরুণাক্ষ চুপ করে গেল।

সুহাসিনী বললেন, তা বেশ তো, সাহায্য করব আমরা। সাহায্য কত রকমের হতে পারে। কন্যাদায় বলে সেই মেয়ে আমাদেরই ঘরে নিয়ে আসতে হবে, এমন কি কথা আছে?

অরুণ রাগ করে বলে, তারা ভিক্ষে চায় না। তেমন পাত্রই নয়। দয়া দেখাতে গেলে, সে দান ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

যেতে হল প্রফুল দত্তর বাড়ি। অম্বুজাক্ষ কথা দিয়ে এসেছেন, গোড়া থেকে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে লাভ কি? মেয়ে দেখাই মানে বিয়ে নয়। শোভাকে আগেও দেখেছে, এবারে পাত্রীরূপে দেখছে। হে ভগবান, সেই মাস্টারনি ইরাবতী না এসে পড়ে এখন যেন। তবে তো রক্ষে নেই।

ও-বাড়ি থেকে সোজা সে পঞ্চাননের কাছে ছুটল। একমাত্র ভরসা যে এখন। মণিরামপুর যাওয়া এবং কদিনের মেলামেশায় দুজনের ভাবসাব হয়েছে।

তোমার তদ্বির-তাগাদায় কিছু হল না পঞ্চানন। অন্য মেয়ে দেখে এলাম। এখন কি করি, শিগগির উপায় বাতলাও।

সমস্ত শুনে পঞ্চানন গুম হয়ে ভাবল একটুখানি। বলে, ব্যাপার তো বোঝাই যাচ্ছে—পলিটিক্যাল বিয়ে। ঠেকানো মুশকিল, ইলেকশন ঘুকিয়ে আসছে কিনা!

অরুণাক্ষও বোঝে সেটা। কাতর অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। পঞ্চানন বলতে লাগল, বিশ্বেশ্বরবাবুর হাতের ঢিল ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে

গেছে। তাঁকে দিয়ে আর কিছু করবার নেই। প্রতুল দত্ত পক্ষে থাকলে অনেক সুবিধা। আধাআধি কেল্লা ফতে তাঁকে দিয়েই হবে। আচ্ছা, যাই তো সম্পাদকের কাছে। তিনি কি বলেন, শোনা যাক।

পঞ্চানন কৃতান্তর পরামর্শ নিতে গেল। কি কারণে বলা যায় না, স্ফূর্তিতে কৃতান্ত ডগমগ। এমন ইনিয়ে-বিনিয়ে বলছে, তবু তার ভাবান্তর নেই। পঞ্চানন রাগ করে বলে, হাসি দেখে গা জ্বলে যায়। কি করা যায়, ভেবেচিন্তে বলো সেইটে। ইরার মা'র কাছে আমি কি জবাব দেবো ভেবে পাইনে। ও-বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াই। অম্বুজ ডাক্তার মঙ্গলবারে মেয়ে দেখতে যাবেন বলেছেন। যান তো তাঁর সঙ্গেই যাব, তার আগে নয়।

কৃতান্ত বলে, ডাক্তার যাবে না। বুঝতে পার না, এর পরে কি করতে যাবে? আমি বলি কি—তুমিই সোজাসুজি ঢুকে পড়গে এবার। কন্যাদায় নিয়ে কথা। টোপর মাথায় চাপিয়ে নিজেই ছাতনাতলায় বসে পড়, পরের খোশামুদির গরজ কি?

পঞ্চানন বলে, তোমার ঠাট্টার কালাকাল নেই—

ঠাট্টা? চোখ বড় বড় করে কৃতান্ত বলে, ঠাট্টা করব, আমাদের দাদার ব্যাপার নিয়ে? টাকার লেনদেনের মাপে হাতের কলম সিধে-উল্টো করি বটে—কিন্তু বিশ্বাস করো বা না করো—ডান হাত ছাড়াও মন বলে এক পদার্থ আছে, সেখানে ভালবাসা আছে কৃতজ্ঞতা আছে। তোমায় চিনতে জানতে এতটুকু বাকি নেই, ইরাবতীকে তুমি অপছন্দ করো না। কপালের নিচে যার দুটো চোখ আছে, কেউ অপছন্দ করবে না ও-মেয়ে। তাই তো বলছি, সর্বাংশে তুমি উপযুক্ত পাত্র।

পঞ্চানন বলে, পাত্র উপযুক্ত, সন্দেহ কি? মেসের কটা টাকা মাসে মাসে শুধতে পারিনে। আর কাগজের যা অবস্থা—ওটা উঠে গেলে গেলে সোজা রাজপথে নেমে দাঁড়াব।

কাগজ খুব ভালো চলবে এবার থেকে। কাগজের জন্য ভাবনা নেই। নতুন মেশিন কেনা হবে, সাইজ মোটা হবে, ছবি যাবে সাত-আটখানা করে।

বল কি, গুপ্তধন পেয়ে গেলে কোথা?

কৃতান্ত হেসে বলে, ব্যাপার তাই। অম্বুজ ডাক্তার টাকা দেবে। যত টাকা দরকার, দেবে তাই।

পঞ্চানন বলল, এবারে তবে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে পড়লে? কথাবার্তা হয়ে গেছে তাঁর সঙ্গে? পাকাপাকি হয়েছে?

কথাবার্তার কিছু নেই। ড্রাফট পাচ্ছি একটা—হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাঙ্কের উপর যেমন ড্রাফট থাকে, ভাঙিয়ে নিলেই করকরে টাকা। তেমনি এক জিনিস আছে ডাক্তারবাবুর নামে। কটা দিন ঝামেলার মধ্যে আছি। তারপরে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। ড্রাফট ভাঙিয়ে নগদ টাকা নিয়ে আসব। যুগচক্রের শুধু নয়, সরকার মশায়ের মেয়ের বিয়ের পুরো টাকাও বের হয়ে আসবে। কটা দিন সবুর করো।

পঞ্চানন অবাক হয়ে তাকায়। কী মতলব কৃতান্তর মাথায় ঘুরছে, আন্দাজে আসে না। কেমন এক রহস্যময় ভাব। কৃতান্ত বলবেও না কাজ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত। সে তখন জোর দিয়ে বলে, টাকা আনো আর যাই করো সাফ জবাব দিয়ে দিচ্ছি আমায় কক্ষনো বর সাজতে বলবে না। অমন কথা মুখেও এনো না, বেকুব হবে। আমি সাহিত্য করব। টাকা হলে ঠিকমতো মাইনেটা দিও মাসে মাসে। সুস্থির হয়ে যাতে পড়তে লিখতে পারি।

আচ্ছা, টাকা তো আসুক হাতে। তুমি না রাজি থাক, ছেলেছোকরার দুর্ভিক্ষ হয় নি। টাকা মুঠো ভরে ডাক ছাড়লে কুকুর-বিড়ালের মতো কত বর এসে পড়বে।

কৃতান্ত হৈ-হৈ করে এসে পড়ল। যুগচক্রে লেখার অপ্রতুল হলে যেমন আসে। সরমা ইদানীং আর বিরূপ নন, সাড়া পেয়েই দরজা খুলে দেন।

দাদা কোথায় বউদি ?

যথারীতি দরজার অন্তরালে গিয়েছিলেন সরমা। মৃদুকণ্ঠে বললেন, আর কোথা ? যেখানে থাকেন দিবারাত্রি।

বলেই চলেছেন, কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে আছেন। সংসারের কোন-কিছু কানে নেবেন না। একটিমাত্র সন্তান—তার হিতাহিত ভেবে দেখবেন না একটিবার।

স্বর ভারী-ভারী। কৃতান্ত বলে, নতুন আবার কি হল বউদি ? এ তো বারমেসে কথা—

মেয়ের কথা ভেবে আমি চোখে অন্ধকার দেখি ঠাকুরপো। ও-মেয়ের বিয়ে হবে না—ট্যুইশানি করে চাকরি করে চিরকাল ওর এমনি যাবে।

কৃতান্ত হেসে উঠল, হ্যাঁ—চুল পেকেছে, দাঁত পড়ে গেছে, বুড়ো-থুথড়ে ও-মেয়ের বিয়ে হবে কেমন করে ? ঠিক বলেছেন আপনি—কক্ষনো বিয়ে হবে না।

আপনারা হাসেন। আমি কোন রকম উপায় ভেবে পাইনে। আজই সকালে এক জায়গা থেকে দেখতে আসবার কথা ছিল—

কৃতান্ত লুফে নিয়ে বলে, অম্বুজ ডাক্তারের আসবার কথা। আসেননি তিনি।

সরমা বলেন, আপনি তো জানেন ঠাকুরপো—

সমস্ত জানি। অম্বুজ ডাক্তার আসেনি, আসবেও না। প্রতুল দত্তর মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করছে। উঠে পড়ে লেগেছে। ইলেকশনে নেমেছে—বুঝতে পারলেন না, দত্তকে বেহাই করতে পারলে ঐখানেই অর্ধেক মেরে দিল। যা গতিক, লেগে যাবে। দত্তেরও খুব ইচ্ছে, শুনতে পেলাম।

ইরাবতীকে দেখা গেল। রান্নাঘর থেকে বালতি হাতে বারাণ্ডা মুছতে বেরিয়ে এলো। কথা সবই শুনেছে। কিন্তু মুখ দেখে তা বুঝবেন না। যেন অন্য কাদের কথা হচ্ছে, তার এ সম্পর্কে স্পৃহা নেই। কৃতান্ত তখন ভরসা দেওয়ার ভাবে আরও জোর দিয়ে বলে, মুশড়ে পড়েন কেন বউদি, এক দুয়োর বন্ধ তো শতেক দুয়োর খোলা। একা অম্বুজ ডাক্তারেরই ছেলে নাকি? অঢেল রয়েছে, কটা চাই—দর দিলে কতজনে মাথায় টোপর চড়িয়ে ছাদনাতলায় বসে যাবে। বরঞ্চ এ ভালোই। ও-ঘরে কুটুম্বিতে করে সুখ হত না। নামের কাঙাল, নামযশের জন্য সব করতে পারে অম্বুজ ডাক্তার। এই প্রতুল দত্তই কাশীশ্বরকে নিয়ে কত বলাবলি করত—সেই লোকের কাছে ছেলে পাঠিয়ে দিল, দেখে-শুনে বাজিয়ে নিয়ে যদি জামাই করে। দেখুন ভাই, আত্মসম্মান বলে ওদের কিছু নেই। যেমন বাপ, তেমনি বেটা। যুগচক্র কি শুধু শুধু গালিগালাজ করে?

আর দাঁড়াল না, সিঁড়ি বেয়ে বিশ্বেশ্বরের তপোবনে উঠে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে হাসতে হাসতে নামল। অর্থাৎ, পেয়ে গেছে। গালভরা হাসি দেখে বোঝা যাচ্ছে, পেয়েছে ভালোরকমই। যাবার সময় হাঁক দিয়ে বলে, কিছু ভাববেন না বউদি। ভালো ঘরে মেয়ে যাবে। খুঁজেপেতে এমন পাত্তোর আনব, অম্বুজ ডাক্তারের ছেলে তার গাড়ু-গামছা বওয়ার যুগ্যি নয়।

পরদিন ভোরবেলা কৃতান্ত হানা দিল অম্বুজাক্ষের বাড়ি। লোক জমেনি এখনো। বৈঠকখানায় চেপে বসে সে উপরে খবর পাঠিয়ে দিল। অম্বুজাক্ষ ওঠেন রাত থাকতে, অনেক কালের অভ্যাস। উঠে হাত-মুখ ধুয়ে চিঠি লিখছিলেন খানকয়েক। ইলেকশনের তোড়জোড়—এ ছাড়া ইদানীং অন্য কোন চিন্তা নেই। হেনকালে কৃতান্তর নাম এসে পৌঁছল। গোঁফের আড়ালে হাসি ফুটল তাঁর। মরশুম এসেছে, মধুলোভীরা অমনি ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। কী জাতীয় লোক, এতেই বোঝা যায়। যুগচক্রের পাতায় যে বিষ উদগীরণ করেছে, নিতান্ত চক্ষুলজ্জা-বিহীন বলেই তার পরে এ-বাড়ির দরজায় পা দেয়।

যা-ই হোক, অম্বুজাক্ষ এবারে সেয়ানা হয়েছেন—চটানো হবে না লোকটাকে। কাজ করিয়ে নিতে হবে। উপযাচক হয়ে এসেছে, পুরানো কথা তুলবেন না কোন-কিছু। চা ইত্যাদি দেবার কথা বলে দিলেন। বেশ ভারী রকমের হয় যেন। তারপর সহাস্য মুখে নিচে চললেন।

আছেন ভালো কৃতান্তবাবু? দেখাসাক্ষাৎ হয় না, আমিই যাবো-যাবো করছিলাম। যা কাণ্ড—অহরহ রোগির ভিড়। সকলের দায়ঝক্কি কুলিয়ে তারপরে সমাজ-সামাজিকতা বজায় রাখা আর হয়ে ওঠে না।

কৃতান্ত বলে, আমিও ভাবছিলাম তাই। সময় হয়ে এলো, এখনো দেখা নেই—যুগচক্রের কথা এ সময়টা ভুলে থাকবেন, সে হতে পারে না। মণিরামপুর থেকে দাঁড়াচ্ছেন বুঝি? তা ভালো—গাঁয়ের মানুষগুলো মোটের উপর সরল, শহরের মতন ফেরেব্বাজ নয়।

দু-পাটি দাঁত মেলে হাসতে হাসতে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাকে জড়িয়েই বলছি, আমিও বাদ নই। দেখুন, মানুষ আজকাল বাজে

ধাপ্পায় ভোলে না। টাকাপয়সা ছড়াচ্ছেন—হাত পেতে নিয়ে খুশিমুখে পকেট ভরতি করছে, চর্বচোষ্যের আয়োজন করেছেন—গাণ্ডেপিণ্ডে গিলছে আর বাহবা দিচ্ছে, বাপান্তপিতান্ত করে বলছে ভোটটা নিশ্চিত দেবে আপনাকে। কিন্তু মজার বস্তু ঐ ব্যালট-বাক্স। পরদার পিছনে গিয়ে কোন বাক্সে ভোটের কাগজ ঢোকাচ্ছে অন্তর্যামীর বাবাও তা ধরতে পারবেন না।

এ সত্য অম্বুজাক্ষের চেয়ে বেশি কে জানে? হাড়ে-হাড়ে বুঝেছেন। ভোটের পরেও তো যে-লোকের সঙ্গে দেখা হয়, ভূতনাথ গুঁইয়ের নামে নিন্দেমন্দ গালিগালাজ করে। অথচ যাবতীয় ভোট জমল গিয়ে ভূতনাথের বাক্সে, তাঁর বাক্স হা-হা করে।

কৃতান্ত ভরসা দিয়ে বলে, এবারে সে রকম হবে না—বাজার গরম আপনার। শহীদের বংশাবতংস হয়ে দাঁড়িয়েছেন। স্বাধীন-ভারতে এ বস্তুর বড় কদর। মণিরামপুর থেকে দাঁড়ালে আরও সেটা জোরদার হবে। এই নাম ভোট পর্যন্ত যদি টিকিয়ে রাখতে পারেন, তরতর করে বেরিয়ে যাবেন। উল্টোডাঙার সাধন মিস্তির নাকি উসখুস করছে। কোন চিন্তা নেই, কোন বেটা রুখতে পারবে না। প্রতুল দত্তর খোশামুদি না করেও তা হয়ে যাবে। বাপ-বাপ বলে নমিনেশন দেবে, না দিলে ওরাই নিন্দের ভাগী হবে। যুগচক্র জানেন তো সত্য বলতে পিছপাও হয় না—আমিই মুখোস খুলে দেবো ওদের।

এই কিছুদিন লোকজনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, এবং বিশেষ করে 'ভারতে ইংরাজ' হাতে পাবার পর অম্বুজাক্ষেরও সেইরকম আত্মবিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে। জয় নির্ঘাৎ। সুযোগ পেয়ে কৃতান্তকে দুটো কথা শোনাতে ছাড়েন না: সত্যের বড়াই করছেন, কই, সেবারে তো যাচ্ছেতাই করে লিখলেন। ইংরেজের খয়ের-খাঁ, হেনো-তেনো কত কি—

কৃতান্ত লজ্জা পায় না।

তখন যে তাই ছিলেন ডাক্তারবাবু। দেশসুদ্ধ মানুষ তাই জানত। বিশ্বেশ্বর দাদার কৃপায় পাশা উল্টে গেল। সত্যসন্ধ আমার কাগজ —আমিও উল্টো লিখব। না লিখে উপায় কি? কাশীশ্বরের সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে লিখেছিও অনেকটা। শুনবেন নাকি, এই শুনুন—

ফোলিওব্যাগ খুলে কান-কোঁড়া একতাড়া কাগজ বের করে। খানিকটা পড়ে অম্বুজাক্ষের হাতে দিল। তিনি উল্টেপাল্টে দেখেন। অসমাপ্ত—কিন্তু লিখেছে ভালো সত্যিই। অতি চমৎকার হবে। লিখতে জানে লোকটা, কলমের জোর আছে। কৃতান্তর হাতে লেখাটা ফিরিয়ে দিয়ে প্রসন্ন হাস্যে অম্বুজাক্ষ বললেন, খাসা হচ্ছে— শেষ করে ফেলুন।

কৃতান্ত মুখ শুকনো করে বলে, ইচ্ছে তো তাই। কিন্তু উৎসাহ চুপসে যাচ্ছে। করেই বা কি হবে, ছাপি কোথায়?

কেন, কেন? নিজের কাগজ রয়েছে আপনার, কাগজ নিয়ে জাঁক করছিলেন—

উৎসাহ ভরে বলে ফেলেই অম্বুজাক্ষ প্রমাদ গণেন। অবস্থা বোধগম্য হল। এমনি একটা প্রশ্ন আদায়ের জন্যই কৃতান্ত এই লেখা ফেঁদেছে, এতদূরে এই বাড়ি বয়ে এসেছে। ঠিক তাই।

কৃতান্ত বলে, কাগজের কী দশা দাঁড়িয়েছে, উল্টে-পাল্টে দেখেন কি আপনারা? দেখলে আর এমন কথা বলতেন না। ভাঙা টাইপ, নড়বড়ে মেশিন। টাইপের অর্ধেক তো ওঠেই না। যেটুকু উঠল, কালির ধ্যাবড়া—কোনটা কি হরফ ধরা যায় না। তা আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিন, আপনারই কাজে লাগবে। খেটেখুটে মনের মতন একটা লেখা দাঁড় করালাম, সাজিয়েগুছিয়ে সেইটে যাতে সকলের চোখে তুলে ধরতে পারি।

অর্থাৎ সাদা বাংলায়, টাকা ঢালো। যে বিয়ের যে মন্তোর—ইলেকশনে নেমেছ তো টাকার মায়া করতে গেলে হবে না। ধরে নাও, রেস খেলার মতন এক ব্যাপার। লেগে গেল তো খরচের বিশগুণ ঘরে উঠবে, না লাগল তো বরবাদ। কিন্তু কৃতান্তর ফরমাশ তো দু-একশর ব্যাপার নয়,—কতদূর তার মনের আঁচ, কিছু আন্দাজ হচ্ছে না। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কত লাগতে পারে? মানে এখন তো বুঝতেই পারছেন, নানান দিকে খরচখরচা—

কৃতান্ত সায় দিয়ে বলে, বটেই তো। বেশি এখন চাইতে যাব কোন বিবেচনায়? তালিতুলি-দেওয়া পুরানো মেশিন নিয়ে নেব আমি, দেখে এসেছি, দাম কিস্তিতে কিস্তিতে দিলে চলবে। মেশিন আর টাইপের দরুন সবসুদ্ধ হাজার দশেক দিন আমায়—ধার হিসাবে দিন। বাকিটা আমি যা হোক করে জোগাড় করব।

অম্বুজাক্ষ চমক খেলেন, কৃতান্তর দৃষ্টি এড়াল না। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলে, বেশি বলে ঠেকছে? হয়তো বা মনে করছেন যুগ-চক্রকে বাঁচিয়ে তুলে তেমন-কিছু লাভ হবে না। তা হলে চাই নে। অন্য লোক আছে—আপনার বাড়ি এসে আমি আজ্ঞে-আজ্ঞে করছি, তাদের উল্টো ব্যাপার—তারা আমাদের অফিসে ধন্না দিয়ে পড়ে আছে।

রাগ করে কৃতান্ত উঠে পড়ল তো অম্বুজাক্ষ হাতে ধরে বসালেন।

না না না, সে কি কথা। তবে কিনা, এখন নানান দায়ঝক্কি—এক সঙ্গে পেরে উঠছিনে। আপাতত যেমন চালাচ্ছেন, চলুক। ইলেকশনের পরে আমায় যা বলেন সমস্ত করব।

কৃতান্ত আবার বসেছে। বসে পড়ে সে হাসতে লাগল। এই মানুষটি এত রেগেছিল এখন কে বলবে?

ইলেকশনের জন্যেই তো দরকার ডাক্তারবাবু। পরে যখন কাজ থাকবে না, তখন এক ঢাউস প্রেস আর টাইপের গাদা নিয়ে কি করব? আর বলতে কি—হপ্তায় হপ্তায় যুগচক্রের খুনী ঋালিয়ে আসছি, মজুরের সময় এই রকম আপনাদের কাজে লাগতে পারব বলেই তো।

হেসে উঠে আবার বলল, ইলেকশন চুকে গেলে তখন আর কি মনে করতে পারবেন অধমের কথা? কেউ করে না, আপনিই বা করতে যাবেন কেন?

বোঝা যাচ্ছে, মুখের কথাবার্তায় নিরস্ত হবার মানুষ নয়। যতই কিছু বলুন, ঘুরে ফিরে এক জায়গায় আসছে। অসহায়ভাবে অম্বুজাক্ষ বললেন, আচ্ছা, দেখি একটু বিবেচনা করে। মানে, আর কিছু নয়—আর্থিক অবস্থাটা একবার ভেবেচিন্তে দেখা।

কৃতান্ত বলে, বেশ তো, করুন আপনি বিবেচনা। টাকাকড়ির ব্যাপার—লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখতে হবে বই কি। চার দিন পরে শনিবারে আমি আসব। এসে সমস্ত জেনে যাব।

লেখাটা ফোলিও-র খোপে পুরে ভিন্ন এক খোপ থেকে আর এক ফর্দ কাগজ বের করল।

এই দেখুন—লেখার উপসংহার যে রকম হবে, তা-ও বেঁধে ফেলেছি। কিস্তিতে কিস্তিতে ছাপব, শেষ কিস্তিটা ইলেকশনের আগে দেব না। আপনার অসুবিধা হবে, সেটা আমার মোটেই ইচ্ছা নয়।

বলে পরমোৎসাহে নিজেই খানিকটা পড়ে গেল—

কাশীশ্বর রায় অত্যন্ত চতুর বলিয়া তাঁহার ছদ্মরূপ দেশবাসী তখন ধরিতে পারে নাই। আসলে তিনি অতি ইতর, স্বদেশদ্রোহী, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতক—

কাগজটা টেনে নিয়ে আদ্যোপান্ত পড়ে অম্বুজাক্ষ মুখ-চোখ লাল করে বললেন, ডাহা মিথ্যে। কাশীশ্বর থেকে শুরু করে আমাদের বংশ ধরে আপনি কালি ছিটিয়েছেন। এই সমস্ত ছাপলে বিপদে পড়বেন—

কৃতান্ত নিশ্চিন্ত ভাবে বলে, তা পড়ব না—বড়-খুঁটোর জোর আছে। আজ না হোক, দু-পাঁচ মাস পরে ছাপা তো হবেই, লেখা আধখিচুড়ি করে রাখা যাবে না। তবে ইলেকশনের আগে ছাপতে চাইনে। তা হলে, ঐ যা বললাম, গো-হারা হেরে যাবেন, আপনার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে—

অম্বুজাক্ষ বাধা দিয়ে বলেন, খুঁটোটা কে বলুন তো? পাট আর গুড় বেচে সাধন মিস্তিরের বড় পয়সা হয়েছে! তা সে যা-ই হোক, বিশ্বেশ্বর সরকারের মতো পণ্ডিত মানুষ অত প্রমাণ-প্রয়োগ দিয়ে যা বলেছেন, তার উপরে এই সব লিখলে কোন রকমে নিষ্কৃতি পাবেন না। মানহানির দায়ে পড়বেন, সেইটে যেন খেয়াল থাকে।

কৃতান্ত কিছুমাত্র বিচলিত নয়। বলে, বেশ তো, শনিবারের দিন এসে যদি ফয়শালা না হয়, তখন হবে পরখ সেটার। লেখাটা রেখে যাচ্ছি—আমার কপি আছে। ইতিমধ্যে আপনি বরঞ্চ দু-এক জন উকিলের সঙ্গে মানহানির শলাপরামর্শ সেরে রাখুন। ইচ্ছে হলে বিশ্বেশ্বর-দাদার কাছেও গিয়ে দেখতে পারেন।

বলে নমস্কার করে হাসতে হাসতে সে বেরিয়ে গেল।

অম্বুজাক্ষ গুম হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। শয়তানটা গত বারের পন্থা নিয়েছে, টাকা না দিলে যুগচক্রে গালিগালাজ শুরু করবে। সেবারেও কাশীশ্বরকে নিয়ে লিখেছে। সেটা আলতো ভাবে—ইংরেজের কাছে

রায় বাহাদুর হওয়াটা তাঁর অপরাধ। আসল আক্রমণ ব্যক্তিগত তাঁকে অম্বুজাক্ষর উপরে—টাকার কুমির হচ্ছেন ডাক্তারি ব্যবসায়ে, তিলেক দয়াধর্ম নেই; যে তাঁর কাছে আসে সে রোগিমাত্র, মানুষ বলে তাকে বিবেচনা করেন না। সাধারণের সঙ্গে ক্ষীণতম যোগাযোগ নেই, সেই লোক যাবে করপোরেশনে দশের প্রতিনিধিত্ব করতে! অনেক রকম গল্পও ছেপেছিল তাঁর নামে। ভিজিট না দিতে পারায় পাড়ারই মধ্যে কোন বাড়ি তিনি গেলেন না, ফলে রোগি মারা পড়ল। আর কোথায় গিয়ে নাকি দেখলেন রোগি মারা গেছে, তা সত্ত্বেও যোল আনা ভিজিট গুণে নিয়ে নির্বিকার ভাবে চলে এলেন। নাম-ধাম-পরিচয়ও দিয়ে দিয়েছে। সেই সব কথা তখন খুব তিক্ত লাগত, ইলেকশনের ডামাডোল মিটে গেলে শান্ত চিত্তে পরে আগাগোড়া ভেবে দেখেছেন। বানানো গল্প বিস্তর; কিন্তু সত্যিও আছে দু-চারটে—বর্ণনা দিয়েছে অবশ্য বিস্তর ফলাও করে। আত্মজিজ্ঞাসা জাগল নিজের মনে, নতুন দিকে নজর পড়ল। স্তাবকেরা সামনে বসে যা বলে, তাই তো সবখানি নয়—আড়ালে ভিন্ন ধরনের বলবার মানুষও আছে, সেই সব খবর যুগচক্রে গিয়ে পৌঁচেছে। সেই থেকে অম্বুজাক্ষ অনেকখানি বদলেছেনও সত্যি—সকলের সঙ্গে সমান হয়ে এখনও মেলামেশা করতে চান। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে পড়ে থাকেন, এসেম্বলিতে দাঁড়াচ্ছেন পল্লী এলাকা থেকেই। মওকা বুঝে কৃতান্ত এগিয়ে এসেছে। এবারের গালিগালাজ তাঁর সম্পর্কে তেমন নয়, পূর্বপুরুষ কাশীশ্বরকে নিয়ে। মৃতের দোষ-অপরাধ মানুষে মার্জনা করে নেয়—আর এদের কাণ্ড দেখ, বন্ধুবৎসল সজ্জন দেশপ্রেমিককে নরকের কীট বলে চিত্রিত করবে, তারই পাঁয়তারা ভাঁজছে। প্রমাণ-প্রয়োগ জোটাতে লেগেছে এখন থেকেই। টানতেই হবে কাশীশ্বরকে।

কারণ, মণিরামপুর থেকে দাঁড়াচ্ছেন—ও-অঞ্চলে বেশি দিনের গতায়াত নয় বলে, অম্বুজ ডাক্তারের গুণপনা লোকে সামান্যই জানে। রামনিধির নাম পুরুষান্তর ধরে তারা বলাবলি করে, কাশীশ্বরকে রামনিধির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মহিমা এবারে ভাগাভাগি করে নেওয়া হচ্ছে। কাশী-শ্বরকেই অতএব ধরাশায়ী করবার ষড়যন্ত্র। ঝানু লোক, আসল জায়গায় ঠিক ঘা দিচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর সরকার ভরসা এখন। কৃতান্তকে ঠাণ্ডা করবার একমাত্র পাশুপত-অস্ত্র। কাশীশ্বর-সম্পর্কিত বিশ্বেশ্বরের লেখাগুলো অঞ্চলময় ভালো করে ছড়াতে হবে। ঘরে ঘরে ছেলেবুড়ো কাশীশ্বরের গল্প পড়বে, যেমন রামনিধির কথা চলে আসছে এ যাবৎ। কৃতান্তর মন-গড়া কথার তখন দাম হবে না।

এনগেজমেণ্ট-বই উল্টাচ্ছেন, কোন সময়টা ফাঁকা আছে আজকে। হ্যাঁ, আজকেই যাবেন বিশ্বেশ্বরের কাছে অন্য কাজকর্ম বন্ধ রেখে। কোমর বেঁধে লাগতে হবে কাশীশ্বরকে নিয়ে। তিলার্ধ আর গড়িমসি নয়।

অরুণাক্ষকে ডেকে পাঠালেন।

আজকাল গিয়ে থাক সরকার মশায়ের ওখানে?

হাঁ করে চেয়ে আছে দেখে বললেন, বিশ্বেশ্বর সরকারের কথা বলছি। ভাল আছেন তাঁরা সব? সেই যে একগাদা কাগজপত্র নিয়ে এলেন, নতুন-কিছু লেখাজোখা হল তার উপরে?

অরুণ বলে, আমি জানিনে—

কেন, জান না কেন তুমি? নতুন গবেষণার খবরাখবর নেবে না, তা হলে এম. এ.-তে ইতিহাস বেছে নিলে কেন?

ছেলের সঙ্গে সঙ্গে সুহাসিনী এসেছেন। তিনি বলে উঠলেন, কোন মুখ নিয়ে যায় সেখানে? মুখে বলে থাক, তারা পরম উপকারী।

একবার এমন ভাবে ডাকাডাকি করছেন, এক ঘণ্টার তরে যাচ্ছ না। বিয়েথাওয়া না-ই হোক, চোখের দেখাটা দেখে আসতে দোষ কি? কি মনে করছেন বলো দিকি তাঁরা?

অম্বুজাক্ষ বললেন, যাব আমি। পঞ্চানন ছোঁড়াটা আসছে না, ঠিকানাও জানা নেই—যাই কার সঙ্গে?

সে আর আসবে না, কম্পাউণ্ডার বাবুর কাছে বলে গেছে। যেদিন আসে, তোমার দেখা পায় না। কথা দিয়ে কথা রাখ না, বড্ড রাগ করে গেছে।

অম্বুজাক্ষও রেগে যান।

বড্ড কুলীন হয়েছে ওরা আজকাল। একবারের বেশি দু-বার আসতে হলে মান যায়। গ্রাহ্য করিনে। ওদের ছাড়াও যেতে পারব। ওদের বাদ দিয়েই জিতে যাবে, পাড়াগাঁয়ের মানুষ যুগচক্রে কি লিখল না লিখল ভারি তার তোয়াক্কা রাখে।

ছেলেকে বললেন, চলো, তুমি নিয়ে যাবে আমায় সরকার মশায়ের কাছে। গাড়ি বের করো।

—বারো—

আকাশের চাঁদ-সূর্য মাটির উপরে। গলিতে নেমে হাঁটতে হাঁটতে বিশ্বেশ্বরের দরজায়। সরমা যথারীতি দরজা খুলে দিলেন। অরুণাক্ষ বাপকে নিয়ে উপরে চলল। হাসিতে ডগমগ মুখ, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে সিঁড়ি দিয়ে। কি ভেবে একটুখানি সরে এসে ফিসফিসিয়ে সরমাকে পরিচয় ছিল : বাবা। আসবেন-আসবেন করছিলেন, পুরোপুরি মনস্থির করে মা'র সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিজে চলে এসেছেন। বাড়ি চিনিয়ে দিতে আমি সঙ্গে এসেছি।

আবার গিয়ে সে অম্বুজাক্ষের পিছন ধরল।

সরমার এখন মুশকিলটা বোঝ। মেয়ে এ সময়টা বাড়ি থাকে না, পড়াতে গেছে। একটা থলি নিয়ে যায় কাগজে জড়িয়ে—থলি ভরতি সওদা নিয়ে বাড়ি ফেরে। ঐ আর এক ভাবনা। আধ-ময়লা কাপড় পরনে, ঘামে নেয়ে উঠেছে, হাতে বাজার-থলি—কনে হেন-অবস্থায় অম্বুজ ডাক্তারের সামনে না পড়ে যায়। এক কাজ করতে হবে—কিশোরীবালা গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়াক। ইরার হাত থেকে বাজার-থলি নিয়ে নেবে সে : কুটুম্বরা উপরে রয়েছেন, শব্দসাড়া না করে চুপিসারে ঢুকে পড় দিদিমণি। তারপর কাপড়-চোপড় বদলে চুল বেঁধে একটু ঘসামাজা করে জানান দেওয়া হবে, দেখতে পার এবারে মেয়ে। ওদিকটা সামলানো যাবে এক রকম। কিন্তু এ-বাড়ির হালচাল সমস্ত জেনে অরুণাক্ষ কী করে বসল—বাপকে সরাসরি তপোবনের ঐ নোংরা কাগজের আণ্ডিলের মধ্যে নিয়ে তুলেছে, নিচের ঘরে বসাতে পারল না? তিন মাস ধরে তারিখের

পর তারিখ দিয়ে, এলেন না—হঠাৎ খবরবাদ নেই, ঝুপ করে আজ এসে উঠলেন। নতুন কুটুম্বর আদর-অভ্যর্থনার কি করা যায়? কলকাতা শহর—জলযোগের যা হোক ব্যবস্থা হবে। কিন্তু ঐ যে এক মানুষ, দুটো কথা গুছিয়ে বলতে পারেন না—আগে টের পেলে পঞ্চানন কৃতান্ত কিম্বা পাড়ার দু-একজনকে খবর দিয়ে আনা যেত। কি কথার উপর কি বলে বসেন, কিছু ঠিকঠিকানা নেই।

চুপচাপ ভাবনারও সময় নেই, তপোবনে ঢুকে পড়েছেন ওঁরা। কিশোরীবালাকে বললেন, ছুটে যা মিষ্টির দোকানে। যাবি আর আসবি। কুটুম্ব এসেছে। এর পরে আবার মেয়ে দেখানোর বন্দোবস্ত আছে।

মেঘলা দিন, হাওয়া দিচ্ছে। কি জানি কখন বাদল নামে, টুকরো কাগজ উড়েটুড়ে যায় কিনা—সাবধানী বিশ্বেশ্বর জানলাগুলো এঁটে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে আলো জ্বেলে কাজ করছেন। দরজা ঠেলে দু-দুটো মানুষ ঢুকল, তা-ও ভাল করে খেয়ালে এলো না। ঘাড় হেঁট করে কাজ করে যাচ্ছেন। নাকের উপর চশমা—তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে আছেন জীর্ণ একটুকরো কাগজের উপর। চশমার শক্তিতে কুলোচ্ছে না যেন, চশমা ফেলে অণুবীক্ষণ ধরতে পারলে সুবিধা হয়।

মুখ তুলে তারপরে ধমকে উঠলেন, কে? কারা?

চিনলেনই না হয়তো। তাহলে এমন হুঙ্কার দেবেন কেন? বললেন, কি চাই এখানে? নিচে যান, নিচে নেমে গিয়ে বসুন। কাজের সময় গণ্ডগোল করবেন না, ঘর ছেড়ে নিচে চলে যান।

ভাব দেখে অম্বুজাক্ষ হাসেন। বললেন, আপনার সাধনপীঠ দেখতে এলাম ভায়া। নিচে গেলে তো হবে না। এরই মধ্যে কোন একখানে বসে যাব একটু।

বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিশ্বেশ্বরের বিছানার প্রান্তে কাগজপত্র ঠেলে দিয়ে বসে পড়লেন।

সরমা মনের উদ্বেগে সিঁড়ির খানিকটা অবধি উঠে এসেছিলেন। সেখান থেকে গর্জাচ্ছেন: এই দেখ—যা ভেবেছি ঠিক তাই। পাত্র-পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তার রকম শোন। সমস্ত দেবতার উদ্দেশে বারম্বার মাথা খুঁড়ছেন, ওঁরা বিরক্ত না হন, দেখো ঠাকুর। রাগ করে ফিরে না যান। ও-মানুষ নিতান্ত অবোধ, সংসারের কিছু জানেন না। মানিয়ে-গুছিয়ে সমস্ত বুঝসমঝ করে দিও ঠাকুর।

অম্বুজাক্ষ ওদিকে বিছানাটা একটু ঠেলে দিয়ে মাদুরের উপর চেপে বসে চতুর্দিক চেয়ে চেয়ে মুগ্ধকণ্ঠে তারিপ করছেন: বাঃ, বাঃ, বই-কাগজপত্র ছড়িয়ে নৈমিষারণ্য বানিয়ে নিয়েছেন। অরুণ বলছিল, ঘরের নাম তপোবন। তপস্যার জায়গাই বটে। শহরের মাঝখানে এমন একটা শান্তির জায়গা ভাবতে পারা যায় না। কেন যে অরুণ পাগল হয়ে এ-বাড়ি ছোটে, শতকণ্ঠে আপনার নাম করে, এখন বুঝতে পারছি ভাই।

এখন আর বিশ্বেশ্বরের না চেনার কথা নয়। চিনে ফেলে তটস্থ হয়ে উঠেছেন। আহা, এটা কি হল? ঐখানে কাগজপত্রের মধ্যে বসে গেলেন যে! ওরে কিশোরীবালা, গেলি কোথা তোরা? এত বড় মানুষটি মাদুরের উপর বসে পড়লেন—

অম্বুজাক্ষ বাধা দিয়ে বললেন, অমন পর ভাবছেন কেন বলুন তো আমায়? রামনিধি আর কাশীশ্বর—সে আমলের দুই দিক্‌পাল—তাঁদের দেহ দুটোই শুধু আলাদা ছিল, প্রাণ একটা—

বিশ্বেশ্বর সবেগে ঘাড় নাড়েন, উঁহু, ভুল বলছেন—তা হবে কেন? ওকি, ওকি?

ভূমিকা ফেঁদে নিয়ে অম্বুজাক্ষ ওরই ফাঁকে চুরুট মুখে পুরেছিলেন। দেশলাই ধরাতে যাচ্ছেন, ভয়-ব্যাকুল বিশ্বেশ্বর আর্তনাদ করে উঠলেন,

ওকি, ওকি ? বাইরে যান আপনি। বারাণ্ডায় চেয়ার আনিয়ে দিচ্ছি। এত কাগজপত্তোর—একটা ফুলকি যদি পড়ে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এই থাকল ভায়া। ব্যস্ত হবেন না। বিদঘুটে এক নেশা—স্থান-কালের বাছবিচার থাকে না। ভুলে যাই।

চুরুট অম্বুজাক্ষ পকেটে পুরে ফেললেন। খুব হাসছেন, রাগ করেন নি। বলেন, বাইরে গিয়ে ঘটকর্পূর হলে যদি চলত, এত কাজকর্মের ভিতর নিজে তবে ছুটে আসতাম না। কতদিন থেকে আসব-আসব করছি। 'ভারতে ইংরাজ' পড়বার পর থেকে বড় লোভ এই জায়গায় আসবার। অর্থাৎ গঙ্গার জল পান করলাম, সেই জল যে গোমুখী থেকে আসে সেটা দেখবার বাসনা।

বলে তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে তারপর বললেন, সেই যে এক গাদা কাগজ বয়ে নিয়ে এলেন, কিছু কাজ হল তা দিয়ে ?

কাজ হবে না মানে ? হাতে ছুঁয়েই বলতে পারি কোন জিনিসের কি দাম। যত্ন করে নিয়ে এলাম সেইজন্যে। দিনরাত্রি এই দেখুন আপনার সেই কাগজপত্রের মধ্যে মজে আছি।

বলতে বলতে গদগদ হয়ে উঠলেন : অশেষ অনুগ্রহ আপনার। যা দিয়েছেন, হীরের ওজনে তার দাম হয়। বিস্তর নতুন নতুন কথা জানা যাচ্ছে। ইতিহাস কী বস্তু তাই দেখুন। কাশীশ্বর রায়ের চিঠি-চাপাটি এমন কি সংসারের জমাখরচের ভিতর থেকেও টুঁটি টিপে খবর বের করে আনছি। হাঁদারামেরা ইতিহাস ঘাঁটতে আসে। তৈরি-রুটি ফয়তা দিতে পারে তারা শুধু। ইতিহাস যে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে নানান দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, সে সব খুঁটে তোলবার তাগত নেই।

অম্বুজাক্ষ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, কাশীশ্বরের সম্বন্ধে নতুন আর কিছু পেলেন ?

পাই নি আবার। যত পাচ্ছি, আমার তাক লেগে যাচ্ছে। এখন দেখছি, পুরানো 'ভারতে-ইংরাজ' লোকের কাছে হাজির করাই মুশকিল। অন্তত পক্ষে নতুন এক পরিশিষ্ট জুড়ে না দিলে কিছুতে চলবে না। সেইটেই তৈরি করছি। বেশি নয়, শ দেড়েক পাতার মতো হবে। সেটা না থাকলে মানুষ উল্টো রকম বুঝে বসে থাকবে।

অম্বুজাক্ষ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, পরিশিষ্ট ছাপানোর খরচ কিন্তু আমার। লিখবার শক্তি তো নেই, কয়েকটা টাকা খরচ করে পুণ্যকর্মে একটু ভাগ নেওয়া। তা কাপি পুরোপুরি তৈরি থাকে তো এক্ষুণি প্রেসে পাঠিয়ে দিন। মাসখানেকের মধ্যে যাতে বেরিয়ে যায়।

একটু হেসে বলেন, একটু কাজেও লাগাতে পারব। খুলেই বলছি, ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছি। দাঁড়াব মণিরামপুর থেকে। তাড়াতাড়ি করুন, চট করে বইটা বের করে যাতে লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। বড্ড কাজ হবে।

বিশ্বেশ্বর আনন্দে দিশা করতে পারেন না, হেঁ-হেঁ করছেন। কিশোরীবালা ঘরে ঢুকে চাপা গলায় কি বলছে অরুণাক্ষকে। অম্বুজাক্ষ হেসে বলেন, বুঝেছি—বুঝতে পেরেছি। না খেয়ে নড়ছিনে আমরা। তোমার মা'কে বলো চায়ের জল চাপিয়ে দিতে। মিষ্টি একদম চলবে না, চায়েও চিনি নয়। চিনির একটু ছোটখাট ফ্যাক্টরি আছে কিনা দেহের মধ্যে! মিষ্টি বাদ দিয়ে আর যাতে তিনি খুশি হন তাই সমস্ত দিতে বলোগে। এ তো নিজেরই বাড়িঘর এক হিসাবে। আজকের সম্পর্ক নয়, প্রথম যখন রামনিধি আর কাশীশ্বর দুই বন্ধু এক অঞ্চলে গিয়ে বসতি করলেন। আপনার বর্ণনাটা ভারি চমৎকার হয়েছে সরকার মশায়। এক ধ্যান এক জ্ঞান—দেহটাই কেবলমাত্র

পৃথক—। সমস্ত মনে নেই আমার, অমন ঝঙ্কার-অলঙ্কার মনে রাখা সোজা নয়। কিন্তু খাসা হয়েছে।

লেখার প্রশংসায় অন্য সময়ের মতো বিশ্বেশ্বর খুশি তো হলেন না, না-না করে উঠলেন: ভুল, বিলকুল মিথ্যে। রামনিধি ভাবতেন বটে তাই, কিন্তু কাশীশ্বর বরাবর তাঁর সঙ্গে ছলনা করে এসেছেন। ঐ ছলনা রামনিধি সত্যি বলে ধরে নিয়েছিলেন। সেই ভুল আমিও বইয়ে ছেপে দিয়েছি।

বাপ-ছেলেয় সবিস্ময়ে ঘাড় তুলে ঐতিহাসিকের দিকে তাকান। হেসে ঘাড় দুলিয়ে বিশ্বেশ্বর বলতে লাগলেন, ইতিহাস কি বস্তু তবেই বুঝে দেখুন। পাঁচ বছর সর্বস্ব ছেড়েছুড়ে এই কর্মে লেগেছি। সারা দিন এই ভাবনা-চিন্তা—রাতের বেলা যেটুকু সময় চোখ বুঁজি, তারও মধ্যে এই সব স্বপ্ন দেখি। পাঁচ-পাঁচটা বছরের খাটনি তিন মাসের মধ্যে একেবারে উলটে-পালটে গেল। এই তো মজা ইতিহাসের। আগের লেখার কোন দাম রইল না। বিশেষ করে কাশীশ্বরকে নিয়ে যত-কিছু লিখেছি।

অমুজাক্ষের এই দিক দিয়ে একেবারে যে সন্দেহ হয় নি, এমন নয়। কৃতান্তের খোঁটাটি তবে বিশ্বেশ্বর সরকার। অরুণের মুখ শুকনো, কোন কিছু যেন তার মাথায় ঢুকছে না।

বলছেন কি মেসোমশায়?

তাই দেখ বাবা, আমার এতকালের পরিশ্রম সমস্ত পণ্ড। ঘটনা, আর রামনিধির নামে কাশীশ্বরের কখানা চিঠি—তাই থেকে ধরে নিলাম রামনিধির পরম বন্ধু কাশীশ্বর। ফাঁসির সময় অবধি রামনিধিও তাই জেনে গেলেন। বইতেও সেই সব লিখেছি। ভুল। আসলে নীলকর সাহেবদের চর তিনি। চাষাভুষোদের কাছে রামনিধি দেবতা-গোঁসাই ছিলেন, গাঁ-অঞ্চলে থাকলে তাঁকে কেউ ধরতে পারত না।

কাশীশ্বর বন্ধু সেজে তাঁকে কলকাতায় নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে চক্রান্ত করে ধরিয়ে দিলেন। বিস্তর টাকা খেয়েছিলেন এই বাবদে।

অমুজাক্ষ বললেন, আপনি লিখছেন এই কথা?

বিশ্বেশ্বর বললেন, আমায় কিছু বানিয়ে লিখতে হয় নি। সাহেবদের চিঠিপত্র রয়েছে—পাটোয়ারি কাশীশ্বর যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন, কাজ হাসিল করিয়ে নিয়ে তারা শেষটা কলা না দেখায়।

অরুণ প্রতিবাদ করে, হতে পারে না মেসোমশাই। কাশীশ্বর ভালো লোক।

বিশ্বেশ্বর সহজ ভাবে বলেন, অসম্ভব নয়। কিন্তু যতক্ষণ আবার উল্টো কিছু না পাচ্ছি, আমাকে এই লিখে যেতে হবে বাবা। তুমি ইতিহাসের মানুষ, তোমায় আর কি বোঝাব।

অমুজাক্ষ বলেন, দেখুন—নিজে চলে এসেছি আপনার কাছে। কাগজপত্র আমিই তো সরবরাহ করেছিলাম—

বিশ্বেশ্বর গভীর কণ্ঠে বলেন, বিদ্যোৎসাহী আপনি—অতিশয় মহানুভব। কাগজপত্র দিলেন, আর কী সমাদরটাই করলেন বাড়িতে নিয়ে। সে আমি কোন দিন ভুলব না।

কঠিন কণ্ঠে অমুজাক্ষ বললেন, এই তার প্রতিদান বটে। কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দিচ্ছেন, লোকের কাছে মুখ দেখাবার উপায় রাখবেন না।

বিশ্বেশ্বর মরমে মরে গেলেন: আমি কি করলাম, আলাদা কিছু করবার এক্তিয়ার আছে আমার? কাগজপত্র পড়ে দেখুন, তারপর আপনার হাতে কলম গুঁজে দিলে আপনিও ঠিক এই লিখবেন।

অরুণ অনুনয় করে বলে, 'ভারতে ইংরাজ'-এ যা লিখেছেন, সেই অবধি থাকুক মেসোমশায়। মনে করুন, পরের কাগজ কিছু

আপনি পান নি। আমাদের বাড়ি থেকে কত কাগজ নষ্ট হয়ে গেছে, এ-ও ধরে নিন তাই।

বিশ্বেশ্বর বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন এক মুহূর্ত। ক্ষীণ স্বরে বললেন, তুমি এ কথা বলছ বাবা, ইতিহাসের ছাত্র হয়ে বলছ? জানতে পারতাম না—সে এক রকম। কিন্তু জেনেশুনে সত্য গুম করে ফেলব—সেটা কেমন করে হয়।

অম্বুজাক্ষ ধৈর্য হারিয়ে বললেন, হতেই হবে। হবে এই জন্ত যে আপনার কন্তাদায়। আমার ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে। আমি আজকে পাকাপাকি করে যাব বলে এসেছি। আপনার মেয়ের শ্বশুরকুল অসম্মানিত হবে, এটা নিশ্চয় চান না আপনি।

বিশ্বেশ্বর তটস্থ হয়ে বলেন, সে কি কথা। নিশ্চয় নয়, কখনো নয়।

অম্বুজাক্ষ বলতে লাগলেন, অজানা অচেনা সেকেলে কটা মরা-মানুষের চেয়ে মেয়ে নিশ্চয় বেশি আপন। মেয়ের প্রতি আপনার কর্তব্য আছে। যা-কিছু লিখেছেন, ছিঁড়ে ফেলে দিন। পচা কাগজপত্র যা নিয়ে এসেছেন, দেশলাই জ্বেলে পোড়ান। আপনার মায়া লাগে তো আমায় দিন।

বিশ্বেশ্বর ব্যাকুল ভাবে কাগজপত্র আগলে বসেন। ঝুঁকে পড়েছেন, কাগজে বুকে চেপে শুয়ে পড়েন আর কি! এখনই যেন অম্বুজাক্ষ ডাকাতি করে নিয়ে নিচ্ছেন। ভাব দেখে হাসি পায়, রাগে গা জ্বালা করে। বিরক্ত অম্বুজাক্ষ উঠে দাঁড়ালেন।

আচ্ছা, ভাবুন আপনি ছুটো-পাঁচটা দিন। মত বদলালে খবর পাঠাবেন। এই মাসের কটা দিন চুপচাপ থাকব। তার পরে সকল সম্বন্ধ শেষ আপনাদের সঙ্গে।

নেমে গেলেন। আসন পাতা বারাণ্ডায়। সরমা দাঁড়িয়েছিলেন, অম্বুজাক্ষকে দেখে ঘোমটা টেনে দিলেন একটু। অম্বুজাক্ষও দাঁড়ালেন

একটু। বললেন, মন বড্ড বিচলিত। খেতে বসবার অবস্থা নেই, ক্ষমা করবেন। বেয়ান বলে ডেকে যাব, সেই আশা নিয়েই এসেছিলাম। বাধা পড়ে যাচ্ছে। সুরাহা যদি হয়ে যায়, আপনার মেয়েকে ঘরের লক্ষ্মী করে নিতে পারি—সেই তখন আমোদ-স্ফূর্তি করে খেয়ে যাব।

সরমা লজ্জা করে থাকতে পারেন না। মৃদুস্বরে অরুণাক্ষকে ডাকলেন, হল কি বাবা

অরুণাক্ষ বলে, মেসোমশায় কি জেদ ধরেছেন, তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন। নতুন যা লিখেছেন, কিছু বাদ-সাদ দিয়ে মোলায়েম ভাবেও তো লেখা যায়। পুরোপুরি মিথ্যে হয় না, অথচ সকল দিক বজায় থাকে। ওঁকে বলবেন একটু আপনি।

সরমা অগ্নিমূর্তি হয়ে তপোবন-ঘরে গিয়ে পড়লেন: কি সব ছাইভস্ম লিখেছ নাকি ?

এমন কথায় বিশ্বেশ্বর রেহাই করেন না—তা তিনি যত বড় ব্যক্তিই হোন। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন: ছাইভস্ম লিখি আমি ? তুমি বলছ—কিন্তু একটু যার বুঝসমঝ আছে, সে এমন কথা উচ্চারণ করবে না।

অরুণদের বংশের উপর কালি ছিটিয়েছ তুমি—

বিশ্বেশ্বর বলেন, আমি কিছু করি নি। যা করবার, কাশীশ্বর রায়ই করে গেছেন। অভিনয় করেছেন সারা জীবন, মানুষকে ধাপ্পা দিয়েছেন। পড়ে দেখতে পার খানিক, এর মধ্যে একটা কথাও আন্দাজি লেখা নয়—

হাতের লেখা কখানা ফর্দ সরমার হাতে দিলেন। কয়েক ছত্র পড়ে সরমা কুচি কুচি করে ছিঁড়লেন। বিশ্বেশ্বর হাঁ-হাঁ করে ওঠেন,

এটা কি হল বড়বউ? ছিঁড়ে ফেললে কি সত্য উড়ে যাবে। এত সব প্রমাণ-প্রয়োগ রয়েছে—আমারই শুধু ডবল খাটুনি।

এ পাগল মানুষের সঙ্গে এমন ভাবে হবে না—সরমার চেয়ে কে বেশি জানে? ফল এই হল, ছেঁড়া-অংশ নতুন করে লিখতে বসে যাবেন এখন—একটা শব্দেরও যাতে হেরফের না হয়। শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাথা খুঁড়ে মরলেও ওঠানো যাবে না; নাওয়া-খাওয়া আজ সন্ধ্যাবেলা।

কাতর হয়ে তখন বলছেন, চোখ নেই তোমার, দেখতে পাও না কি হাল করেছ সংসারের? চাকরি ছেড়ে দিয়ে বসে আছ, মেয়েটা ট্যুইশানি করে নানান ধান্দায় সংসার চালায়—

মেয়ের কথায় বিশ্বেশ্বরের কণ্ঠ মুহূর্তে আর-এক রকম হয়ে যায়। ঘাড় নেড়ে বললেন, সত্যি, বড় গুণের মেয়ে ইরাবতী। ও আমার ছেলে। ও না থাকলে কিছুই হত না, কেরানি হয়ে চিরকাল কলম ঘষে যেতে হত।

সেই মেয়ের সর্বনাশ করছ তুমি বাপ হয়ে। ছেলের বাপ আজ পাকা কথা বলতে এসেছিলেন, বাপ হয়ে তুমি দুয়োর থেকে ফিরিয়ে দিলে।

সরমার দু-চোখে অশ্রু টলটল করে। বলেন, দেখ, জীবনে আমি তোমার কাছে কিছু চাই নি। বলো, কখনো কোন বয়সে চেয়েছি কিনা কিছু—

বিশ্বেশ্বর গাঢ় স্বরে বললেন, আমি যে বড্ড গরিব। শখের জিনিস কি দেবো—শুধু খাওয়াপরা জোটাতেই দেহের কালঘাম ঝরেছে।

আজকে ঐ মেয়ের মুখ চেয়ে চাইছি তোমার কাছে এই জিনিসটা। তিন সন্তান গিয়ে, আমার ইরাবতী—তোমার একটুকু লেখার জন্য তার সুখশান্তি হবে না—তোমার হাত ধরে বলছি, তোমার পায়ে পড়ি আমি—

সরমা সত্যি সত্যি উপুড় হয়ে পড়লেন বিশ্বেশ্বরের পায়ে। কি করবেন বিশ্বেশ্বর ভেবে পান না। আহা-হা, পাগল হলে বড়বউ? ওঠো, ঠাণ্ডা হও। মেয়ে তো একলা তোমারই নয়! এমন সম্বন্ধ বেহাত হয়ে যাচ্ছে, উপায় একটা ভাবতে হবে বই কি!

সরমা চোখ মুছে বললেন, কথাগুলো অন্য ভাবে ঘুরিয়ে লিখে দাও। অরুণও তাই বলে গেল। লেখো এমন ভাবে—যাতে সাপ না মরে লাঠিও না ভাঙে।

বিশ্বেশ্বর দোমনা হয়ে বললেন, কিছু করতে হবে বই কি! করতেই হবে মেয়ের জন্য। দেখি আরও ঘাঁটাঘাঁটি করে, নতুন জিনিস কিছু যদি পাওয়া যায়।

অধীর কণ্ঠে সরমা বললেন, নতুন জিনিস এই হল যে ইরার বিয়ে অরুণাক্ষর সঙ্গে। কি লিখবে তুমি জান, কিন্তু লিখতে হবে নতুন করে।

আচ্ছা আচ্ছা—বলে সায় দিয়ে বিশ্বেশ্বর ভাবতে লাগলেন।

ভেবে ভেবে থই পাওয়া যায় না। ভগবান, দাও কিছু আবার নতুন তথ্য। কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে ধরো একটুকরা কাগজ বেরিয়ে পড়ল, যার বলে নিঃসংশয়ে বুঝে যাচ্ছি টমাস-কুঠিয়ালের ঐ চিঠিগুলো জাল। এমন তো আকচার হচ্ছে ইতিহাসের ব্যাপারে। কাশীশ্বর কলঙ্কমুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসুন। 'ভারতে ইংরাজ'-এর পরিশিষ্টে বিশ্বেশ্বর সেই খবর জাহির করে দেবেন—দেখ, এমন কৌশলী নীলকররা—কাশীশ্বর হেন মানুষকেও ভণ্ড বানাতে চেয়েছিল···

স্তূপাকার কাগজপত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে বিশ্বেশ্বর ভাবছেন, আহা, তাই যদি ঘটে সত্যি সত্যি, বেরিয়ে পড়ে এমন-কিছু ঐ গন্ধমাদনের অন্ধিসন্ধি থেকে

অরুণাক্ষ আকাশ-পাতাল ভাবছে বাড়িতে বসে। বিশ্বেশ্বরের কাছে যাতায়াত কম দিন হল না—তাঁকে জানে ভালো রকমই। সৃষ্টিছাড়া মানুষ—ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না, সংসারের ক্ষতি-দুঃখ টলাতে পারে না এ মানুষকে। আদর্শের জন্ত হাসতে হাসতে যে-সব বঙ্গবাসী ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছিল, ইনিও ঠিক সেই জাতের।

অতএব আর কোন উপায় হতে পারে? ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে, এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারে না। হেঁটে হেঁটে আবার চলল বিশ্বেশ্বরের বাড়ি।

ভেবেছিল সরমাকে একলা পাবে। সারাদিনের বৃত্তান্ত শুনবে, উপায় চিন্তা করা যাবে। কিন্তু তিনি নন—যে-মানুষটিকে পাওয়া গেল, সে হল ইরা।

বাবা তো নেই এখন। অনর্থক এলেন।

অরুণাক্ষ বলে, লাইব্রেরিতে আছেন—সে তো জানিই। কিন্তু একেবারে অনর্থক হবে কেন?

একটু হেসে বলে, এসেছি যখন, সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল—কিছু গালিগালাজ খেয়ে যাই।

মুখ শুকনো করে ইরা বলে, সত্যি, আমি বড় কুঁদুলে। নিজেই তা বুঝতে পারি। স্বভাব কি করে শোধরাব জানিনে। দুনিয়ার কেউ দেখতে পারে না এইজন্তে।

দেখতে পারে না আবার! কোঁদল করেই তো ভালোবাসা কেড়ে নেন—

ফস করে মুখ দিয়ে বেড়িয়ে পড়ল কথাটা। বলে ফেলে সভয়ে তাকায়। এই রে:, দাবানল ও জলোচ্ছ্বাসে সৃষ্টি তোলপাড় হয় বুঝি। কিন্তু না, কিছুই হল না। বাড়ি ফিরে এসে আত্তোপান্ত নিশ্চয় শুনেছে ইরাবতী। তা সত্ত্বেও দেবীর মেজাজ অবিশ্বাস্ত রকম ভালো।

সাহস পেয়ে অরুণাক্ষ শুরু করে, আপনি শুনেছেন বোধ হয়—

শুনেছি অনেক কিছু। কোনটা বলছেন, ধরতে পারছিনে তো।

গাঢ়স্বরে অরুণাক্ষ বলে, মনে মনে কতদিন ধরে আমি এক স্বপ্ন লালন করছি ?

ইরা ফিক করে হেসে ফেলে : কত কথাই শুনলাম, এটা কেউ বলল না তো !

বাইরের লোকের বলবার কথা নয়। একদিন আমি নিজে বলব—সেই পরম ক্ষণের আশায় গোপন রেখেছিলাম।

কি হল ইরাবতীর—আর সে কৌতুক করে না, রাগও নেই। চোখ দুটো তুলে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল অরুণের দিকে। আচ্ছন্নতাবে অরুণ দাঁড়িয়ে আছে। খানিক পরে যেন তন্দ্রা ভেঙে জেগে উঠল।

আপনি যদি একটু বলে দেন—

নিরীহ নির্বোধের ভাবে ইরা বলে, কাকে কি বলতে হবে ?

বলবেন মেসোমশাইকে। যে রকম বললে ভালো হয়, তাই বলবেন। আমি কী বুঝি, কী আপনাকে বোঝাতে যাবো ?

চলে যায় অরুণাক্ষ। মন তার ভরে গেছে।

ইরা বলে, মা আছেন উপরে—

থাক, আজকে থাক। কাউকে আর কিছু বলবার নেই। সমস্ত আমার বলা হয়ে গেছে।

হেঁটে যাচ্ছে না, পাখনা মেলে উঠে চলেছে সে এবার। মাটির উপরে পা নেই।

বিশ্বেশ্বর কলম ধরেছেন। বদলাবেনই। সরমা কিছু অন্যায় বলেন না, কান্না তাঁর অকারণ নয়। অমন করে বলতেই বা হবে কেন? তিনি ইরাবতীর মা—বিশ্বেশ্বরও তেমনি বাবা তো বটে। বাপের দায়দায়িত্ব নেই মেয়ের উপর?

মরীয়া হয়ে কলম ধরে বসেছেন। অশ্বত্থামা হত ইতি গজ—গোছের ব্যাপার করে ছেড়ে দিতে হবে। সাপ না মরে, লাঠিও না ভাঙে। অরুণাক্ষ ছেলেটা বড্ড ভালো—আহা, হয়ে যাক বিয়েথাওয়া, সুখেস্বচ্ছন্দে থাকুক ওরা। ইতিহাসে মিছে কথা লেখা যায় না, যতদূর পারা যায় চেপে যাবেন। একটু-আধটু ঘুরিয়ে লিখবেন। তাই থেকেও যদি বুঝে নেয়, তেমন বুদ্ধিমানের সঙ্গে অবশ্য পারা যাবে না।

লিখছি, লিখছি—ভাবনা কোরো না বড়বউ। বদলে দিচ্ছি যত দূর পারা যায়।

> …কাশীশ্বর রায় আসলে নীলকর টমাসের চর। তাঁহার নিকট হইতে বহু অর্থ উৎকোচ লইয়া কাশীশ্বর রামনিধিকে ধরাইয়া দেন। রামনিধি তিলমাত্র সন্দেহ করেন নাই; বন্ধুর নিমন্ত্রণ পাইয়া সরল বিশ্বাসে তাঁহার কলিকাতার বাড়ি গিয়া উঠিলেন…

টমাস সাহেবের লেখা চিঠি পাওয়া যাচ্ছে—টাকা-পয়সা নিয়ে দরাদরি হচ্ছিল কাশীশ্বরের সঙ্গে, অবশেষে একটা ফয়সালা হয়ে গেল। তার উপরে টমাস প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, কুঠির উকিল করা

হবে কাশীশ্বরকে। দাদন হিসাবে অর্ধেক টাকা কাশীশ্বরের হাতে এসে গেছে, তারও প্রমাণ পাচ্ছি পুরানো জমাখরচে। পাটোয়ারি মানুষ কাশীশ্বর—দলিলস্বরূপ সমস্ত চিঠিপত্র যত্ন করে রেখে দিয়েছেন, এক টুকরো বেহাত হতে দেন নি। সাহেবদের ভাল রকম জানতেন কিনা তিনি—কাজ হাসিল করার পর ক্লাইভ উমিচাঁদের সঙ্গে যেমনটি করেছিল। সেইজন্যে সামাল-সামাল। আর এখন সেই সব কাগজ তাঁর বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাবছেন বিশ্বেশ্বর। উৎকোচ শুনতে বড্ড খারাপ, সে জায়গায় 'বহু অর্থের বিনিময়ে কাশীশ্বর রামনিধিকে ধরাইয়া দেন'। আর 'চর' কথাটাও তুলে দেওয়া যেতে পারে স্বচ্ছন্দে।...

সারা দুপুর ধরে পাতা ছয়েক এমনি কাটকুট হল। ফূর্তির চোটে হাঁকডাক করে সরমাকে নিয়ে এলেন। এবারে শোন বড়বউ, দিয়েছি ওলটপালট করে। 'চর' কথাটা কেটেই দিলাম। কি দরকার? তেমন বিশেষ প্রমাণও নেই যে কাশীশ্বর চরবৃত্তি করতেন। টাকার বিনিময়ে রামনিধিকে ধরিয়ে দিলেন—সে ঐ একবারেরই লেনদেন। চর বলতে বোঝায় যেন চিরদিন ধরে এই ধরনের কাজ করে আসছেন। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? অতএব স্বচ্ছন্দে ও-কথাটা বাদ দিতে পারি। কি বলো, ঠিক হচ্ছে না?

সরমা কাগজখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলেন।

কি, ও কি হল? কতকষ্টে কাটকুট করলাম—

ভেবে ভেবে আধখানা কথা বদলাচ্ছ, কেউ পড়ে না তোমার ছাইপাঁশ। পড়লেও এত খুঁটিয়ে পড়ে না। আগুনে পোড়াব সমস্ত। পুড়িয়ে সংসারের আপদ শান্তি করব।

খর-খর করে তিনি চলে গেলেন। অর্থাৎ আরও অনেক বদলাতে হবে, যা হয়েছে এ সব কিছুই নয়। বড় মুশকিলের ব্যাপার। টমাসের

চিঠি বের করে নিলেন, গভীর মনোযোগে প্রতিটি কথা ধরে ধরে পড়ছেন। যা টমাস লিখেছেন, তা ছাড়া অন্ত রকম মানে দাঁড় করানো যায় কিনা? অসম্ভব। তাঁহার মারপ্যাঁচ থাকতে দেবার পাত্র কাশীশ্বর নন; শর্তগুলো জলের মতো পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তিনি কাজে নামেন নি। সরমা বিশ্বেশ্বরের উপর রাগ করেন, কিন্তু বিপদ ষোল-আনা বানিয়ে রেখেছেন কাশীশ্বর নিজে। এ চিঠি রাখতে গেলেন কেন, কলঙ্কের দলিল? কাজ হয়ে গেলে তিনিই তো পোড়াতে পারতেন।

সেই থেকে কথা বন্ধ করে আছেন সরমা। আচ্ছা, বোঝে না কেন যে ইতিহাসে নাটক-নবেলের মতন মনগড়া কথা লিখবার জো নেই। ইরাবতী যত আদরের হোক, মেয়ের জন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডারে মেকি ঢোকানো চলে না। কাশীশ্বরের চেয়ে সে অপরাধ কম হবে কিসে? কম তো নয়ই—লক্ষ গুণ, কোটি গুণ। কাশীশ্বরের বিশ্বাস-ঘাতকতা একটি মানুষের সম্পর্কে। বিশ্বেশ্বর অপরাধী হয়ে থাকবেন —এখন যত মানুষ আছে তাদের কাছে, আর ভাবীকালে যারা সব জন্মাবে। ভগবান, কিছু নতুন তথ্য দাও জুটিয়ে। 'ভারতে ইংরাজের' পরিশিষ্টে বিশ্বেশ্বর ডঙ্কা পিটিয়ে সেই খবর জাহির করে দেবেন। সব দিকে ভালো হলে, ভালো ঘরে-বরে বিয়ে হয়ে যাবে মেয়ের, তাঁরও পাপ-কাজ করতে হবে না। এমনি কিছু দাও হে ভগবান!

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। রাত অনেক হয়েছে, নিশুতি শহর। গলির মোড়ে গোটাকয়েক কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে শুধু। আর মাথার উপরে একটা প্লেন উড়ে গেল। কুকুরের ডাক থেমেছে। অতল নিঃশব্দতা।

বিশ্বেশ্বরের চোখে ঘুম নেই। কী কাণ্ড, শরীর খারাপ হয়ে পড়বে, সকাল বেলা উঠতে পারবেন না, ঘুমানোর দরকার। একটা

অসুখ-বিসুখ হয়ে পড়া মানে বাড়ির মানুষদের বিব্রত করা। তার চেয়েও বড় কথা—কাজকর্ম থেমে থাকবে অসুখের জন্য। একবার বন্ধ হয়ে গেলে সূত্রের জোড়াতালি দিয়ে আবার চালু করা কঠিন হয়, বিস্তর সময় লাগে। আর, আজকাল যে কথাটা বারম্বার মনে ওঠে বিশ্বেশ্বরের—সময়ের বালু ঝরে ঝরে জীবনের পাত্র খালি হয়ে এলো। কাজের অনেক বাকি, অকারণে তিলেক সময়-হানি চলবে না।

বাইরে এসে কলের জল থাবড়ে দিলেন মাথায় চোখে-মুখে হু-পায়ের পাতায়। দেহ ঠাণ্ডা হোক। এই নিশিরাত্রে চারিদিক তাকিয়ে মনে হয়, অজানা কোন এক আজব জায়গা। রাক্ষসে খেয়ে-ফেলা কোন এক প্রেতপুরী। রাস্তার আলোগুলো নিঃশব্দে সেই পুরীর পাহারা দিচ্ছে।

শুয়ে পড়লেন চোখ বুঁজে। ঘুমাতেই হবে। · সাদা ভেড়ার পাল চরছে পাহাড়ের উপরে—এক, দুই, তিন, চার···মনে মনে গুনে যাও পঞ্চাশ অবধি। পঞ্চাশ, উনপঞ্চাশ, আটচল্লিশ গোন আবার উল্টো দিক দিয়ে।···অঙ্কের মাস্টার আচ্ছা করে একদিন কান মলে দিয়েছিলেন···বাজার করতে গিয়ে ভুল করে কার পাতাড়ি-মাছের খালুই নিয়ে এসেছিল ছোট বিশ্বেশ্বর···নদীতে ঝাঁপ খেয়ে পড়ত ঝুঁকে-পড়া আমের ডালের উপর থেকে · ঘুমিয়েছে ভেবে গায়ে কাঁথা চাপিয়ে মশারি গুঁজে দিয়ে মা রান্নাঘরে খেতে গিয়েছেন, দুষ্টামি করে তিন-বছুরে বিশ্বেশ্বর কেঁদে উঠল···

বুড়ো বিশ্বেশ্বর পিছুতে পিছুতে তিন বছরে এসে পৌঁচেছেন। তারও আগে আছে, আর মনে পড়ে না। তারই নাম তো ইতিহাস। ছোট্ট খুকি ইরা কথায় কথায় দু-পাটি দাঁত মেলে দাঁতের বাহার দেখাত। নতুন দাঁত উঠলে দেখাতে ইচ্ছে করে বোধ হয়। বড় ছেলেটা একদিন রাস্তার ধারে পচা নর্দমার মধ্যে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে

বাড়ি এসেছিল। সরমা এলো নতুন বউ হয়ে, মাথায় সোনার সিঁথিপাটী, পায়ে গুজরি—ও-সব গয়না আজকাল পরে না, বিয়ের মেয়েকে কিন্তু ঠিক ঠিক মানায় না ও-সমস্ত না পরলে…

ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘটনা—চৈত্রমাসের শিমূলতুলোর মতো আসছে একটু স্মৃতির সামনে, কোন দূরে উড়ে যাচ্ছে আবার। ঘুম আসে—সত্যি এলো এবারে বুঝি ঘুম—

ওঠ ঐতিহাসিক। কত লোক এসেছি, তোমার ছোট্ট তপোবন ভরে ছাপিয়ে যাচ্ছে। চোখ মেলে উঠে বসে দেখ, কী কাণ্ড! আলস্য লাগছে বিশ্বেশ্বরের, উঠতে আর ইচ্ছে করে না। সমস্তটা দিন বড্ড ঝক্কি গিয়েছে। কত অনুযোগ-বিদ্রূপ, কত রকমের অনুনয়—দায়িত্বের কত চোখ-রাঙানি।

উঠবার শক্তি নেই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জোড় খুলে গেছে। জোড় পরিয়ে সমস্ত ঠিকঠাক করে খাড়া হয়ে বসা—সে অনেক হাঙ্গামা। শুয়ে শুয়ে দু-চোখ মেলেই দেখতে লাগলেন যেন বিশ্বেশ্বর। বাপ রে, হাজার দু-হাজার এসে জমেছে এইটুকু ঘরের ভিতর। 'ভারতে ইংরাজ'-এ যত লোকের কথা আছে, কেউ বড় বাদ নেই। সামান্য অতি-সাধারণ থেকে মহামহিম ধুরন্ধরেরা। আলোর মতন, অথবা ছায়ার মতন—চেহারা ঠিকই আছে, কিন্তু আয়তন নেই। নতুবা এক ঘরে হাজার হাজার মানুষের স্বচ্ছন্দ সঙ্কুলান হয় কেমন করে?

তারপর মনে হল, ঠিক বায়ুভূত নয়—খসখস আওয়াজ হচ্ছে যেন শিয়রের দিকে, চলাচল করছে অন্ধকার ঘরে।—আরে, আরে, কি সর্বনাশ! কত রকমের কাগজপত্রে ঠাসা এ ঘর—পায়ের ঘায়ে ছড়িয়ে উড়িয়ে ঘুরঘুর করছ তোমরা যে বড়!

বিরক্ত হয়ে বিশ্বেশ্বর শিয়রের দিকে ডানহাত বাড়ালেন। পা ধরে টেনে এনে—কি করবেন, আছাড় দেবেন নাকি? ঘুমের অলস

মস্তিষ্কে ভাবছেন, যা-হোক করা যাবে একরকম। এবং ধরেও ফেললেন—পা নয়, হাত একখানা। অন্ধকার হোক, চোখ বোঁজা থাক—তা হলেও স্পর্শ পেয়ে বুঝতে তাঁর সিকি মিনিটও লাগে না। অশরীরী ইতিহাসের মানুষ কেউ নয়—মেয়ে, কিম্বা বিশ্বেশ্বরের বুড়ো মা তরুণী মেয়ের মূর্তি হয়ে মৃত্যু-পার থেকে আবার এসেছেন।

কোমল কণ্ঠে বললেন, এখানে কেন রে ইরা? ঘুমোস নি? ঘরের মধ্যে এলি তুই কেমন করে?

লিখতে লিখতে ভাবতে ভাবতে বিশ্বেশ্বরের ঘুম এসে গিয়েছিল। হাতের কাছে টেবিল-আলো, আন্দাজি সুইস টিপে দিলেন। তন্দ্রালু চোখ মেলে তাকালেন মেয়ের দিকে। ঘুম টুটে গেল মুহূর্তে। কড়া হয়ে বললেন, হাতে তোর কি রে? কি আছে হাতে, লুকোস কেন?

তড়াক করে উঠে বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়ের হাত চেপে ধরলেন। আঁচলের তলা থেকে পড়ে গেল বস্তুটা। ফাইল। স্তূপাকার কাগজের ভিতর থেকে বাছাই করে কতকগুলো ফাইলে ঢুকিয়ে রেখেছেন। শিয়রের কাছে থাকে, দরকারের সময় হাতড়ে বেড়াতে না হয়। কাশীশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে যত মৃত্যুবাণ সমস্ত এই এক জায়গায়—একটি তূণের ভিতর।

বজ্রগর্জনে বিশ্বেশ্বর বলে উঠলেন, কেন নিয়েছিলি এসব তুই? কোথা যাচ্ছিলি?

আশ্চর্য শান্ত ইরাবতী। সহজ ভাবে বলে, চুরি করতে এসেছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে আঁধারে তোমার গায়ে হাত পড়েছে, তাই তুমি ধরে ফেললে।

স্তম্ভিত হয়ে বিশ্বেশ্বর তার দিকে তাকান। কথা সরে না। ইরাবতী বলতে লাগল, কাগজগুলো নিয়ে যত গণ্ডগোল। মা'র সঙ্গে তোমার আলাপ বন্ধ। কৃতান্ত-কাকা পঞ্চাশবার এসে বলছেন,

নতুন নতুন লেখা বানিয়ে দাও ওর উপরে। ছাপিয়ে তিনি দু-পয়সা লুঠবেন। অমুজাক্ষ ডাক্তারবাবু চটাচটি করে চলে গেলেন। মথিরামপুর নিয়ে গিয়ে এই সর্বনেশে বস্তু তোমায় পছিয়ে দিয়েছে, ঝেড়ে ফেলতে না পারলে ওদের নিস্তার নেই।

তুই বললি একথা ইরা? লেখার ব্যাপারে বরাবর তুইই তো আস্কারা দিয়েছিস। বাড়ির মধ্যে একমাত্র তুই। সবাই যাচ্ছেতাই করে, তুই আমার হয়ে সকলের সঙ্গে লড়িস।

বিশ্বেশ্বরের গলার স্বর কেমন-কেমন। কোটরগত দু-চোখের সকল দৃষ্টি পুঞ্জিত করে কি যেন চেয়ে চেয়ে দেখছেন ইরার মুখে, আর ঘাড় নাড়ছেন।

ঠিক, ঠিক—সর্বনেশে কাগজ। সোনার ছেলে অরুণ এরই জন্য মুখ চুন করে চলে গেল। রাত দুপুরে তোর চোখে ঘুম নেই। বাপের ঘরে চোর হয়ে ঢুকেছিস—

একটু হেসে ইরাবতী লঘু করে নিতে চায়ঃ তোমার চোখে বড্ড ঘুম বুঝি বাবা? সব জানি, সব জানি। কত রাত অবধি তোমার ঐ জানলায় ঠায় দাঁড়িয়ে, কিছু তুমি টের পাওনি।

তাই তো বলছি রে! বাপ আমি নই, তোর শত্রু। বড়বউ মিথ্যে বলে না—শত্রু একলা তোর নই, খেয়াল বশে এমন সাজানো সংসার তছনছ করছি। হাড়ভাঙা কষ্ট করে তুই সামলাচ্ছিস, তোরই আখের নষ্ট করে দিচ্ছি। কম সর্বনেশে মানুষ আমি।

যে ফাইল কেড়ে বিশ্বেশ্বর দু-হাতে বুকের উপর নিয়েছিলেন, সেটা আবার এগিয়ে ধরেন মেয়ের দিকে।

নিয়ে যা মা। বড় লোভের জিনিস, আমার কাছে আর রাখব না। তোর পথের কাঁটা—নিয়ে পুড়িয়ে ফেলগে। ঘরের সমস্ত

কাগজপত্রে একদিন এসে দেশলাই ধরিয়ে দে তোরা মা আর মেয়ে। দায়মুক্ত হয়ে আবার আমি চাকরি খুঁজতে বেরুই।

ইরার দু-চোখ ভরে জল এলো। বলে, বাবা অন্যায় করতে এসেছি—তুমি বকলে না, রাগারাগি করলে না, এ তুমি কেমন হয়ে গেলে বাবা? গালিগালাজ কর, ধরে মার আমায়—

হয়তো বা মার খাবার জন্যই এগিয়ে এসে মাথা বাড়িয়ে দেয়। অত বড় ঐ মেয়েকে খুকির মতন বিশ্বেশ্বর কোলের মধ্যে টেনে নিলেন। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কতকটা যেন আপনার মনে বলছেন, মিথ্যে দম্ভ আমার! আরে, কত দেশের কত ইতিহাস গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে বেমালুম হল, আমি কোন ছার, আমি যাচ্ছি ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে মিনার গড়ে তুলতে। কিছু হবে না, শুধু ধুলো মাথাই সার।

ইরাবতী কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুমি যে কত বড়, কেউ তা বুঝল না। তোমার কাজের কেউ দাম দেয় না। ঘরে-বাইরে এত লাঞ্ছনা আমি সইতে পাচ্ছিনে বাবা। বিশ্বাস করছ না কেন বল তো, সত্যিই আমি চুরি করতে এসেছিলাম। মেয়ে হয়ে বুঝি চুরি করা যায় না? জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, কত কষ্ট তোমার। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লে, তবু এপাশ-ওপাশ করছ। সমস্ত দেখেছি। তখন ঠিক করলাম, ঐ শয্যাকণ্টক নিয়ে নেব যেমন করে হোক। মাথায় জল দিতে যেমন তুমি বাইরে এলে, অমনি আমি ঢুকে পড়েছি। কিচ্ছু তুমি টের পেলে না। আমার সঙ্গে পারবে তুমি!

কান্নার মধ্যে একটু হাসির ঝিকিমিকি। একেবারে এক ফোঁটা মেয়ে যেন। বিশ্বেশ্বর বলেন, তোর কত গুণ তা-ও কি বুঝল কেউ? তার কোন আদর হয়েছে? মেয়ে দেখতে এসে অবুঝ ডাক্তার আমায় কতকগুলো ধমক দিয়ে চলে গেল। আরে, আমার যে

অপরাধই হোক, তোর গুণে তোকে ঘরে নিয়ে তোলা উচিত। নিয়ে তো বর্তে যাবে।

ইরা বলে, আমরা গরিব বলে মানুষে এত হেনস্তা করে। পণ নিয়ে কথাকথি—পণেই যখন বনল না, মিথ্যে তারপরে মেয়ে দেখে ফল কি? ভালোই হয়েছে বাবা, আমার হয়রানি হল না।

পণ? বিশ্বেশ্বর ঘাড় নাড়লেন, না, পণের কথা কিছু হয়নি অম্বুজ ডাক্তারের সঙ্গে। ওখানে বিনাপণে হয়ে যেত—আমরা ইচ্ছে করে যা দিতাম। গোলমাল বাধল কাশীশ্বরের ব্যাপার নিয়ে।

ঐ তো পণ বাবা। এত বছর ধরে প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত্রি যে সাধনা করেছে, তার সমস্ত ফলাফল তোমার কাছে চেয়ে বসল। এর চেয়ে বড় পণের দাবি কোন ছেলের বাপ কবে করেছে?

বিশ্বেশ্বর বললেন, ভেবে দেখলাম মা—আমি ঐ এক কথাই সমস্তটা দিন অনেক রকমে ভেবেছি—গরিব লোকের পক্ষে এ সব বই লেখা মানায় না। ফের আমি চাকরি-বাকরি করব। তেমন আর শক্তি নেই, তবু চেষ্টা দেখতে হবে। আজ হোক কাল হোক, করতেই তো হবে কিছু—চিরকাল তুই এইভাবে খেটে মরবি, সে তো হতে পারে না, সময় থাকতে লেগে পড়াই ভালো। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি মা। পরজন্মে যদি ভালো ঘরে জন্মাই, তখন ইতিহাস নিয়ে কাজ করব, এ জন্মে ইতি।

ক্ষেপে গেলেন নাকি বিশ্বেশ্বর? চোখ-মুখের ভাব অস্বাভাবিক। এক সঙ্গে এত কথা এমন করে উনি বলতে পারেন, কে জানত? মায়ের সঙ্গে হামেশাই খিটিমিটি বাধে, সেটা কিছু নয়—কিন্তু অম্বুজ ডাক্তারের অপমানটা মনে বড় লেগেছে। আর, সকলের বড় আঘাত লাগল ইরাবতীর আঁচলের নিচে কাগজগুলো দেখতে পেলেন যখন।

মেয়েও বিপক্ষ-দলে, তবে আর কে রইল তাঁর দিকে?—দেবতার মতো বাবাকে সকলে মিলে আমরা মেরে ফেলছি।

আর একটা কথা বলতে দেবে না সে বিশ্বেশ্বরকে। যত বলবেন, ততই তো উত্তেজিত হয়ে উঠবেন। জোর করে ইরা শুইয়ে দিল, হাতপাখা নিয়ে পাখা করছে। কড়া পাহারাদার শিয়রে—বিশ্বেশ্বর কি করবেন, শান্ত ছেলের মতো চোখ বুঁজে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলেন তিনি। ইরাবতী বাতাস করছে আর ভাবছে আকাশ-পাতাল। রি-রি করে সর্বাঙ্গ জ্বালা করে—তারই জন্য এত বড় মূল্য আদায় করতে এসেছিল ওরা বিশ্বেশ্বরের কাছে! পাশাপাশি আবার অরুণাক্ষের অসহায় ভীত মুখের ছবি মনে আসে, বেদনায় অন্তর ভরে যায়। তারপরে—অনেকক্ষণ পরে মনে হল, ঘুমিয়ে পড়েছেন বিশ্বেশ্বর ঠিক। হাতের পাখা নামিয়ে রেখে সন্তর্পণে উঠে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ইরাবতী নিজের ঘরে চলে গেল।

পাতলা ঘুমের মধ্যে বিশ্বেশ্বর দোর ভেজানো টের পেলেন। একজনে গেল, কিন্তু আরও তো অনেকে ঘর ভরে রইল। চোর ধরে ফেলে বিশ্বেশ্বর যেই আলো জ্বেলেছিলেন, ইতিহাসের লোকগুলো অমনি যেন ছুটোছুটি করে এ-আলমারির তলায় ও-বইয়ের নিচে ঐ কাগজের ফাঁকে পলকে উধাও। বিদ্যুতের আলোয় চেয়ে চেয়ে দেখ, কিছু নেই কোন দিকে। শুধু ইরাবতী, তার বাবা, আর ঘরময় ঠাসা কাগজপত্তোর। আঁধার ঘরে ইরাবতী বাপের মাথায় বাতাস করছিল, জুত পেয়ে তারা তখন—হ্যাঁ, চোখ বুঁজে বুঁজেই বিশ্বেশ্বর স্পষ্ট দেখলেন—অন্ধিসন্ধি থেকে সুড়সুড় করে বেরিয়ে তারা সব আবার জাঁকিয়ে বসল এদিকে-ওদিকে নিচে উপরে। ইরাবতী চলে যেতে মজা এখন ষোল আনা জমেছে—চলাফেরার খসখসানি, ফিসফাস কথাবার্তা···

অস্ফুট, অতি ক্ষীণ—তারপরে কথাবার্তা জোরদার হয়ে আসছে ক্রমশ। আগে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না, বোবা মানুষের মতো উ-উ-উ করে একসঙ্গে সবাই বলতে চায়, এখন আন্দাজে কিছু কিছু বুঝছেন। কথা তাঁকে নিয়েই, তাঁকে শোনাবার জন্ত। কয়েকটি কণ্ঠ তার মধ্যে স্পষ্ট না হোক, বেশ প্রখর হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। তাঁকে গালি দিচ্ছে, নিন্দেমন্দ করছে। কারা তোমরা, পরিচয় দাও। কত জ্বালায় জ্বালাতন হয়েছি, কেউ কি তার খবর রাখ? মরা মানুষ তোমরা—মড়ার খাতিরে জলজ্যান্ত আসল মানুষদের ভাসিয়ে দিই কেমন করে বলো?

বিশাল পুরুষ—অঙ্গে মলিন ছিন্ন কয়েদির সাজ, গলায় মালার মতো জড়ানো ফাঁসির দড়ি, রক্তাক্ত দুটো চোখের মণি অগ্নিগোলকের মতো কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে, দীর্ঘায়িত জিহ্বা ঝুলে পড়েছে বুকের নিম্নাংশ অবধি আবৃত করে—বলছেন তিনি। কথা নয়, আওয়াজ খানিকটা, ক্ষোভ আর ক্রোধ গর্জাচ্ছে সেই আওয়াজের মধ্যে। আঙুল তুলে তুলে যেন বলছেন, রামনিধি আমি। সম্পর্কে তুমি পৌত্র বলে নয়—ঐতিহাসিকের কাছে দাবি আমার। গলায় দড়ি বেঁধে দম আটকে নৃশংস ভাবে আমায় মেরে ফেলল। পরম বন্ধুকে টাকা দিয়ে কখন কিনে ফেলেছে—শুধু আমি বলে কেন, সকল মানুষের চোখে সে ধুলো দিয়ে বেড়িয়েছে। তোমার চোখেই কেবল ফাঁকি চলল না, তুমি ধরে ফেললে। ন্যায়ের দণ্ড তোমার হাতে ঐতিহাসিক, আমি বিচার চাচ্ছি। সর্বকালের মানুষের সামনে কাঠগড়ায় তুলে বিচার করো বিশ্বাসঘাতক কাশীশ্বরের।

বিশ্বেশ্বর হাউহাউ করে কেঁদে পড়লেন: আমি গরিব। কন্যাদায় আমার। ভালো সম্বন্ধ পেয়েছি। ইরা আমার বড্ড ভালো, অরুণও ভালো ছেলে। দুটিতে সুখে থাকবে। সেই লোভে মেয়ে হয়েও আজ

কাগজ চুরি করতে আমার ঘরে ঢুকেছিল। মেয়ের সাধ-বাসনা পায়ে থেঁতলে দিই আমি কেমন করে?

আবার উল্টোদিকে আর-এক ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। কাতর কণ্ঠ। এ তো একেবারে চেনা মুখ, চেনা চেহারা। কাশীশ্বর রায়। মানুষটিকে দেখে এসেছেন মণিরামপুর গিয়ে—হযুজাকের বাড়ির অয়েল-পেন্টিংএ। সেই দাম্ভিক চেহারা কী রকম হয়ে গেছে এখন, হাতজোড় করে কাকুতি করছে। দেখ, আমায় এত বড় করলে তুমিই। আকাশে তুলে ধরে পাঁকের মধ্যে ছুঁড়ে দিও না আবার। আমায় মার্জনা করো। অনেক শাস্তি হয়েছে। লাঠি মেরে মাথা ভেঙে চাঁদপাল ঘাটের পাশে চরের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিল, শিয়ালে আমার দেহ নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করল সারারাত্রি। সকাল হলে শকুনের দল ঘিরে ধরল। মেছো-কুমির অদূরে মাথা ভাসান দিয়েছিল কিঞ্চিৎ প্রসাদ লাভের আশায়। অনেক তো হয়ে গেছে। শাশ্বত কালের দরবারে আর আমায় দাঁড় করিয়ে দিও না।

বিশ্বেশ্বরের চোখে জল আসে। বড় দরদ দিয়ে লিখেছিলেন কাশীশ্বরের অধ্যায়টা। লিখতে লিখতে মানুষটাকে ভালোবেসেছিলেন। রামনিধিকে সকলে জানে; পিছনে পিছনে ছায়ার মতো যে-জন সকল কার্যের সহায় হয়েছিলেন, তাঁর নাম বড় কেউ জানে না। ইতিহাসের অবজ্ঞাত কাশীশ্বর—তাই রামনিধির চেয়েও বেশি মমতা কাশীশ্বরের উপর। আজকে তাঁকেই আবার আঙুল দেখিয়ে ভণ্ড বিশ্বাসঘাতক বলা—এ তো নিজেরই বুকে ছুরি বসানোর ব্যাপার। ছুরি বসানো ঐ সঙ্গে সরমার ঘর-সংসারের উপর, ইরা-মায়ের সাধ-আহ্লাদ-ভালোবাসার উপর…

সারারাত্ত এমনি কেটেছে। ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্ন, জেগে উঠে বারম্বার [illegible] উঠে বসা। ভোরের দিকে ঘুমটা এঁটে এলো। কেউ ডাকে

নি তাঁকে ; ডেকে তুলে দেবার মানুষই বা কে ? ইরা তো বেরিয়ে গেছে মেয়ে পড়াতে, সরমা আলাপ বন্ধ করে আছেন। আজকে বিশ্বেশ্বর যদি মরে পড়ে থাকেন, সরমা বোধ হয় নেড়েচেড়ে দেখতে আসবেন না। দোষ দেওয়া যায় না—মেয়ের মা,—আহা, মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে পায়ের উপর পড়ে কত আকুতি করেছিলেন সরমা।

হেনকালে নিচে অরুণাক্ষর মতন গলা। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন বিশ্বেশ্বর। সিঁড়ির উপর থেকে ডাক দেন, অরুণ, একবার শুনে যেও বাবা। বড্ড দরকার, আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে যেও না।

ইরাবতীর সঙ্গে কাল অমনধারা কথাবার্তার পর অরুণাক্ষ ধৈর্য ধরে চুপচাপ বাড়ি বসে থাকে কেমন করে ? আবার এসেছে আজ। আরও সকাল সকাল যে আসে নি, সে কেবল ইরার বেরিয়ে পড়বার অপেক্ষায়। রোজ রোজ দেখলে মেয়েটা কি ভাববে ? যা মেজাজ —কিছুই বলা যায় না, এইটেই হয়তো বা বিষম অপরাধ হয়ে দাঁড়াল। ভালোয় ভালোয় কাটলে যে হয় এখনকার দিনগুলা ! কন্যার ভাব-গতিক খুব ভালো—এখন পিতাঠাকুর মশায়ের মতিগতি কোন ধারায় চলেছে, খোঁজখবর না নিয়ে সোয়াস্তি নেই। তাই এসেছে। সরমার সঙ্গে গল্প জমিয়ে নেবে, তার মধ্যে হুড়হুড় করে সব বেরিয়ে আসবে। সরমা রেখেঢেকে বলতে জানেন না, কিম্বা চান না অরুণাক্ষের কাছে কোন-কিছু গোপন রাখতে। ধীরে ধীরে এই প্রসঙ্গেই আসছিল, এমন সময় উপর থেকে বিশ্বেশ্বর ডাক দিলেন, শুনে যাও অরুণ—

সরমা বলে ওঠেন, যাও। যতক্ষণ না যাচ্ছ, অমনি তো চেঁচামেচি চলবে। গিয়ে শোন গে—আবার কোন মহৎ কাজ করে বসে আছেন, সারাদিন ভেবে ভেবে হ্রস্বই-র জায়গায় দীর্ঘ-ঈ বসিয়েছেন কোথায়।

এ-বাড়ি মানুষ আসে। মানুষ এসে দুটো ভালোমন্দ কথা বলবে, তা উপরতলায় কেমন সঙ্গে সঙ্গে জট নড়ে ওঠে।

অরুণাক্ষ তপোবনে গেল। কাগজপত্রের ফাইলটা তার হাতে দিয়ে বিশ্বেশ্বর বললেন, এই নাও, নিয়ে পালিয়ে যাও। শিগগির ঘর থেকে চলে যাও বাবা। বড্ড লোভের জিনিস—বলা যায় না, আবার হয়তো ছোঁ মেরে নিয়ে নেব সমস্ত।

অরুণাক্ষ হতভম্ব হয়ে গেছে। বলে, কি এ সব ?

সেই যে গন্ধমাদন নিয়ে এসেছিলাম, ঝাড়াই-বাছাই করে এই দাঁড়িয়েছে। বাকি সব ভুষিমাল। তা ওজনে কম হলে কি হয়, দামে ভারী। কোহিনুর হীরের কতটুকু আর ওজন বলো। তোমাদের বাড়ি থেকে এনেছিলাম, তোমার হাতে ফেরত দিচ্ছি।

পুলকিত স্বরে অরুণাক্ষ বলে, পরিশিষ্ট লিখবেন না তবে ?

কোন কিছুই লিখব না। এ জন্মে আর নয়। আমার মৃত্যু হয়েছে। তাই তো কাগজপত্তোর সরিয়ে দিচ্ছি। থাকলে হয়তো লোভ হবে লিখবার। ইতিহাসের ছাত্র, তোমায় আমি বেশি কি বলব ? সর্বনেশে জিনিস, লোভ সামলানো বড় দায়। তার উপরে যখন তখন কৃতান্ত এসে 'কাশীশ্বরের কদ্দূর কি করলেন'—তাগিদে তাগিদে অস্থির করে তুলছে।

একটুখানি ইতস্তত করে অরুণাক্ষ বলে, এসব নিয়ে আমি কি করব, বলে দিন।

আমি কি জানি, আর কি বলব। ইতিহাস তুমি ভালোবাস—সেই টানে টানে এ-বাড়ি এসে পড়েছিলে। কত পড়াশুনা তোমার, কত পণ্ডিতজনের কাছে পাঠ নাও। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, চিরকাল কেরানিগিরি করে এসেছি—আমি তোমায় বলে দেব, কি করতে হবে এই সমস্ত নিয়ে ?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, ইতিহাসের গবেষণা আমার মতন লোকের জন্য নয়। এতদিন ধরে জড়ো-করা বোঝার কি গতি হবে, ভেবে সোয়াস্তি পাচ্ছিলাম না। ইরাকে বলছিলাম, তুই নিয়ে পুড়িয়ে ফেল। সে কিছু কাজের কথা নয়, মনের দুঃখে বলেছিলাম। তোমার কথা তখন মনে পড়েনি। এই ক'খানা কাগজ শুধু নয় বাবা, আস্তে আস্তে ঘরের বোঝা খালি করে নিয়ে যাও তোমার বাড়ি। কেমন যেন আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে এর মধ্যে। রাত্রিবেলা এক লহমা ঘুমুতে পারি নি। যত-কিছু আছে সাফসাফাই করে আমায় মুক্তি দাও অরুণ—

অরুণাক্ষ নিচে নামছে, সিঁড়ির মুখে সরমা দাঁড়িয়ে আছেন।

কি হল?

অরুণাক্ষ বলে, সব ঠিক হয়ে গেল মা। উনি আর পরিশিষ্ট লিখবেন না। দু-চার দিনের মধ্যে বাবা এসে পাকাপাকি করে যাবেন। আগে এসে আমি তারিখটা বলে যাব।

কথাবার্তা কি হল, বলো দেখি শুনি।

কাশীশ্বরের কথা আর লিখবেন না উনি। লিখবার উপায়ও রইল না, কাগজপত্র আমায় দিয়ে দিলেন।

উল্লাস ভরে ফাইল উঁচু করে দেখাল। বলে, বাবাকে গিয়ে বলি। দেখিয়ে দেবো এই সমস্ত জিনিস। আর কোন বাধা রইল না মা। আপনি আশীর্বাদ করুন।

সরমার পায়ের ধুলো নিয়ে সে চলে গেল। দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সরমা বিড়বিড় করে বলেন, ভালোয় ভালোয় কাজটা করে দাও ঠাকুর। আমার মেয়ে সর্বসুখী হোক।

—চোদ্দ—

ইরাবতী বেরুচ্ছিল। দরজার কাছে বাড়িওয়ালাকে দেখে বিপদে পড়ল। ইদানীং ভাড়ার তাগাদায় আর আসে না। ছ-মাসের ভাড়া মনিঅর্ডার করে দিয়েছে মাস দুয়েক আগে। তবু বিস্তর বাকি এখনো। এতদিন পরে এসেছে, এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তারই অপেক্ষায়—হিংস্র জীব শিকার ধরবার জন্য যে রকমটা ওৎ পেতে থাকে। ইরাবতীর মুখ শুকাল। পড়ে গেছে সামনা-সামনি—দেখিনি-দেখিনি করে সরে পড়বে, তার উপায় নেই।

কিন্তু বাড়িওয়ালা একা নয়, আরও দুটি লোক আছে মাপের ফিতে নিয়ে। ফিতে ধরে সশব্দে তারা মাপ বলছে, বাড়িওয়ালা টুকে টুকে নিচ্ছে। ইরাবতীকে গ্রাহ্যই করে না, মুখে কিছু বলে না—ঠোঁটের হাসি হেসে নিঃশব্দে একটু আপ্যায়ন করল। কৌতূহলে দাঁড়িয়ে পড়ে ইরাই তখন কথা বলে, এ সব কি?

জমি বেড়ে গেল মা।

জমি আবার বাড়ে কেমন করে?

বাড়ল বই কি। মাপের কাগজখানায় একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বাড়িওয়ালা বলে, হ্যাঁ, তাই। আমার ঠাকুর এই বাড়ি করেছিলেন দু-কাঠা জায়গার উপর। যা দেখছি, সেটা এখন তিনেরও উপরে চলে যাবে।

চমৎকার তো! জ্যান্ত প্রাণী বাড়ে, আপনার কপালে দেখছি জায়গাজমিও ফেঁপেফুলে বড় হয়ে যায়।

হেঁ-হেঁ-হেঁ করে খানিক টেনে টেনে হেসে বাড়িওয়ালা বলে, সেকালের মানুষগুলো ছিল বড্ড সাদাসিধে—ভজিয়ে বুঝত না।

জোড়গির্জের পাঁচু নন্দীর কাছ থেকে এই জমি কেনা একশ' টাকা কাঠা হিসেবে। ছ-কাঠা মাপজোপের পর এককালি ভেরন্ডা জমি পড়ে রইল—নন্দী বলে, নিয়ে নাওগে ওটুকু, ওতে আর আমার কোন কাজ হবে? সেই সব দিয়ে একুনে এখন তিন কাঠার উপর দাঁড়াচ্ছে। আবার আমার ঠাকুরের কাণ্ড দেখ না—তিন কাঠা হোক বা ছ-কাঠাই হোক, তার উপরে আড়াইখানা ঘর তুলে ভাবলেন, কি অট্টালিকাই না বানালাম! আজকে হলে চারটে ফ্ল্যাটে চার তিনে বারোখানা ঘর অন্তত উঠতই—

তাই ওঠাবেন বুঝি? ভেঙে নতুন বাড়ি করবেন?

বাড়িওয়ালা বলে, টাকাপয়সা থাকলে কবে করে ফেলতাম! করতে পারলে ভাড়াও অন্তত পাঁচ-ছ'গুণ হয়ে যেত। সে সব তো হল না, বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছি মা। তারাই হয়তো করবে। করে দেদার টাকা লুটবে।

উদ্বেগের চিহ্ন ফুটল ইরাবতীর মুখে। নতুন লোক মালিক হয়ে আসবে, কেমন জানি তাদের ভাবগতিক—ভেঙেচুরে নতুন বাড়ি বানায় তো বাস তুলতে হবে এত কালের জায়গা থেকে। এত মাসের বাড়িভাড়া বাকি, কালেভদ্রে দুটো-একটা কড়া কথা বললেও এই বাড়িওয়ালা মোটের উপর মানুষ খারাপ নয়। যেমন ভাবে হোক, কেটে যাচ্ছে তো এক রকম! কিন্তু নতুন মালিক খাতির-উপরোধ মানতে যাবে কেন?

ইরা বলে, ভাড়া অনেক বাকি পড়ে গেছে। ছ-মাসের ভাড়া ডাকে পাঠিয়েছিলাম, রশিদও পেয়েছি। আবার শিগগির আর ছ-মাসের পাঠিয়ে দেব। ফাঁকি দেবার মানুষ আমরা নই, সে আপনি জানেন। ভাড়া শোধ হয়ে যাবে, এক পয়সাও বাকি রাখব না। কিন্তু তা বলে আপনার ঋণ শোধ হবে না কোনদিন।

অধের কথা কি বলছ গো?—বাড়িওয়ালা সবিস্ময়ে তাকাল ইরার দিকে। বলে, এক আধেলাও ভাড়া বাকি নেই। ঐ যে অমৃতাক্ষ রায় ডাক্তার আছেন তাঁর ছেলে মাসে মাসে ভাড়া দেন। আমি যদি না যাই তো বাড়ি বয়ে টাকা দিয়ে যান।

ইরা ভ্রূকুটি করে বলে, কেন—আমাদের ভাড়া তিনি দিতে যান কি জন্যে?

খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—তাই তো বলেন ছেলেটি। আমার অত শতয় দরকার কি মা, মাসে মাসে ঠিক মতন পেয়ে গেলে হল। ছা-পোষা মানুষ, ভাড়া বাকি থাকলে কি চুপচাপ থাকতে পারতাম? এক পয়সাও পাওনা নেই—উপরন্তু দু-মাসের ভাড়া তুমি ডাকে পাঠিয়ে দিলে। লক্ষ্মী ঘরে এলে 'না' বলতে নেই—সে দু-মাস জমায় রেখে দিয়েছি। বড়লোকের ছেলের খেয়াল মা—ভাড়ার তাগিদে এসে এইখানটায় একদিন দেখা হয়ে গেল। কি রকম দয়া হল বোধ হয়—বলল, ভাড়া আমার কাছ থেকে মাসে মাসে নিয়ে নেবেন, এখানে এসে চাইবেন না। খেয়ালখুশির ব্যাপার, আজ আছে তো কাল নেই—কোন্ দিন বা বন্ধ করে দেবে। তোমার দু-মাসের টাকা তাই হাতে রেখে দিয়েছি। কী রকম আত্মীয় তোমাদের শুনি—এত কালের আসা-যাওয়া, এর আগে কখনো দেখতে পাইনি।

সে কথায় জবাব না দিয়ে ইরা কঠিন কণ্ঠে বলল, এত মাস ধরে চলছে—এ সব ব্যাপার আমাদের জানানো উচিত ছিল।

জানো না, তা কেমন করে বুঝব? মাসের পর মাস চুপিসাড়ে টাকা দিয়ে যাচ্ছে—পাপ কলিযুগে এমন দাতাকর্ণ আছে, আমিও তো প্রথম জানলাম।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইরাবতী। সর্বাঙ্গ রি-রি করে জ্বলছে। দয়া—দয়ার দান দিচ্ছ মাসে মাসে। অফুরান টাকা তোমাদের,

আমরা গরিব। আমাদের সকল দৈন্য জেনে ফেলেছ, তারই সুযোগ নিতে এসো। লোভী মা—অনেক তাঁর সাধ-আহ্লাদ—দানের গৌরবে সেই মায়ের কাছে রোজ রোজ এসে জমিয়ে খোসো।

তপোবনের দরজা বন্ধ। সন্ধ্যা থেকেই ওঘরে আলো জ্বলছে না। আলো জ্বলবে না আর কোনদিন। একটা মাদুর নিয়ে বিশ্বেশ্বর ফাঁকা ছাতে শুয়ে পড়েছেন। সেই ছাত, কৃতান্তর উদ্যোগে সম্বর্ধনা হয়েছিল যেখানে একদিন। আজকে হঠাৎ সমস্ত ভারমুক্ত হয়ে গেছেন তিনি—হালকা ঝরঝরে দেহমন। পাখির মতন—এমন কি, আকাশে উড়ে বেড়াতে পারেন বোধ হয়। সত্যি, কী বোকা আমরা—স্বেচ্ছায় কতকগুলো বোঝা কাঁধের উপর নিয়ে জীবনকে ভয়াবহ করে তুলি। তুমি বিশ্বেশ্বর—দিনের পর রাত রাতের পর দিন বইয়ের গাদার ভিতর থেকে পোকার মতন সত্য খুঁটে খুঁটে চোখের দৃষ্টি ক্ষয় করেছ, স্থবির হয়ে পড়েছ অসময়ে। আজ এতকাল পরে ছাতের উপর শুয়ে শুয়ে তারার আলোয় অবকাশ নিয়েছ, এই রাত্রিটা কোন হিসাবে মন্দ হল নাকি কাজে-ঠাসা সেই সব দিবস-রাত্রির চেয়ে?

রান্নাঘরের কাজকর্ম মিটিয়ে সরমা এসে বসলেন স্বামীর মাদুরের এক পাশে। কলহের শান্তি হয়েছে, মন খুশিতে ভরা। মেয়ের সম্বন্ধে যে সাধবাসনা ছিল, তার পূরণ হতে চলেছে। ইতিহাসের ভূতের বোঝা স্বামীর কাঁধ থেকে নামল; আবার তাঁকে ফিরে পাওয়া যাচ্ছে সংসারের মধ্যে। ক্ষণকাল চুপচাপ বসে রইলেন সরমা, তারপর বললেন, খাবে চলো। মিছে রাত করে কি হবে? কাজ যখন নেই, চলো রান্নাঘরেই বসে খাবে।

এ যেন কতকাল আগেকার কণ্ঠ। নিজের কণ্ঠস্বরে সরমার নিজেরই অবাক লাগে।

বিশ্বেশ্বর উঠে বসে বললেন, চলো—

তবু দেরি হয়ে যায়। মেয়েও ছাতে উঠে এসেছে, এসে ঐ মাদুরে বসে পড়ল। বাপ-মা আর মেয়ে—পুরো সংসার জমেছে সঙ্কীর্ণ মাদুরটুকুর উপর।

ইরা বলে, খুব একটা অন্যায় কাজ করে এলাম। তোমরা রাগ করতে পারবে না।

বিশ্বেশ্বর হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন, অন্যায় করতেই পারিসনে, সে ক্ষমতা নেই তোর—

সরমা বলেন, তোর উপর রাগ করবে, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে রে? তোর রোগের চোটেই ভুবন অন্ধকার—

ট্যুইশানি ছেড়ে দিয়ে এলাম। এক ছাত্রীর একজামিন হয়ে গেছে, সেটা এমনিই গেল। আর এক জায়গায় জবাব দিয়ে এলাম—অন্য লোক দেখে নিও। কাল থেকে মা, আমারও কাজ নেই বাবার মতো।

সরমা রাগ করেন না: বেশ করেছিস। দুয়োরে দুয়োরে উঞ্ছবৃত্তি কোন দুঃখে আর করতে যাবি?

ইরাবতী খিলখিল করে হেসে উঠল: দুঃখ আর কি! ডাল-ভাতটা কোন রকমে জুটত—তা ডাল না-ই বা খেলাম, আর ভাতটা না হয় বাদ গেল। এই বই তো নয়!

বিশ্বেশ্বর চিন্তিত ভাবে বললেন, গতিক বটে তাই। অনেক দিনের অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছি—আজকের সারাটা দিন সেই ধাক্কা সামলাতে গেল। কাল থেকে আমার পুরানো অফিস-পাড়ায় ঘোরাঘুরিতে লেগে যাই। কেরানিগিরি জোটাতেই হবে একটা।

ইরা বলে, সে আর হবে না বাবা। সে পুরানো মানুষ আর তুমি নও। অত বড় বাবা ঐতিহাসিক—কে তোমায় সামান্ত কেরানিগিরি দিতে যাবে?

ঘাড় নেড়ে বিশ্বেশ্বর ম্লান কণ্ঠে বলতে লাগলেন, ঐতিহাসিক না আরো-কিছু! মোহের জালে আটকা পড়েছিলাম, ছিঁড়েখুঁড়ে আজ বেরিয়ে এসেছি। এখন বুঝতে পারি, লোকে যে হাসিঠাট্টা করত সেটা অসঙ্গত কিছু নয়। দেশ-বিখ্যাত ঐতিহাসিক—অথচ বই যার উইয়ে-ইঁদুরে কাটে, খদ্দেরের কাছে পঞ্চাশখানাও বিকোয় না। কচি মেয়ে তুই সকাল-বিকাল মুখে রক্ত তুলে সেই ঐতিহাসিকের অন্ন জোগাস। তা পাপ তোরও আছে ইরা, আমার সামনে শতখান করে গুণ-ব্যাখ্যান করতিস, খেটে খেটে মুখে রক্ত তুলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল।

সরমার কষ্ট হচ্ছে বিশ্বেশ্বরের কথায়। মেয়ের মুখ চেয়ে সংসারের ভাবনা ভেবে কাগজপত্র অরুণাক্ষর হাতে তুলে দিয়েছেন; বুকের কলিজা উপড়ে দিয়ে দিয়েছেন বিশ্বেশ্বর। সরমা ঝগড়া করুন যা-ই করুন—স্বামীর মনের ছবি তাঁর চেয়ে কে বেশি বোঝে? এ প্রসঙ্গ আর তিনি হতে দেবেন না। বললেন, আকাশ-পাতাল ভাবতে হবে না। মেয়ের ক্ষমতায় হয়েছে—দিয়েছে বুড়ো বাপ-মায়ের অন্ন। ছেলে যা মেয়েও তাই—ছুইই সন্তান। ছুয়ে কি আর আলাদা আছে? ছেলে হলে তো কোন কথা উঠত না। ট্যুইশানি ছেড়েছিস ইরা, তাই বা কত বড় কথা! ছু-দিন বাদে নিজেই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিস।

ওমা, কোথায়! ইরা চমকে ওঠার ভঙ্গি করে। কি মতলব তোমাদের খুলে বলো দিকি।

সরমা পুলকিত কণ্ঠে বলেন, হাবাগবা মেয়ে কিনা—কিছু আর জানেন না! খেতে চল্—

ছোট্ট খুকির মতো মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে ইরা বলে, হুঁ, যেতে আমার বয়ে গেছে। তোমাদের ছেড়ে কোথায় যাব মা?

যাবি তোর নিজের ঘরবাড়িতে।

মায়ের গলা ছেড়ে ইরা একটু গম্ভীর হল। বলে, সেই ভাল মা! আমি একা নই—সবসুদ্ধ যাব আমরা নিজেদের ঘরবাড়িতে। আরও এক কাজ করে এসেছি—জপিয়েজাপিয়ে পঞ্চানন-দাদাকে মণিরামপুর পাঠিয়েছি।

বিশ্বেশ্বর বলেন, কেন? মণিরামপুরে কি?

পরের বাড়ি আর থাকব না বাবা—

সরমা সবিস্ময়ে বলেন, কলকাতা ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে যাব?

তোমারই মাথায় তো প্রথম এই মতলব এসেছিল মা, পঞ্চানন-দাদাকে খোঁজখবর আনতে বলে দিয়েছিলে। পঞ্চানন-দাদা বলেও এসেছে কথাবার্তা। আমি কাজকর্ম ছেড়ে এই তো পাটে এসে বসলাম—তুমি কি মনে ভেবেছ, বাবা চাকরির খোঁজে বেরুলেই চাকরি এ-বয়সে অমনি হুড়মুড়িয়ে এসে পড়বে? শুধু এমপ্লয়মেন্ট-এক্সচেঞ্জেই একবার লাইনটা দেখে এসো, কত সোনার ছেলেমেয়ে ভিখারির বেহদ্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাভ কিছুই হবে না—কোনদিন শুনবে, রোদে পুড়ে পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেছেন বাবা।

সরমা নরম হয়ে বলেন, গাঁয়ে যদি যেতেই হয়, এক্ষুণি এত তাড়াতাড়ি যাবার গরজটা কি হল? বিয়েথাওয়া চুকে বুকে যাক, তারপরে যাওয়া যাবে। মণিরামপুরের ওরা বলেই দিয়েছে, যখনই যাব যতদূর যা পারে ব্যবস্থা করে দেবে। তা বলে কালই গিয়ে পড়তে হবে, তার কোন মানে আছে?

ইরা বলে, কাল কি বলছ মা—সাধ্য থাকলে এক্ষুণি ছুটে বেরুতাম। জান, অম্বুজাক্ষ এ-বাড়ি কিনে নিচ্ছেন? সেই যিনি

বাবার কাছে চোখ গরম করলেন; তুমি আসন পেতে থাবার সাজিকে দাঁড়িয়ে রইলে, আসলে না বসে চলে গেলেন যিনি। আমি যে বাড়ি ছিলাম না, তা হলে মুখোমুখি তখনই একচোট হয়ে যেত। এখন অবধি এই আমাদের ভাড়া-বাড়ি। ভাড়া দিই, না দিতে পারলে বাড়িওয়ালার কথা শুনি। তাতে ইজ্জত আছে। এঁদো-গলির এই নড়বড়ে বাড়ি ওরা কিনছে, ভাড়ার জন্ম নয়—বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কিনে নেবার মতলব।

এর পরই মায়ে-মেয়ের দস্তুরমতো ঝগড়া বেধে ওঠার কথা। কিন্তু বিয়ের কথাবার্তা এগিয়ে আসছে, সরমা সামলে গেলেন। বুঝিয়েসুজিয়ে ইরাকে নিরস্ত করতে হবে। বললেন, ওভাবে কেন বলছিস তুই? অরুণ আসা-যাওয়া করে, হয়তো বা দেখেছে আমাদের অসুবিধা। অত্যন্ত সৎ ছেলে অরুণ—

শেষ করতে দেয় না ইরাবতী:

বাড়ি কিনে নিয়ে বিনাভাড়ায় থাকতে দেবে। তোমার খুব আহ্লাদ হচ্ছে মা সৎছেলের দয়াধর্ম দেখে। কিন্তু রামনিধির বংশের মানুষ দয়ার দান হাত পেতে নেয় না—বিশেষ করে সেই বংশ থেকে, টাকার লোভে যারা রামনিধিকে ফাঁসিতে লটকেছিল।

সরমা বলেন, কবে কি হয়েছিল, এরা সেজন্ম দায়ী কিসে? এদের কি দোষ?

ইরা বলে, ওদের না হোক, দোষ ওদের টাকার। পাপের টাকা—বিশ্বাস হত্যার দাম হিসাবে সাহেবরা যা দিয়েছিল। আর জান তো মা, একবার টাকা জমলে ছা-বাচ্চায় বাড়তে থাকে। এক টাকা দশ টাকা হয়ে দাঁড়ায়, দশ হয় পঞ্চাশ। টাকার খাদ্য খেয়ে স্বাস্থ্য হয়; টাকার ইস্কুলে-কলেজে পড়ে বিদ্যা হয়। টাকার জোরে গোটা

ছুনিয়া পায়ের গোলাম বলে বিবেচনা করে। তোমার অরুণের মুখ যতই মিষ্টি হোক না, মনে মনে তাঁর ছুনিয়া কিনে ফেলার দেমাক।

শেষ দিকটায় গলা ভারী। ছু-চোখেও জল হয়তো, অন্ধকারে ঠিক দেখা যায় না। ভালো করে দেখবার আগে থরথর সে নেমে চলে গেল।

সরমা হতভম্ব হয়ে গেছেন। বিশ্বেশ্বরও চুপ করে ভাবছিলেন। বললেন, ইরা নেহাৎ বাজে কথা বলেনি বড়বউ। কলকাতায় পড়ে থেকে লাভ নেই, কিছু হবে না। দরকারই বা কি ইতিহাসের কাজকর্ম আমি যখন ছেড়ে দিয়েছি। মণিরামপুরের মানুষ বড্ড আদর দেখাচ্ছে—পৈতৃক কিছু জমাজমি আছে, পাড়াগাঁ জায়গা, আর যাই হোক উপোস নিশ্চয় করতে হবে না সেখানে। চল, তাই যাওয়া যাক। উপায় যখন একটা দেখা যাচ্ছে, কেন অন্যের কাছে হাত পাততে যাব?

সরমা বললেন, ওর যে বিয়েথাওয়া হবে এখানে থেকে!

এখানে—ঠিক এই বাড়িতেই হতে হবে, তার কোন মানে আছে? পাড়াগাঁয়েও বিয়েথাওয়া হয় বড়বউ। মেয়ের সঙ্গে জেদাজেদি করতে যেও না, পেরে উঠবে না। যত-কিছু ভেবে রেখেছ, সমস্ত গোলমাল করে দেবে।

সরমা তো ইরার মা—তাঁর চেয়ে বেশি কে জানে একথা? বিশ্বেশ্বরের সম্বর্ধনার দিনে অত লোকের খাবার নষ্ট করে দিল একরোখা মেয়ে—কাউকে কিছু মুখে তুলতে দিল না। মেয়েমানুষের এত জেদ—তার অদৃষ্টে না-জানি কি আছে, ভাবতে গিয়ে সরমা দিশা পান না। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য, বিশ্বেশ্বরের মুখে আজ এই সব কথা। গুছিয়ে জবাব দেবেন কি, স্বামীর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। গবেষণার ভূত কাঁধ থেকে নামতে

না নামতে বিশ্বেশ্বর সংসারী মানুষ হয়ে উঠছেন—সেই চাকরির আমলে এক সময়ে যেমনটা ছিলেন।

বিশ্বেশ্বর বললেন, রামনিধিরও ভারি জেদ ছিল। চোখে দেখি নি, তা হলেও আমার মতন কেউ তাঁকে জানে না। হাজার লোকের সঙ্গে মিশিয়ে দাও, তাঁর চালচলন রীত-চরিত্র দেখে ঠিক তাঁকে আমি বেছে বের করে দেব। শোন বড়বউ, বলি তা হলে। অন্যমনস্ক হয়ে লিখে যাচ্ছি—তার মধ্যে ইরার গলা পেয়ে অনেক দিন মনে হয়েছে, রামনিধি যেন কথা বলে উঠলেন। আমাদের মেয়ে —কিন্তু অতখানি জোর আর অমন সাহস যে-সে মেয়ের হয় না। কী শক্ত মুঠোয় সংসারের হাল চেপে ধরল, তাই তো ঐ এক খেয়াল নিয়ে এত বছর নিশ্চিন্তে আমি মেতে থাকতে পেরেছি।

সরমা অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, আজকে খেয়াল বলছ, আমারই গালাগালি ঘুরিয়ে শোনাচ্ছ তুমি। তা সে যাই হোক—মেয়ে নিয়ে চুপিচুপি গাঁয়ে সরে যাবে, সেই জন্যেই কি এতকালের কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে দিলে ?

আমার কাজ আমি করলাম। পাত্রপক্ষের দাবি কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিইছি। এবারে যা-কিছু ওদেরই করবার কথা। শহরে আমার কাজ নেই, আর লাইব্রেরিতে যাব না। তার পরেও এইখানে ওদের কেনা বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে পড়ে থাকা—না বড়-বউ, আমারও মন সায় দিচ্ছে না।

ইরা আবার এসে বলল, বাঃ রে, এখনও গল্প করছ মা ? বাবাকে তুমি ডাকতে এসেছিলে খাওয়ার জন্য—গল্পে গল্পে ভুলে বসে আছ। গল্পে বসলে তোমার যদি কিছু মনে থাকে।

এ মেয়ের ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। কে বলবে, এই একটু আগে ঝড় তুলে দিয়ে সে এখান থেকে চলে গিয়েছিল।

পরের দিন সকালবেলা অরুণাক্ষ কড়া নাড়ল। দরজা খুলে দিল ইরাবতী। দিয়েই সরে যায় না, সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে রইল।

ভাব দেখে অরুণাক্ষ হকচকিয়ে যায়। এ সময়টা কোনদিন সে বাড়ি থাকে না। বলল, আপনি আজ বেরোন নি ?

ইরা বলে, এক ছাত্রীর পরীক্ষা হয়ে গেল। আর শোভার বোনকে এমনি ছেড়ে দিয়ে এসেছি, আর পড়াব না। সেই যে শোভা—যাদের বাড়ি আপনার সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল। এখন তো শোভারই সঙ্গে আপনার বিয়ে—ওর বোন তাই বলছিল।

অরুণ ঘাড় নেড়ে বলে, বিয়ে হতে যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু ওঁদের ওখানে নয়।

ও—বলে ইরাবতী নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকাল।

এখন ভাব দেখাচ্ছেন যেন কিছুই জানেন না—কোন খবর রাখেন না আপনি।

আপনার বিয়ের খবর আমায় জানতে হবে কেন ?

অরুণাক্ষ হেসে বলে, বিয়ে কি আপনারও নয় ?

ইরা একটু চুপ করে থেকে তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, আপনাদের অনেক দয়া। কিন্তু আমাদের সম্পর্কে আর দুশ্চিন্তা করবেন না, দোহাই !

অরুণ চমকিত হয়ে বলল, এমন কথা বলছেন কেন ?

কাজকর্ম তো চুকে গেছে। কাশীশ্বরের কাগজপত্র সমস্ত নিয়ে গেছেন, আবার কেন ? আপনারা বড়মানুষ—ঘরবাড়ি একদিন গিয়ে চোখে দেখে এসেছি। আমাদের গরিব গৃহস্থালীর মধ্যে হুট করে এসে ঢুকলে লজ্জায় পড়ে যাই।

কি বলছে ইরাবতী, কিছুই যেন অরুণের মাথায় ঢোকে না। হতভম্বের মতো ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বলে, আমায় চলে যেতে বলছেন ?

ভদ্রলোককে তাই বুঝি বলা যায়। আপনি তো বোঝেন সব, মুখ ফুটে বলতেই বা কেন হবে বলুন।

এর পরে আর থাকা চলে না। কিন্তু অরুণাক্ষ ফিরে যায় কেমন করে? সুহাসিনী পাঁজি দেখিয়ে দিনক্ষণ ঠিক করে দিয়েছেন, অম্বুজাক্ষ আত্মীয়কুটুম্ব নিয়ে ঐদিন আশীর্বাদ করে যাবেন। মাঝে আছে চোদ্দটা দিন। সেই আনন্দের খবর দিতে এসেছে। খবর শুনে শাঁখ বাজবে, উলু দেবে, আনন্দের সোরগোল পড়ে যাবে—কত কি ভেবে এসেছে অরুণাক্ষ—আর দেখ কাণ্ড খেয়ালি মেয়ের, দুয়োর আটকে কোন্দল করতে এসে দাঁড়িয়েছে। বলুকগে যা খুশি! কূলে এসে ভরাডুবি হবে ওর এই সব ঝগড়ার কথা কানে নিতে গেলে।

মুখ মলিন করে বিষণ্ণ স্বরে অরুণ বলে, আমার দেখলে এমন অগ্নিমূর্তি হয়ে ওঠেন কেন বলুন তো।

ইরা বলে, সে ক্ষেত্রে দেখা না দেওয়াই উচিত।

আপনি একা নন এ-বাড়িতে। মেসোমশায় আছেন—তিনি আপনাদেরই শুধু নন, সারা দেশের আপন-জন। আমি ইতিহাসের ছাত্র—দিকপাল ঐতিহাসিকের কাছে বসতেই হবে মাঝে মাঝে এসে।

বাবা আর ইতিহাসের কেউ নন। সে ব্যাধি আপনারা নিরাময় করে দিয়েছেন। আপনাদের মরণকাঠি—কাশীশ্বরের কাগজপত্র নিয়ে নিয়েছেন আপনি। আর ভাবনা কি, কিসের ভয়ে এখন ভবে আসবেন?

অরুণাক্ষ বলে, সে কাগজপত্র আমায় ডেকে ইচ্ছে করেই দিয়েছিলেন মেসোমশাই। আমরা চাই নি। দরকার হলে আবার সমস্ত ফিরিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

ব্যঙ্গের হাসি হেসে ইরা বলে, সে কি! সর্বনেশে দলিলগুলো পুড়িয়ে ফেলেন নি, রেখে দিয়েছেন যত্ন করে?

এবারে অরুণ উত্তেজিত হয়ে বলে, মেসোমশাইর মতন না হই—আমিও ইতিহাস নিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করি, এটা মনে রাখবেন। দেহের অঙ্গ কেটে দিতে পারি, কিন্তু কাগজপত্র আগুনে পোড়ানো—সে কাজ আমাদের দিয়ে হয় না।

ইরা বলে, আগুনে পুড়ল কি সিন্দুকে পচল, আমাদেরও শুনে লাভ নেই। আপনাদের ঘরের জিনিস ঘরে ফিরে গেছে—আপনারা নিশ্চিন্ত, আমরাও। অনেক হয়ে গেছে—করজোড় করছি আপনার কাছে, আর অপমান করবেন না আমাদের।

অপমান?

হ্যাঁ তাই। আমার বাপ-মায়ের কন্যাদায় উদ্ধার করতে এসেছেন। কিন্তু চেয়েছিলেন কন্যা নয়—কাশীশ্বরের কলঙ্কমোচন। দায়-উদ্ধারটা হল কাগজপত্র ফিরে পাওয়ার দাম। অথবা বলতে পারেন ঘুস। বড্ড চড়া দাম—জেনেশুনে মানুষের জ্ঞানের ঘরে সিঁদকাঠি চালানো। কিন্তু জেনে রাখুন, কাগজপত্র দান করা হয়েছে আপনাদের উপর করুণা-পরবশ হয়ে। কাশীশ্বরের মতন আমরা ঘুস খাব না। স্বচ্ছন্দে আপনি চলে যান, কোন দায়দায়িত্ব নেই।

কান্না চাপতে চাপতে ইরা ছুটে পালাল। কোন ঘরে গিয়ে অশ্রুর বাঁধ খুলে দিয়েছে। স্তম্ভিত অরুণাক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। পথ ছেড়ে দিয়ে গেছে ইরাবতী, কিন্তু বাড়ির মধ্যে অমনি করে একজন কাঁদছে, সে গিয়ে এমন সময় প্রস্তাব তোলে কেমন করে? চোদ্দ দিন রয়েছে হাতে, ভেবে-চিন্তে দেখা যাক। যা বলে গেল, নিতান্ত মিথ্যা তো নয়—লজ্জা হচ্ছে, ঘৃণা হচ্ছে নিজের উপর। পায়ে পায়ে সে ফিরে চলল।

পঞ্চানন করিৎকর্মা ছেলে, কৃতান্তর কাছে শিক্ষা বৃথা হয় নি, পাঁচ দিনের দিন সে কলকাতায় ফিরে এলো। ঠিকঠাক করে এসেছে। মণিরামপুরের লোকে পথ তাকিয়ে আছে, বিশেশ্বর হেন গুণীজনকে গাঁয়ে পাবার জন্য। ওই গ্রামে আদিবাস, ওইখানে আবার গিয়ে থাকবেন— এর চেয়ে আনন্দের কথা কি? নিজের জোরে গিয়ে বসবাস করবেন।

ভিটের উপর আশশ্যাওড়া-ভাঁট-শেয়াকুলের জঙ্গল। জঙ্গল কাটতে পঞ্চানন লোক লাগিয়ে দিয়ে এসেছে। দেখাশুনা করছে সতীশ। চাষীপাড়ার মধ্যে মাতব্বর সতীশ। এত বড় মানুষ কলকাতা ছেড়ে তাদেরই পাড়ার মধ্যে আসছেন, সারা গ্রাম কানা করে তাদের পাড়া জাঁকিয়ে উঠবে—সতীশের সেজন্য উৎসাহের অবধি নেই। আপাতত ছ-চালা চৌরিঘর তোলা হবে একখানা, আর রান্নাঘর। এবং ইতিমধ্যে যদি একটা বকনা-গরু কেনা সম্ভব হয়, তালপাতার ছাউনি দিয়ে গোয়ালঘর তুলতে হবে আমড়াতলায়। গরুর খোঁজখবর করছে। যতদিন এ সমস্ত না হচ্ছে, সতীশ তার বাইরের আটচালা ছেড়ে দেবে—ওঁরা এসে উঠুন সেখানে। ঘর তোলার আগেভাগে চলে আসুন, নিজেরা দেখেশুনে পছন্দমতো নির্দেশ দেবেন। যা করবার সতীশই বুক দিয়ে পড়ে করবে, ওঁদের কোন দায়ে ঠেকতে হবে না।

তাই ঠিক হল। তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো, না গিয়ে যখন উপায় নেই। সিকি পয়সা আয় নেই, কিসের জন্য তবে শহরের উপর পড়ে থাকা? যত দিন যাবে ততই ধারদেনা বাড়বে, লোকের কথা শুনতে হবে। পঞ্চানন কোমর বেঁধে লেগেছে। পুরো সংসার বয়ে নিয়ে যেতে হবে দূর-দুর্গম পাড়াগাঁ জায়গায়। মালপত্র বাঁধা-ছাঁদা করা, স্টেশনে নিয়ে তোলা—ট্রেন থেকে নেমে আবার বাসের ব্যাপার আছে। এত বারের উঠানো-নামানো। তার উপরে বিশেশ্বর আছেন, তিনিই তো একটা মালের সামিল। মাল সামলানোর

চেয়ে তাঁকে সামলানো বরঞ্চ বেশি মুশকিল। নিজের মতলবে একটা কিছু করে বসলেন, অথবা চলে গেলেন কোন একদিকে—তাঁর পিছনেই সর্বক্ষণ একটা লোক লাগে। পঞ্চানন তাই এঁদের সঙ্গে মণিরামপুর অবধি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কৃতান্ত একদিন এসে দেখা করে গেল। চটেছে সে দস্তুরমতো। কোন দরকার ছিল না মূল্যবান কাগজগুলো বেহাত করবার। যে সুযোগ ঈশ্বর হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছিলেন, অবহেলায় তা ছুঁড়ে দিলেন বিশ্বেশ্বর।

হাত-মুখ নেড়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে বিশ্বেশ্বরকে কথা শোনাচ্ছে। এ-ও জানে, বারাণ্ডায় সরমা কান পেতে শুনছেন। বলে, চলে যাওয়ার কোন গরজ ছিল না দাদা। ছেঁড়া পচা কখানা কাগজ,—আসলে কল্পতরু। নাড়া দিলেই টাকা—বিশেষ এই ইলেকশনের মুখে। রাজার হালে থাকতে পারতেন। আপনার লিখতে লজ্জা হল তো আমায় দিলেন না কেন? একবার ভাসা-ভাসা একটু দেখে নিয়ে যে নমুনা ছেড়েছিলাম, অম্বুজ ডাক্তার তারই ঠেলায় ছেলে বগলদাবায় নিয়ে ছুটে এসে পড়ল মেয়ে পছন্দ করতে। গোলমাল করলে ডাক্তারকে চিরকালের মতো বসিয়ে দিতে পারতাম। তাতেও টাকা—ইলেকশনে মজা কত!—সে টাকা আসত উল্টো পথ দিয়ে। ডাক্তারের ছেলে কোন ছার—টাকা ছাড়লে কত কত লাটের বেটা মাথা খোঁড়াখুড়ি করত আপনার মেয়ে ঘরে নেবার জন্য। সমস্ত হত, কিন্তু আপনি মাটি করে বসে আছেন। এত বড় কাজটা করবার আগে আমায় একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করলেন না?

বিশ্বেশ্বর একটি কথাও বলছেন না, পাথর হয়ে শুনে যাচ্ছেন। বলবার কী-ই বা আছে! অপরাধে লজ্জায় মরমে মরে আছেন তিনি। কৃতান্ত যা বলছে, ওসব কানে নেবার মতো নয়। ভাবছেন,

সত্যকে হত্যা করলেন তিনি। 'ভারতে ইংরাজ'-এর একটি অধ্যায়ের খাঁটি বৃত্তান্ত পৃথিবীর মানুষ কোন দিন জানতে পারবে না। এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।

রাগের বশে বিস্তর কথা শুনিয়ে কৃতান্ত চলে গেল। দায়ে-বেদায়ে এই একজন বড় সহায় ছিল, সে-ও বিগড়ে গেছে। ইতিহাসের পথে আসা কী ঝকমারি, হাড়ে-হাড়ে এখন বুঝছেন। আর দশটা কেরানির মতন নির্গোলে কলম পিশে গেলেই দিব্যি জীবনটা কেটে যেত।

আবার এক সন্ধ্যাবেলা অরুণাক্ষ এসে পড়ল। এতদিনের মধ্যে ইরাবতীর মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে—সেদিন অত কটুকথা বলে ফেলে অনুতাপ হচ্ছে না কি মনে মনে? ঢুকে পড়ে অবাক। সরমাকে বলে, এ কি মাসিমা, জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা—যাচ্ছেন নাকি কোথাও?

সরমা বললেন, সেই যে আমায় বলেকয়ে চলে গেলে, এদ্দিনের মধ্যে আর দেখা নেই। বোসো বাবা ভিতরে এসে। এসে পড়েছ, খুব ভালো হয়েছে। কাকে দিয়ে তোমায় খবর পাঠাব, তাই ভাবছিলাম।

এসেছিলাম আরও একদিন মাসিমা। তা ইরা দেবী এমন রেগে গেলেন, দরজা থেকে ফিরে যেতে হল। আপনা অবধি আসতে ভরসায় কুলাল না।

সরমা বলেন, অনেক কথা জমে আছে বাবা। মেয়েয়-বাপে কি বুঝ বুঝে আছে, ওদের মতিগতির থই পাইনে। কেমন ভাবে তাকায় আমার দিকে, মহাপাপী যেন আমি। দিনরাত্রি ঐ সৃষ্টিছাড়া বই লেখা হচ্ছিল, আমিই যেন সব বন্ধ করে দিয়েছি।

সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে অনেকক্ষণ কাটল। চোখের জল মুছছেন সরমা ঘনঘন। ইরা বাড়ি নেই; আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া এবং পাড়াগাঁয়ের অত্যাবশ্যক এটা-ওটা কেনা—এই সমস্ত চলছে ক-দিন ধরে। কতক্ষণে ফিরবে, কে জানে?

বিশ্বেশ্বরকে অরুণ প্রণাম করে এলো। তার পরেও গড়িমসি করছে। দেখা হতেই হবে ইরার সঙ্গে। যত দেরি হোক, সে বসে থাকবে। নির্বাসন নিয়ে চলে যাচ্ছ, তার আগে শুনে যেতে হবে আমার কটি কথা। যত লাঞ্ছনা করো, আজকে আমি ছাড়ব না।

অবশেষে দেখা দিলেন দেবী। একা নয়, উত্তরসাধক পঞ্চাননটি সঙ্গে। একবোঝা জিনিস বয়ে আনছে পঞ্চানন—দু-হাতে দুটো নতুন বালতি, হেরিকেন, বালতির খোলে অনেক পোঁটলাপুঁটলি। পঞ্চানন বলে, আছেন ভালো অরুণাক্ষবাবু? কতক্ষণ এসেছেন?

হুঁ—বলে অরুণ সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

ইরাবতী বলে, মার কাছে জিনিসগুলো দিয়ে ফর্দটা আর একবার মিলিয়ে দেখুন পঞ্চানন-দাদা, কোন-কিছু বাকি থাকল কিনা। আপনার বড্ড কষ্ট হয়েছে—নয়তো আর একবার বেরিয়ে চাঁদনি থেকে মশারিগুলো কেনা যেত।

পঞ্চানন বলে, কষ্ট আপনারই তো বেশি। সেই দুপুরবেলা থেকে ঘোরাঘুরি করছেন—আমার কি, অফিসের পর একটুখানি এই ট্রামে করে বেড়িয়ে আসা। মশারি আজ থাক, তার জন্য আপনাকে যেতে হবে না। মাপ জানা আছে, আমি কাল নিয়ে আসব।

জিনিসপত্র নিয়ে পঞ্চানন ভাঁড়ারের দিকে চলল। এ সংসারের মধ্যে রীতিমত প্রতিষ্ঠা জমেছে তার। নামের সঙ্গে দাদা জুড়ে ডাকছে ইরাবতী। বেশ, ভালো। কি আর বলবে অরুণাক্ষ—এ অবস্থায় নিঃশব্দে চলে যাওয়াই বোধ হয় উচিত ছিল।

ইরা অরুণের দিকে চেয়ে বলল, কি ছুটোছুটি দেখছেন তো? একলা হাতে সমস্ত করতে হচ্ছে।

কেন, পঞ্চানন আছে—

তা আছেন। যথেষ্ট করেছেন উনি। তবু ওঁর অফিস রয়েছে, সময় আর কতটুকু পান। অফিসে ছুটি নিয়ে যাচ্ছেনও মণিরামপুর অবধি।

একটুখানি থেমে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, শুনেছেন বোধ হয়, পরশু আমরা চলে যাচ্ছি। আপনি না এলে কালকের মধ্যে যেমন করে হোক দেখা করে আসতাম।

অরুণাক্ষ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি বলে, অনেক দয়া।

ক্ষমা চাইতে যেতাম। যত-কিছু বলেছি, যে ব্যবহারই করে থাকি, আপনি ভুলে যান। চলে যখন যাচ্ছি, আমার উপরে রাগ পুষে রাখবেন না।

অরুণ বলে, কিন্তু না গেলেই কি চলত না? বাড়িটা আমরা কিনে ফেলেছি, তাই কি তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার কারণ?

ইরা বলে, একটা কারণ বই কি! নড়বড়ে ছোট্ট বাড়ি ভেঙে ফেলে নতুন কায়দায় বড় করে তৈরি করুন—আমরা কেন বাধা হয়ে থাকব? খালি করে দিয়ে চলে যাচ্ছি।

ভাঙা হবে না। শুনে রাখুন, যেমন আছে ঠিক তেমনি থাকবে। ঘরগুলো মেরামত হবে শুধু, চুন টানা হবে, বাইরের দেয়ালগুলোয় একটু-আধটু রঙের পোঁছ টানা হতে পারে। এই। তা-ও হত না আপনাদের আপত্তি থাকলে। বাবা নয়, আমার মা কিনছেন এ-বাড়ি। কেনা হচ্ছে আপনাদের সুবিধার জন্যে।

আরে সর্বনাশ, বেঁফাস কথা হয়ে গেল যে অরুণাক্ষ! ফণিনী ফোঁস করে আবার ফণা তুলেছে।

তা জানি। সেই জন্যে এমনি করে ছুটে পালাচ্ছি—

কেন পালাচ্ছেন বুঝতে পারিনে। ভাড়া দিয়েই থাকতেন যেমন ধারা বরাবর দিয়ে আসছেন। বাড়িটা এখনকার এই মালিকের থাকুক কিম্বা আমাদেরই হোক, তফাতটা কি তার মধ্যে?

ইরাবতী তীব্র স্বরে বলে, ভয় করে অরুণবাবু। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘে ভয় পেয়ে যায়। আপনাদের বাড়িতে থাকার বিপদ আছে। কাশীশ্বরের বাড়ি থাকতে গিয়ে রামনিধি ফাঁসি গেলেন। আমরা থাকলে আবার কলে-কৌশলে কি ঘটাবেন, কে বলতে পারে?

অরুণাক্ষ ধৈর্য হারিয়ে ফেলে এতক্ষণে। বলে, কিন্তু যে গাঁয়ে যাচ্ছেন সে-ও আমাদের এলাকা।

নিশ্চিন্ত হন। এলাকার বাইরেই খুঁজেপেতে একটু জায়গা নেব। ঘর তোলা এখনো হয় নি, ভাল করে বাছবিচার করে তবে ভিটে ঠিক করব। গোটা জেলা ধরে আপনাদের এলাকা নয়।

মুখ ফিরিয়ে ইরা দুমদুম করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। মোলায়েম সুরে ক্ষমা চাচ্ছিল গোড়ায়। কোন সুলগ্নে দু-জনের প্রথম দেখা— ভালোমন্দ যা-ই দিয়ে শুরু করুক, শেষ অবধি তুমুল হয়ে দাঁড়াবে।

সকালবেলা। কলকাতা ছেড়ে বিশ্বেশ্বররা গাঁয়ে এসে পৌঁছলেন। রামনিধি ও কাশীশ্বরের পুরানো জায়গা। হাটখোলায় পাকা-রাস্তার ধারে তাঁদের নামিয়ে দিয়ে বাস চলে গেল। সেই ক-মাস আগে এসেছিলেন, সেদিন কত মানুষ জমেছিল অভ্যর্থনার জন্য, কী বিপুল সমারোহ! আজকে কাকস্য পরিবেদনা। হাটবার নয়—সারবন্দি চালাগুলো হা-হা করছে; কয়েকটা বাঁধা দোকান আছে, সেখানেই যা দু-পাঁচটা মানুষ। দোকানের ঝাঁপ খোলাখুলি করছে কেউ; কেউ বা আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙে দাঁতন ঘষছে টিউবওয়েলের ধারে বসে; কালকের হাটে ধানের বিষম দর উঠেছিল—তাই নিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সশব্দে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করছে কজনে মিলে। রাস্তার উপর চারজনে এঁরা বসে আছেন—চোখ তুলে দেখেছে হয়তো একবার দু-বার, কিন্তু আমল দিচ্ছে না। এমন তো হামেশাই হচ্ছে—বাসের পথ এটা, অনেক মানুষের উঠানামা। সে যা হয় হোক, কিন্তু সতীশের তো হাজির থাকবার কথা। সে এসে পৌঁছয় না কেন?

বলতে বলতেই দেখা গেল সতীশকে। একা নয়, সঙ্গে দুই ভাইপো। জোয়ান-যুবা ভাইপোদের নিয়ে এসেছে মাল বওয়া-বয়ির ব্যাপারে। মোটরবাস সকাল সকাল এসে পড়েছে আজ—প্যাসেঞ্জার বোঝাই হয়ে গেল বলে সদর থেকে ঘড়ি ধরে ছেড়েছে। মফস্বল জায়গায় ঘড়ি ধরে চলার রীতি নয়। আবার মালপত্র আছে বলে সতীশও নিয়ে আসছে আজ গরুর গাড়ি। সেই গরুর

গাড়ি নিয়ে মুশকিল। ছই খোলা ছিল—গাড়োয়ানকে ডেকে তুলে ছই বাঁধাছাদা করে বেরুতে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল।

চতুর্দিক তাকিয়ে ইরা জায়গাটা বুঝে নিচ্ছে। ট্রেনে ভিড় ছিল, সমস্ত রাত্রি বসে এসেছে, চোখের দু-পাতা এক করতে পারে নি; তার উপর এতক্ষণ উবু হয়ে এই পথের ধুলোয় বসে থাকা। একটা দিনের মধ্যেই যেন সে অর্ধেক হয়ে গেছে। বিশ্বেশ্বর-সরমারও অমনি অবস্থা—মুখের দিকে চাওয়া যায় না। এমন কি পঞ্চানন হেন মানুষ, কোন কষ্টকে যে আমলের মধ্যে আনে না—তারও ঝিমুনি ধরেছে, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পথ হাঁটছে।

সতীশ বলে, পথ বেশি নয়। ঐ বটগাছগুলো—ওরই নিচে গাঙ। গরুর গাড়ি ওপারে রেখে এসেছি। গাঙটুকু পার হতে পারলে আর কষ্ট নেই।

এত জল! পঞ্চানন এই সেদিন এসেছিল, সে পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছে। বলে, এ যে এক সমুদ্দুর হয়েছে সতীশ। সাঁকো ছিল, সাঁকোর উপর দিয়ে পার হয়ে গেছি—তার কোন নিশানা দেখছিনে।

সতীশ বলে, কী বৃষ্টিটা হয়ে গেল ক-দিন ধরে! সাঁকোর বাঁশ জলের তোড়ে ভেসে গেছে।

পার হবার সময় সতীশ বুদ্ধি করে খেয়ানৌকো এপারের ঘাটে থাকতে বলে গিয়েছিল। তাই রক্ষা। ওপার মুখো রওনা হয়ে গেলে বিস্তর ক্ষণ লেগে যেত হাঁকডাক করে আবার এপারে নিয়ে আসতে। নৌকায় উঠেছে। এদের দল বাদে পারার্থী আরও জন দশেক। হু-হু শব্দে জল ডেকে ছুটেছে। এক মাঝি ও দুই দাঁড়ি প্রাণপণে বেয়েও নৌকো সামাল দিয়ে পারে না। টলমল করছে নৌকা, পড়ে যাবার ভয়ে ইরাবতী গুড়োর কাঠ এঁটে ধরেছে।

পঞ্চানন বলে, বর্ষা পড়লেই বুঝি এমনি হয় সতীশ ?

সতীশ বলে, কি বছর হয় না। এবারে হয়েছে। তিন দিন আগেও ঠিক এই রকমটা হয়েছিল। হঠাৎ ঢল নেমে আসে। লোকের কষ্টের পার থাকে না।

হেসে বলে, আর কষ্ট থাকছে না, এবারের এই মরশুমটা যা গেল। পাকা পুল হয়ে যাবে।

নৌকার মাঝি কথা বলে উঠল। ঘাড় নেড়ে বলে, সে তো কতকাল ধরে শুনছি। চাঁদা তোলা হল সেবারে—টাকা-পয়সাগুলো বাবুদের গর্ভে গেল, তার কোন হিসাব হল না।

সতীশ বলে, এবারে নির্ঘাত। সরকার শর্ত দিয়েছে, অর্ধেক খরচা তুলে দিলে তারাই বাকি অর্ধেক দিয়ে পুল বেঁধে দেবে। চাঁদায় অত টাকা ওঠে না। অম্বুজ ডাক্তার একাই দিয়ে দিচ্ছেন। পাঁচ গাঁয়ের মাতব্বরের মুকাবেলা কথা দিয়ে গেছেন।

মাঝি বলে, ভোটের মুখে অমন সবাই বলে। তিন কুড়ি বছর বয়স আমার, আজকের নই—অমন ঢের ঢের শুনেছি। কাজ ফতে হয়ে গেলে শেষটা এই কলা।

সতীশ হাসতে হাসতে বলে, বলেছ ঠিক। পাঁচপোতার সাধন মিত্তির তোড়জোড় করছে, সে-ও দাঁড়াবে। তারও ঐ কথা, ভোট আমাকে দিও—পুল বানিয়ে দেব। পুল বানানোর জন্ম কাড়াকাড়ি পড়ে যাচ্ছে। তা আমরাও সেয়ানা হয়ে গেছি—মুখের কথায় হবে না, টাকাটা অগ্রিম ছাড়, তখন ভোটের বিবেচনা।

পঞ্চানন বলে, যারা ভোটে নামছে, কোমরের বল না বুঝে কি নামে তারা ? যে বিয়ের যে মন্তোর—টাকা ছড়াতে কেউ কসুর করবে না। দু-পক্ষই যদি অগ্রিম দাখিল করে, তা হলে কি করবে তোমরা ?

সতীশ বলে, কে কোন দরের মানুষ তখন সেই হিসাব। বংশের হিসাব ধরে অম্বুজ ডাক্তারের পাল্লাই ভারী। খামনিধি সরকারের একেবারে আপন লোক হলেন কাশীশ্বর।

বিশ্বেশ্বরকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, আমাদের এই বুড়ো কর্তামশায় দাঁড়ালে সকলের উপরে যেতেন। এঁর ঠিক নিচেই অম্বুজ ডাক্তার—

নদীর মাঝামাঝি এসে গেছে। মাঝি হঠাৎ খবজি মেরে নৌকা বেঁধে বলে, নামুন—

ইরাবতী আঁতকে ওঠে, বলো কি? সাঁতরে যাব নাকি? সাঁতার আমি জানিনে।

সতীশ বলে, জোয়ার বলে এমনি দেখাচ্ছে। সাঁতার দেবে কি—জল সব জায়গায় হাঁটু ভরও হবে না। ভাঁটার সময় কাদা বেরিয়ে পড়ে। নৌকো আর এগুবে না। হাঁটা ছাড়া গতি নেই।

সে যে কী দুঃখের যাত্রা—ইরাবতী কেঁদেই ফেলে বুঝি বা। এতখানি কে বুঝেছে—তবে তো বর্ষাকাল কাটিয়ে পুজোর পরে আসা যেত। ভাল হত সকল দিক দিয়ে—নতুন ধান-চাল ওঠার সময় তখন। গুড়-পাটালি, কলাই-মুসুরি। দুধের প্রাচুর্য—পাড়াগাঁ অঞ্চলে বেশির ভাগ গাইয়ের বাছুর হয় শীতের প্রথম মুখে। চারিদিক শুকনো খটখটে, এসে দিব্যি গোছগাছ করে নেওয়া যেত। বর্ষাকালের এমন অবস্থা আন্দাজ করতে পারে নি। তার উপরে সতীশ এক জরুরি পত্র লিখে জোর কদমে যেন ছুটিয়ে নিয়ে এলো।

জল ভাঙতে ভাঙতে বিশ্বেশ্বর একবার বলে উঠলেন, বাবা!

ইচ্ছে করে নয়, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। আর পেরে উঠছেন না। সতীশ তাঁর কাঁধের নিচে হাত বেড় দিয়ে ধরে সন্তর্পণে নিয়ে

চলেছে ; পঞ্চানন আর একদিকে। ইরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে, পায়ে লাগল নাকি ?

উঁহু !—জল ছপছপ করে বিশ্বেশ্বর চলেছেন তেমনি। মায়ের দিকে ইরাবতী সাহস করে তাকাতে পারে না। না তাকিয়েও টের পায়, অগ্নিদৃষ্টি জ্বলছে তার উপরে। হতভাগা মেয়ে ইচ্ছে করে সব পণ্ড করল। রাত পোহালে কোথায় অভিষেক, তা নয় শহর ছেড়ে সকলে বনবাসে চলেছেন।

গরুর গাড়ি সতীশের উঠানের ধারে ছড়কোর সামনে থামল। জোয়াল থেকে গরু খুলে ঘাসে বেঁধে দিচ্ছে। সতীশ সামনে এসে করজোড়ে বলে, নেমে আসুন বুড়ো কর্তা। আসুন মা। এসো দিদি।

ইরা গরুর গাড়িতে ওঠে নি, হেঁটে এসেছে সতীশদের সঙ্গে সঙ্গে। সে বলল, আমাদের বাড়িটা কত দূর ?

ওই তো—ওই যে ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছ দেখা যাচ্ছে—

ঘর বাঁধা হয়ে যায় নি ?

পঞ্চানন আগ বাড়িয়ে বলে, মুখের কথায় কি ঘর হয়ে যায় ? অনেক হাঙ্গামা। সেই তো দেখে গেলাম সতীশ রুয়ো কেটে জলের মধ্যে পচান দিয়েছে, আটন চাঁচছে। এত শিগগির তবে আর কেমন করে হয় ?

সতীশ বলে, আজ্ঞে না, ঘর-রান্নাঘর সমস্ত হয়ে গেছে। রুয়ো জলের মধ্যে রাখতে দিল কই ? সহদেব গোমস্তার বাঁকা-বাঁকা কথা, ভরসা করতে পারলাম না—বেশি জনমজুর লাগিয়ে ঘরের কাজ তাড়াতাড়ি সারা করতে হল। সহদেবের ভাবগতিক দেখেই আপনাদের আসবার জন্ত অত তাগিদ দিয়েছি।

হি-হি করে হাসে সতীশ : মজাটা করলাম কি! চাল বেঁধেছি, বেড়া বানিয়েছি—সমস্ত আমার বাড়ির উঠোনে বসে। আসল বৃত্তান্ত জানতে দিই নি, আমারই এক নতুন ঘর হচ্ছে যেন। গোলপাতা কিনে ছাওয়াও হয়ে গেল নতুন চাল। বাকি রইল খুঁটি পুঁতে চাল কখানা তুলে মটকা মেরে দেওয়া। রাতদুপুরে ভিটের উপর নিয়ে গিয়ে টুক করে সেটা সেরে ফেললাম। ব্যস্, যা করবার কর্ তোরা এখন—সকালবেলা চক্ষু মেলে দেখে হাত কামড়ে মর্। হল তাই। সহদেব বলে, এত কাণ্ড কখন করলে, ঘুণাক্ষরে টের পেলাম না। আমি বললাম, ঘর তো আজকের নয়—সেই সেবার এসে বুড়ো কর্তা মশাই ঘর বেঁধে গিয়েছিলেন। চোখ বুঁজে পথ হাঁট নাকি, এত কালের মধ্যে নজর পড়ে নি? কথা শুনে চলে গেল সুড়সুড় করে। কিন্তু বিশ্বাস নেই, আমি লোক মোতায়েন করে দিয়েছি। আমার দুই ভাইপো রাত্তিরবেলা দলবল নিয়ে শুয়ে থাকে ওখানে। চুপিচুপি এসে ঘরে আগুন না দেয়।

ভাইপো দুটিকে উদ্দেশ করে সতীশ বলে, এটা কি করলি সোনামাণিক বাপধনেরা? জিনিসপত্তোর অমনধারা বাইরে রাখে? মানষের নজর পড়ে যাবে, ঘরের ভিতরে তুলে রাখ্। আপনারাও ঢুকে পড়ুন পঞ্চাননবাবু। দিনমানে দেখা দিয়ে কাজ নেই। পাড়ার লোকদেরও কিছু বলি নি। এঁরা সব এসে গেছেন—মানুষ তাহলে এতক্ষণে ভেঙে পড়ত। কিন্তু জানতে দিইনি কাউকে।

সরমার মুখ পাংশু হয়ে গেছে। পঞ্চাননকে ডেকে বললেন, এসব কি? কোন্ গণ্ডগোলের ভিতর এনে ফেললে বল দিকি বাবা?

পঞ্চানন বলে, গণ্ডগোল কোথা? সে রকম কিছু হলে এদ্দিন চুপচাপ থাকত বুঝি? অর্থবল—লোকবল অম্বুজ ডাক্তারের কম নয়—

যত পাহারাই দিক নতুন ঘর ভূতে উড়িয়ে গাঙে নিয়ে ফেলত। কোন রকম তার নিশানা হত না। ওসব কিছু করবে না ওরা।

ইরা প্রশ্ন করে, কিন্তু আমাদের ভিটেয় আমরা ঘর বাঁধব, ওদের গোমস্তার তা নিয়ে মাথাব্যথা কেন?

পঞ্চানন বলে, রামনিধির ভিটে আর ধান-জমি খাজনার দায়ে নিলাম হয়েছিল, অম্বুজ ডাক্তারের তালুকের সামিল বলে ওঁরা কিনে নিলেন। কিনলেন ঐ পর্যন্ত, জঙ্গল হয়ে পড়েছিল। এই সেদিনও এসে দেখে গেছি। সহদেব বর্ধনের উপরে বিষয়সম্পত্তির ভার। কাজেই ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, তার একবার এসে আপত্তি জানাতে হয়। তাই এসেছিল—তার পরেই তো সামলে গেল। কলকাতায় নিশ্চয় চিঠিপত্র লিখেছিল, অম্বুজ ডাক্তার চেপে যেতে বলেছেন।

হেসে ফেলল পঞ্চানন। বলে, কিল খেয়ে কিল চুরি করা ছাড়া উপায়ও নেই। ভোটের খাঁড়া মাথার উপর ঝুলছে, রামনিধির ভিটে নিয়ে হাঙ্গামা করতে গেলে জামানত অবধি বাজেয়াপ্ত হবে। টাকা খোলাম-কুচির মতো ছড়ালেও রক্ষে হবে না। সতীশের মিথ্যে ভয় —যদ্দিন ভোট না হচ্ছে আপনারা একেবারে নিশ্চিন্ত।

ইরাও তা বুঝতে পারে। তা ছাড়া কাশীশ্বরের কাগজপত্র দিয়ে দেবার পরে সামান্য একটু জঙ্গুলে জমির জন্য আর তাঁরা কেন লাগতে আসবেন? তবু সতীশ ঘোরতর সাবধান। খাইয়েদাইয়ে প্রহর খানেক রাত্রে রাস্তা দিয়ে নয়—জঙ্গল ও সুঁড়িপথ ভেঙে এদের নিয়ে চলল। রাতটুকু শুয়ে পড়ে থাকবেন, সতীশের ভাইপোরা থাকবে, এদিক-সেদিক আরও মানুষ থাকবে। সকাল থেকে হাঁকডাক করে ঘরগৃহস্থালী চলবে। ভিটের উপর একবার চেপে বসতে পারলে তারপরে উঠিয়ে দেওয়া—সে হল অনেক কথার কথা, সহজে তা পেরে উঠবে না।

সেই তেঁতুলগাছ। অনেক পুরানো—চার-পাঁচটা মানুষ লাগে গাছের গুঁড়ি বেড় দিয়ে ধরতে। রামনিধির সময়েও ছিল এই গাছ—এই এক গাছ রামনিধি সরকারের কাজকর্মের সাক্ষি। এমাঠ-ওমাঠ এগ্রাম-সেগ্রাম ঘুরে ক্লান্ত পায়ে ফিরে আসতেন এই তেঁতুলগাছের ছায়াঙ্ককারে, নীলকর সাহেবদের নিয়ে শলাপরামর্শ হত। তারপরে রামনিধি ফাঁসি গেলেন, কালতরঙ্গে ছিটকে পড়লেন তাঁর পরিজনেরা। এই বিশ্বেশ্বর ছাড়া আরও এক পরিবার আছে, তাঁরা ছোটনাগপুরের খনি অঞ্চলে ঘরবাড়ি বানিয়ে কায়েমি বসবাস করছেন। আর বিশ্বেশ্বর পড়ে ছিলেন কলকাতার সেই গলির গলি, তস্য গলির ভিতরে। বংশের দুই শাখায় দৈবাৎ যদি দেখা হয়ে যায়, কেউ কাউকে চিনবেন না।

তেঁতুলতলাটুকু পরিচ্ছন্ন, চতুর্দিকে ভাঁট-আশশ্যাওড়া-শেয়াকুলের কসাড় জঙ্গল। বাঘ পালিয়ে থাকতে পারে এমনি গতিক। পারে কেন বলছি, সত্যি সত্যি এক কেঁদোবাঘ পালিয়ে ছিল সেবার। হাড়িপাড়ায় একজনের গোয়াল থেকে বাছুর মেরে এইখানটায় টেনে এনেছিল—তাই টের পাওয়া গেল। ভিটার এদিকটাও ঠিক অমনি ছিল, সে জঙ্গল কেটে দুটো ঘর উঠেছে সামনাসামনি। শোবার-ঘর ছ-চালা, দুটো দাওয়া এপাশে ওপাশে। রান্নাঘরটা অতি ছোট, দোচালা বাংলা-ঘর। একপাশে রান্না হবে; আর এক পাশে মাচা বাঁধা হয়েছে—রান্নার কাঠকুটো মাচার উপর, মাচার নিচে হাঁড়িকুড়ি।

সতীশ ভরসা দিয়ে বলে, এক ছিটে জঙ্গল থাকতে দেব না দিদি। তেঁতুলতলায় হবে গোয়াল, গোয়ালের সামনে হলুদ-ক্ষেত। পোড়ো জায়গায় হলুদ বড্ড ভাল হয়। একটা মাস সবুর করো—বাড়ির শ্রী দেখবে আর একরকম হয়ে যাবে। আর সে যাই হোক—এমন খাসা ঘর হয়েছে, মজবুত কাঠের দরজা—ভয় পাবার

কি আছে? দুয়োরে খিল এঁটে নাক ডেকে ঘুমোওগে। ভাই-পোরা দাওয়ায় শোবে, আমিও একবার-দুবার উঠে উঠে দেখে যাব।

কিন্তু ভয় ঘোচে না ইরাবতীর। বাঁশবাগান অদূরে। ভুবনের যত অন্ধকার জমেছে কি ঐ বাঁশবাগান আর তেঁতুলতলায়? নিশিরাত্রে আবার বৃষ্টি নামল, বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল জোলো বাতাস। ঘরের বেড়ায় বাতাসের ঝাপটা লাগে। ইরা চমকে চমকে ওঠে, উঠে বসে এক একবার। শতেক হাতের থাবা মারছে যেন বেড়ার ওধারে। বাঁশবাগানে আওয়াজ উঠেছে—ভূত-প্রেত বাঘ-শুয়োর চোর-ডাকাত—শরীরী-অশরীরী মানুষের সকল রকম আততায়ী তোলপাড় লাগিয়েছে যেন ঐ একটা জায়গায়। উঃ ভগবান, রাত পোহায়ে দাও তাড়াতাড়ি—দিনমান আসুক। দাঙ্গাহাঙ্গামা যা-ই করুক সহদেব গোমস্তা—সে সব দিনের আলোয় হয় যেন। শত্রুকে যখন চোখে দেখতে পাওয়া যাবে।

ভালো করে রোদ উঠবার আগেই সহদেব এসে পড়ল। হাঁটুভর কাদা, হাঁটুর উপর কাপড় তোলা, হন্তদন্ত হয়ে এসেছে। এসে ঝগড়া-বচসা নয়, উল্টো ব্যাপার—হায়-হায় করছে, এটা কি হল বলুন তো সরকার মশায়? সেবারে এলেন—কত মানুষজন আমোদ-স্ফূর্তি! বলিহারি সতীশের কাণ্ড—এত বড় মানুষটাকে পুরো দিন গাপ করে রেখে রাত্তিরবেলা চুপিসারে জঙ্গলপুরীতে তুলে দিয়ে গেল। জেলার মানুষ থুতু দেবে আমাদের মণিরামপুর গ্রাম ধরে।

গড়গড় করে বলে চলেছে, তার মধ্যে নিশ্বাস ফেলার ফাঁক দেয় না। বিশ্বেশ্বরকে ছেড়ে সরমার কাছে যায়: ঘটির দুধটা ঢেলে নিন মা। বাড়ির গাইয়ের দুধ—ভোরবেলা বাছুর ছেড়ে দিয়ে নিজ হাতে দুয়ে এনেছি। ভাবলাম, শহুরে মানুষ, সকালে

চায়ের অভ্যাস—যাই দুধটুকু দিয়ে আসি। বর্ষার এই ক'টা মাস দুধের বড় কষ্ট; দরও আগুন—তিন সেরের বেশি টাকায় দিতে চায় না। দশটা এগারটা থেকে বাজার বসে, বাজারে নিয়ে আসে। দুধ ওঠেও যৎসামান্য—আগে থেকে ওত পেতে বসে থাকতে হয়, কাড়াকাড়ি পড়ে যায় আসামাত্তোর। তা আপনাদের কিছু ভাবতে হবে না—লাগবে কি পরিমাণ সেইটে শুধু বলে দেবেন, দুধ আপনি ঘরে পৌঁছে যাবে। যখন যা দরকার হবে, একটা হুকুম ছেড়ে দেবেন আমায় মা, হুকুমের গোলাম-নফর বিবেচনা করবেন। এত বড় মানুষ এসেছেন—ছি-ছি, সারাটা দিন ঘরে লুকিয়ে রাখল আপনাদের—

অনেকক্ষণ এমনি বকর-বকর করে সহদেব চলে গেল। সতীশ পঞ্চাননের দিকে চোখ টিপে বলে, বুঝতে পারলেন ?

পঞ্চানন বলে, মিছে ভয় দেখিয়েছিলে সতীশ। লোকটি ভালো।

ভালো না কচু। এভিটের জঙ্গলে প্রথম কোপ মারতে তো রে-রে করে এসে পড়েছিল। আপনি যা বললেন, তাই সত্যি। উপর থেকে হুড়ো এসেছে। ভোট সামনে, তার উপর গ্রামবাসী সকলে এঁদের পক্ষে। সামনা-সামনি এখন কিছু করবে না।

মোটের উপর বোঝা যাচ্ছে, হাঙ্গামাহুজ্জুতের আশঙ্কা নেই, দিনগুলো শান্তিতেই কাটাবে। দু-চারটে দিন অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু পাড়াগাঁ রপ্ত হয়ে আসবে ক্রমশ। ইরাবতী ইতিমধ্যে একপাক এর-তার বাড়ি ঘুরে ভাব করে এসেছে। বিকালবেলা পাড়ার গিন্নিবান্নি অনেকে এসে সরমার নতুন গৃহস্থালী দেখে গেলেন। ভালোই থাকবেন এঁরা, পরশু-তরশুর মধ্যে পঞ্চানন কলকাতা ফিরতে পারবে, কোনরকম অসুবিধা হবে না।

মাস খানেক কাটল। আছেন ভালোই। সতীশ যে ভয় দেখিয়েছিল, সে সব কিছু নয়। খাসা আছেন। হাটখোলায় বিশ্বেশ্বরের একটা কাজও জুটেছে—হরিভূষণ মোড়লের দোকানে খাতা লেখার কাজ। দোকান ফলাও হওয়ার দরুন এবারে ইনকাম-ট্যাক্সের নোটিশ এসেছে। অতএব তাড়াতাড়ি নতুন খাতা বানানোর গরজ—যাতে খরচ বেশি, বিক্রি কম, লাভের অঙ্ক প্রায় শূন্য। ইনকামট্যাক্সের খাতা—এই বস্তুর নাম ব্যবসায়ী-মহলে। সতীশই কাজটা জুটিয়ে দিল—পাকা লোক, কালেক্টরিতে চিরকাল ধরে দিস্তে দিস্তে লিখে এসেছেন। মাঝে কয়েকটা বছরই শুধু বই লিখতে লেগেছিলেন। সে-ও লেখা তো বটে। ট্যাক্সওয়ালাদের শনির দৃষ্টি একবার যখন পড়েছে, চিরজন্মের মধ্যে আর রেহাই নেই; নোটিশ বছর বছর আসবে। অতএব ইনকামট্যাক্সের খাতা লেখাও চলবে নিরবধি কাল। কাজ দেখাতে পারলে বিশ্বেশ্বরের চাকরি অতএব পাকা। হাটবারের দিনটা ছাড়া বিশ্বেশ্বর দোকানে বসে খাতা লেখেন। বাড়িতেও নিয়ে আসেন—নয় তো এতাকম সময়ে কাজ শেষ করতে পারা যাবে না।

ইরাও আছে মজায়। পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো ডাংপিঠেমি করে বেড়ায়—তাই দেখে ইস্কুলের মতলব মাথায় আসে। সতীশকে বলল, দিন কাটে না সতীশ-দা, তোমার চণ্ডীমণ্ডপে ঐগুলোকে ধরে এনে বসিয়ে দাও দিকি। ট্যুইশ্যান করা অনেক দিনের অভ্যাস—না পড়ালে মুখ সুড়সুড় করে।

সতীশ খুব খুশি হয়ে বলে, ভালো মতলব করেছ। পাড়াসুদ্ধ ঝেঁটিয়ে এনে তুলছি। পাড়ার মধ্যে ভালোমানুষ এসে পড়লে কতদিকে কত ভালো হয়, তাই দেখ।

সতীশের যে কথা সেই কাজ। কিন্তু ইরাবতী অন্য রকম—কড়া মাস্টার বলে নামডাক, এখানে এসে একেবারে এলিয়ে দিয়েছে।

এ অঞ্চলটে ছেলেমেয়ে ইস্কুলে পাঠাবার তেমন রেওয়াজ নাই। তারা পড়তে চায় না—আর ইরারও তাতে বেশি আপত্তি দেখা যাচ্ছে না। তাদের ইরা-দিদি হয়ে বেরিয়ে পড়ে একসঙ্গে গাঁ ঘুরতে। দৌড়-ঝাঁপ করতে। এত বয়স অবধি বরাবর কলের জলে স্নান করে এসেছে। পালে-পার্বণে মায়ের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু জলে নামানো যায় নি তাকে কিছুতে। পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সভয়ে সকলের স্নানক্রিয়া দেখেছে। সেই মেয়ে সাঁতার শিখছে দেখ পুকুরে নেমে। এককোঁটা বাচ্চারা অবধি হাসে: ওকি হচ্ছে ইরা-দিদি, খোঁটা ধরে ঘাটের জল ঘোলাচ্ছ কেন শুধু শুধু? দূরের দিকে যাও। কেউ কেউ জল নিতে কলসি নিয়ে এসেছে, তারই একটা কলসি ভাসিয়ে দেয়: কলসি নিয়ে সাঁতরাও, তা হলে ডুববে না। লজ্জায় পড়ে ইরাবতী ঘাট ছেড়ে যায়ও চলে খানিকটা দূর। মজা লাগে। সত্যি, যতক্ষণ কলসি বুকের নিচে রয়েছে, ইচ্ছে করলেও ডুবতে পারবে না। চলে যায় ভাসতে ভাসতে। হঠাৎ ভয় হয়ে যায়, ডাঙা থেকে অনেকটা দূর এসে পড়েছে যে! তাড়াতাড়ি ঘুরতে গিয়ে কলসি সরে বেরিয়ে গেল। প্রাণ-পণে হাত-পা ছুঁড়ে ঘাটে ফিরতে চায় তখন। ফিরেও আসে। হাততালি দিয়ে কেউ হয়তো তারিপ করে উঠল, বাঃ, এই তো শিখে গেছ ইরা-দিদি। কলসি ছেড়ে দিয়ে মাঝে মাঝে এমনি চেষ্টা কোরো—কদ্দিন লাগবে? বাচ্চার মাতব্বরি শুনে রাগ ধরে যায়, ইচ্ছে করে মুখ টিপে দিয়ে আসে জল থেকে উঠে পড়ে।

একদিন সহদেব এসে বলে, দাদামশায় হঠাৎ এসে পড়েছেন। আমাদের পাড়ার এক বিয়ে ছিল কাল—বরের বাপ কি রকমের কুটুম্ব, ওঁকে জোরজার করে নিয়ে এসেছে। বাসি-বিয়ে, বাসি-বিয়ের

ভোজ—পুরোদিনটা আছেন আজকে। আমায় দিয়ে খবর পাঠালেন, আপনাদের মেয়েটিকে একবার দেখে যেতে চান।

বিশ্বেশ্বরের হঠাৎ মাথায় ঢোকে না: কেন, মেয়ে দেখতে চাচ্ছেন কি জন্যে?

ঘরে অরক্ষণীয়া মেয়ে, পাত্রস্থ করতে হবে তো?

হাঁ-হাঁ—। ঘাড় নাড়লেন বিশ্বেশ্বর।

তা মেয়ে না দেখেশুনে কি কেউ নেবে?

তার পর প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিচ্ছে, দাদামশায় আসলে আমার কেউ নন। অম্বুজ ডাক্তারবাবুর শ্বশুর। এককালে ডাকসাইটে উকিল ছিলেন, নাম শুনতে পারেন—গোবিন্দভূষণ দত্ত। বুড়ো হয়ে এখন গাঁয়ের বাড়িতে থাকেন। সাতবেড়ে—ছ-সাত ক্রোশ এখান থেকে। দাদামশায় বলছিলেন, ডাক্তারবাবুর ছেলে অরুণাক্ষের সঙ্গে আপনার মেয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে—

বিশ্বেশ্বর স-দুঃখে বলেন, হচ্ছিল। কিন্তু ডাক্তারবাবু বিগড়ে গেলেন। অন্যায় দোষারোপ করলেন আমার উপর। অবিশ্যি সে সমস্ত কারণ দূর হয়ে গেছে এখন।

সরমা থাকতে পারেন না, ঘরের ভিতর থেকে বলে ওঠেন, লাখ কথা ছাড়া বিয়ে হয় না। সম্বন্ধ অমন কতবার ভাঙে, কতবার গাঁথে। এ রকম হয়েই থাকে। দাদামশায় নাতবউ দেখে নেবেন, এতে আর কথা কি! যখন তাঁর সুবিধা।

ইরা ফিরছিল পুকুরঘাট থেকে জলের কলসি নিয়ে। রান্নাঘরের দাওয়ায় ঠনাস করে পিতলের কলসি রেখে তীব্রস্বরে সে বলে, আমাদের বিস্তর কাজকর্ম। আমাদের সুবিধা হবে না, তাঁকে আপনি বলে দেবেন।

সহদেব ক্ষণকাল স্তম্ভিত হয়ে থাকে। বলে, কী একটা বলে ফললে তুমি! আমাদের কোন্ কথাবার্তা হচ্ছে, তুমি কিছু জান না।

জানি বই কি! বিয়ের লাখ কথা পুরাতে আপনি এসেছেন।

অনেক কষ্টে মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে সহদেব বলে, নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিজে কথা বলা কি ভালো দেখায় মা? তোমাদের শহরে কেমন হয় জানিনে। পাড়াগাঁয়ে নিন্দে রটে যায়, বলে বেহায়া মেয়ে—

সরমা হাঁক দিয়ে ওঠেন, চলে আয় বলছি ইরা, এখানে আয়! লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেয়েছিস? তোকে কে ডেকেছে রে মাতব্বরি করতে? যা বলতে হয়, আমরা বলব।

ইরাবতী ঘরের মধ্যে গিয়ে আকুল কণ্ঠে বলে, মা গো, শেষ করে দাও কথাবার্তা। তোমার মেয়েকে ছাইয়ের গাদার উপর রেখে বলিদান দিও, টু শব্দটি করব না—কিন্তু ওঁদের ওখানে নয়। বাবার বিস্তর লাঞ্ছনা হয়েছে। কাগজপত্রের জন্য ঘোরাঘুরি করত, সে তো দিয়েই দিইছি আমরা। আবার কেন?

দু-চোখে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। সরমা চোখ মুছিয়ে দিচ্ছেন, কিছু বলতে পারেন না। তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে মুখ অন্ধকার করে সহদেব শুনে গেল।

সেইদিন সন্ধ্যার আগে মায়ে-ঝিয়ে আবার একটু বচসা বেধেছে। অন্য ব্যাপার। পাড়াগাঁয়ে এসে এই ক'দিনে নানান দিকে উন্নতি—আঁচল ভরতি পেয়ারা নিয়ে এসেছে। ডাঁসা ডাঁসা সুন্দর পেয়ারা। সরমা বলেন, এত পেয়ারা কোথায় পেলি?

ইরাবতী হাসে: তলা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলাম।

ডাঁসা পেয়ারা তলায় পড়েছিল ? বোঁটা কাঁচা রয়েছে, ডাল থেকে টানাটানি করে ছিঁড়তে হয়—আপনা-আপনি তাই পড়ে গেল তলায় ?

জেরায় পরে ইরাবতী হকচকিয়ে যায় : কেউ হয়তো পেড়ে ফেলে গিয়েছে মা। তাই হবে।

সরমা বললেন, হুঁ, পেয়ারা পেড়ে তলায় রেখে দিয়েছিল তুমি গিয়ে কুড়োবে বলে।

বিশ্বেশ্বর দোকান থেকে ফিরছিলেন, দু-জনের কথার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে হাসতে লাগলেন : ছেলেমেয়েদের তুই শুধু পাঠই দিস না, পাঠ নিচ্ছিসও তাদের কাছ থেকে ?

ইরা বলে, পাঠ দিতে পারি আর কই ? খারাপ মাস্টার আমি, আমার পাঠ কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু খুব ভালো ছাত্রী বাবা, ওরা যা শেখায় প্রাণপাত করে আমি শিখে নিচ্ছি।

সরমা বলেন, মেয়ের বয়স দিনকে-দিন কমে গিয়ে কচি খুকি হচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর গাঢ় স্বরে বললেন, আহা, হোক এবারে তাই। কলকাতায় বয়স ছাপিয়ে উঠে ও আমার পাকা বুড়ি হয়ে যাচ্ছিল।

সরমা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন : তুমি আস্কারা দিও না বলছি। পেয়ারাগাছে চড়েছিল মেয়ে। পড়ে কোন দিন হাত-পা ভাঙবে, সারাজীবন তার পরে খোয়ারের অন্ত থাকবে না।

তেঁতুলতলার দিক থেকে হঠাৎ ভারী গলার হাসি : পেয়ারা দোকানের ঝুড়িতে থাকে—শহুরে দিদিভাই এদ্দিন তাই জেনে বসে ছিল। সেই জিনিস ডাল ভরে ফলে আছে, এতে কি মাথা ঠিক রাখা যায় ? বুড়ো থুনখুনে আমরাই ঠিক থাকতে পারিনে—ওদের তো বয়সকাল, শক্তি-সামর্থ্য রয়েছে।

মুখ ফিরিয়ে দেখা গেল সহদেব এবং তার সঙ্গে এক বুড়ো-মানুষ। সেই গোবিন্দভূষণ দত্তই এসে পড়লেন বোধ হয়। ইরাবতীর অমন কথাবার্তা সত্ত্বেও। মাথার চুল ধবধবে সাদা, একগাছিও কালো পাওয়া যাবে না খুঁজে। দেহ কিন্তু সরলরেখার মতো খাড়া, এক ইঞ্চিও নুয়ে যায় নি। আর এক মজা, যে কথাই বলুন—হা-হা করে সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠবেন।

আসুন, আসুন—বিশ্বেশ্বর কি করবেন, কোথায় বসতে দেবেন, ভেবে পান না। গোবিন্দ ততক্ষণে দাওয়ার মাদুরের উপরে চেপে বসেছেন। সহদেবকে বলছেন, তোমাদের কাশীর পেয়ারাগাছে অনেক তো ফলে আছে দেখলাম। পাঠিয়ে দিও কতকগুলো। দিদি পেয়ারা ভালোবাসে। ভালো না বাসে কে, দাঁত থাকলে আমরাই কি ছাড়তাম?

হুঙ্কার ছাড়লেন: কই দিদিভাই, ঘরে ঢুকে মুখ লুকিয়ে বসে আছ কেন? পরক্ষণে হা-হা করে হেসে ওঠেন: দিদি নাকি খুব ঝগড়া করতে পার? এমন ধুরন্ধর মানুষ সহদেব, তাকে অবধি থ বানিয়ে দিয়েছে?

ইরাবতী লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়। রাগ হচ্ছে বুড়োর উপর। কিন্তু এমন ভাবে হেসে হেসে বলছেন—দু-কথা যে শুনিয়ে দেবে তার উপায় নেই। বেরিয়ে এসে গোবিন্দর পায়ের গোড়ায় সে প্রণাম করে।

গোবিন্দ বলেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো—

এবং মুখের কথা মাত্র নয়, হাত ধরে সজোরে বসিয়ে দেন সামনে। এত বুড়ো হয়েছেন, জোর আছে তো বেশ গায়ে।

হেসে হেসে বুড়ো আবার বলেন, আমার দিদিমা ছিলেন ডাক-সাইটে ঝগড়াটে। এমন চেঁচাতেন, ঘরের চালের উপর জমে একটা

কাক বসত না। রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে উঠে উঠে ঝগড়া করতেন—বালিশে চুলের কাঁটা আটকে গেছে সেই বালিশের সঙ্গে, চৌকাঠে হোঁচট লাগল তো চৌকাঠের সঙ্গে, জোনাকির ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে তার সঙ্গে, চৌকিদার হেঁাদে বেরিয়েছে তার সঙ্গেও। চৌকিদার বলত, এ-পাড়ায় আর আসব না। পাড়াটা উনিই তো দিব্যি দেখছেন। আমরা একবার হাঁক দিয়ে যাই, উনিই সারারাত্তির হাঁকাহাঁকি করেন। পাড়ার চোর ঠেকাচ্ছেন, মাইনেটা ওঁকে দিয়ে দিলেই হয়। একলা আমার দিদিমা নন, ঘরে ঘরে এমনি সব ছিল দিদিভাই। তখন সস্তাগণ্ডার বাজার, সরেস খাওয়াদাওয়া—তাগত তাই শরীরে, দু-খুঁচি ধানের চিঁড়ে ঢেঁকিতে কুটে ফেলত আধঘণ্টার ভিতর। আর এখনকার মেয়ে-বউরা দেখি মেনিবিড়ালের মতো মিউমিউ করে, ঘরে কথা বললে দাওয়া থেকে শোনা যায় না। এর মধ্যে সহদেব গিয়ে বলল, কনে জবাব দিয়ে দিয়েছে—সময় নেই, দেখাদেখা হবে না। আমারও জেদ চাপল, চলো দিকি, কেমন সময় না হয় দেখে আসি। তা এই তো—সামনে বসিয়ে কতক্ষণ ধরে দেখে নিচ্ছি। দেখা না দিয়ে পারলে কই দিদিমণি ?

সহদেব গিয়ে কী সব বলেছে, ইরাবতীর রাগ হচ্ছে। রাগ হচ্ছে গোবিন্দর উপরও। এমনি করে দু-হাতে মুখ তুলে ধরে ছবি দেখার মতন করে কেউ দেখে নাকি ? অথচ বুড়োমানুষের হাত সরিয়ে ছিটকে বেরিয়ে পড়াও চলে না।

সরমা ওদিকে সতীশের বাড়ি চলে গেছেন। ডাকতে হাঁকতে ওরাই ভরসা। সতীশ নেই, তার ছোট ছেলেকে হাটখোলায় পাঠালেন মিষ্টি কিনে আনবার জন্য।

ছুটে যা বাবা, খবরবাদ না দিয়ে এসে পড়েছে, মুশকিলে পড়েছি। যাবি আর আসবি—দেরি করিসনে।

ফিরে এসে দেখেন গোবিন্দ উঠে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, খবরটা পেলাম আমার মেয়ে সুহাসের চিঠিতে। হঠাৎ আপনারা সবাই দেশে চলে এসেছেন, পাকা দেখাটা সেইজন্যে হতে পারে নি। তা সুযোগ হল তো নাতবউ না দেখে কি ছাড়ি? বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে, খুব পছন্দ আমার। বলে যাচ্ছি নাতবউ, অরুণের সঙ্গে বনিবনাও না হলে, সটান আমার বাড়ি গিয়ে উঠো। তোমার দিদিমা বুড়োঅথর্ব মানুষ—সতীন পেলে খুশিই হবে।

সরমা মৃদুকণ্ঠে বলেন, উঠবেন না। একটু দেরি করে যেতে হবে।

গোবিন্দ হেসে বললেন, শুধু-মুখে উঠতে দেবেন না। তা বেশ, পান দিন তবে একটা। বয়স হয়ে গেছে, অবেলায় আর কিছু চলবে না। সুহাসকে লিখে দিচ্ছি আমি। মেয়ে চমৎকার।

পান খেয়ে হা-হা করে হাসতে হাসতে সহদেবের সঙ্গে বুড়ো চলে গেলেন। আর একবার পায়ের ধুলো নিল ইরাবতী। ঠাকুর-দাদা, দাদামশায়—ওঁরা সব এমনি হন বোধ হয়। ঠাকুরদাদার ছবি দেখেছে ছোট্ট বয়সে বর্ণপরিচয় পড়বার সময়—'ঠ'য়ে ঠাকুরদাদা। বুড়োমানুষ—একটু কুঁজো হয়ে বসে, মুখে হুঁকা, ঘিরে রয়েছে চারদিকে নাতি-নাতনীরা। ছবি হাসে না, কথাবার্তাও বলে না। চেহারা কথাবার্তা হাসি মিলিয়ে জ্যান্ত ঠাকুরদাদা এই প্রথম দেখল। ওঁরা বেশ।

•

বিশ্বেশ্বর গ্রামে চলে গেলেন তো মুশকিল এ দিকে কৃতান্তর। ইলেকশনের মুখে যুগচক্র এবার নিয়মিত বেরুবে। দিন যত ঘনিয়ে আসবে, সপ্তাহের নিয়মিত কাগজ ছাড়াও বিশেষ সংখ্যা বের করতে হবে। কিন্তু বিশ্বেশ্বর বিহনে গোড়ার ভারী প্রবন্ধ কে লেখে? মানুষ যে একেবারে পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু বিশ্বেশ্বর যেমন

গুরুগম্ভীর ও অবোধ্য করে লেখেন তেমনটা অন্য কারো দ্বারা হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া পয়সা চায় লেখকেরা লেখার দরুন—শুধুমাত্র আনন্দের জন্য লেখা, এবম্বিধ নিষ্কাম সাহিত্যসেবী দুর্লভ হয়ে উঠছে দিনকে দিন। ভারি ভাবনায় পড়েছে কৃতান্ত। ইলেকশন কাছাকাছি আসছে, পাগল হয়ে উঠছে সে ততই।

তার চেয়েও বড় ব্যাপার—অম্বুজাক্ষের বাড়ি গিয়ে ভয় দেখিয়ে এসেছিল, ভদ্রলোক তবু আমল দিলেন না। সেই গতবারের মতন। কৃতান্ত হেন সম্পাদক এবং যুগচক্র হেন কাগজের লেজুড় ধরে অম্বুজাক্ষ জিততে চান না। সেবারের মতোই, অতএব, সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে। বিশ্বেশ্বরকে এই জন্য প্রয়োজন। তাঁকে না পাওয়া গেলেও নিতান্ত পক্ষে প্রমাণগুলো চাই হাতের মুঠোয়। সেই সব অকাট্য প্রমাণ—টমাস সাহেবের চিঠিপত্র, টমাস সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া টাকার হিসাব—যে জমাখরচ কাশীশ্বর নিজ-হাতে লিখেছিলেন, চির নরকবাসের পরোয়ানা সই করেছিলেন নিজ-হাতে। ভালো রকম জেনেশুনে চতুর্দিকে আঁটঘাট বেঁধে তবেই লিখতে হবে। নয়তো সাহস করা যায় না। অম্বুজাক্ষ কম পাত্র নন—তিনিও ছেড়ে কথা কইবেন না, সেদিন স্পষ্টাস্পষ্টি তা বলেই দিয়েছেন।

নিরুপায় কৃতান্ত হাত কামড়াচ্ছে। এমন সময় আজব ব্যাপার—ডাকে এসে এসে পড়ল এক প্রবন্ধ। ঠিকানা দেওয়া নেই, লিখেছে ছদ্মনামে—'বিষকুম্ভ'। নাম মিছে নেয় নি—বিষেই ভরতি কুম্ভটা, সেই বিষ লেখার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বেশ্বর সরকারের 'ভারতে ইংরাজ' বইয়ের পরিশিষ্ট বলা যেতে পারে। অথবা শেষ দুটো অধ্যায়ের প্রতিবাদ। ভুল ধারণা নিয়ে একেবারে উল্টো কথা লিখেছেন বিশ্বেশ্বর—কাশীশ্বর আসলে নারকীয় পশু একটি, তাকে বিশ্বেশ্বর দেবতা বানিয়েছেন। আবার শাসানিও আছে, 'ভারতে

ইংরাজ' যুগচক্রের প্রকাশিত বই, সেই কারণে লেখাটি যেন চেপে দেওয়া না হয়, তাতে অনর্থ ঘটবে, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া হবে—যুগচক্র কী ধরনের সত্যসন্ধ কাগজ। লেখক যে-ই হোক, লোকটা বিস্তর খেটেছে, প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে তার পরিচয়। আর মনে হচ্ছে অম্বুজাক্ষের সঙ্গে সেই লোকের জন্ম-জন্মান্তরের শত্রুতা। ইলেকশনে অম্বুজ ডাক্তারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে বলে যারা পায়তারা ভাঁজছে, তাদের দলের কেউ সম্ভবত। হয়তো সাধন মিস্ত্রিরের চেলাচামুণ্ডা।

লেখাটা হাতে পড়েছিল পঞ্চাননের। প্যাকেট খুলে আদ্যন্ত পড়ে সে কৃতান্তকে দিল।

ধারালো কলম। ভালো লিখেছে, কি বলেন?

বটেই তো। কৃতান্ত আমতা-আমতা করে: ভালো ছাড়া মন্দ কি করে বলি? তবে দাদার মতো নয়।

পঞ্চানন বলে, এটা কি বলছেন? সরকার মশায় মানুষ যত ভালোই হন, বাংলা ভালো লেখেন না যত সব কটোমটো কথার আমদানি করেন।

হাসতে হাসতে কৃতান্ত বাকিটা বলে দেয়, অর্ধেক কথার মানেই বোঝা যায় না। ঐ তো বাহার হে! রামা-শ্যামা সবাই যদি জলের মতন বুঝে ফেলল, লেখা তবে ভারিক্কি হল কোথায়? সে লেখা কাগজের গোড়ায় চলে না।

লেখকের খোঁজে কি গরজ—ধরে নেওয়া যাক, বিধাতা-পুরুষ প্রসন্ন হয়ে আকাশ থেকে লেখা ছুঁড়ে দিয়েছেন। বিষকুণ্ড জানিয়েছে, উৎসাহ পেলে অনেক সংখ্যায় চালাবে নীল-বিদ্রোহ নিয়ে এই আলোচনা। একটা কিস্তি ছাপা তো হোক আপাতত। এই সংখ্যার একখানা অম্বুজাক্ষের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে। আর একখানা সাধন মিস্ত্রিকে। টোপ ফেলে এমনি ভাবে উভয় পক্ষের গতিক বুঝে নেওয়া যাক।

বেশ চলছিল, সহদেব বড় ভালো—রাতারাতি কি হল হঠাৎ —একদিন বিষম গরম হয়ে এসে পড়ল। বলে, সরকার মশায়, নিরীহ নির্বিরোধী পণ্ডিত-মানুষ আপনি—ভালোর তরে বলছি, অন্যত্র উঠে যান। টিকতে পারবেন না। জায়গা-জমি নিলাম হয়ে গেল, নিলাম কিনে বয়নামা জারি করে আইন মতো বাঁশ-দখল হয়েছে। রাতারাতি দু-খানা ছাবড়া তুলে দিলেই কি সর্বস্বত্ব লোপ পেয়ে গেল? সতীশ মুরুব্বি হয়েছে, কিন্তু রাজার আইনের মুখে গোঁয়ার্তুমি টিকবে না। বলুন না বিবেচনা করে, টিকতে পারে কখনো?

বিশ্বেশ্বর হতভম্ব হয়ে শুনছেন। না রাম না গঙ্গা—মুখে বাক্য নেই। চেঁচামেচি শুনে ইরাবতী হুড়কো ধরে এসে দাঁড়াল। সহদেব তেমন স্ফূর্তি পাচ্ছিল না এতক্ষণ। বিশ্বেশ্বরের কাছে বলা আর একটা গাছ কি একখানা পাথর সাক্ষি রেখে বলা একই কথা। ছটফটে জীবন্ত মানুষ মিলল এতক্ষণে একটি। হাতের কাগজটা নাচিয়ে গলায় আরও জোর দিয়ে বলে, মামলা চেপে যাচ্ছে আপনার নামে কিন্তু সরকার মশায়। ফৌজদারি দেওয়ানি উভয় রকম। তখন দোষ দিতে পারবেন না। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, জানেন তো? দেওয়ানি হলগে 'দেও আনি'—মোকদ্দমা চলল তো চলল, কয় বছর বা কয় পুরুষে খতম হবে কেউ বলতে পারে না। ফৌজদারি হল কাঁচাখেগো দেবতা। পিছনে আপনার বল-শক্তি আছে বুঝতে পারছি। কিন্তু অন্যায় অবৈধ-ভাবে জমি জবরদখল করে আপনার মতন মানুষ কাঠগড়ায় দাঁড়াচ্ছেন—

দেখতে, শুনতে কেমন লাগবে, ভেবে দেখুন একবার। তার চেয়ে যা বলছিলাম, আপোসে ছেড়ে দিয়ে যান। ঘর দু-খানার কিছু মূল্যও ধরে দেওয়া যাবে। অমুক ডাক্তারবাবু চিঠি দিয়েছেন, এখানটায় দাতব্য চিকিৎসালয় হবে, দশে ধর্মের কাজে আসবে।

ইরার দিকে চেয়ে বিশ্বেশ্বর বিপন্নভাবে বলেন, কী মুশকিল দেখ্ তো মা। কি সব মামলা-মোকর্দমার কথা বলছেন।

ইরা ভ্রূকুটি করে বলে, হাতে কি আপনার গোমস্তা মশায়? মোকদ্দমার সমন, না ডাক্তারবাবুর সেই চিঠি?

সহদেব বলে, বিবাদীপক্ষ তোমাদের চিঠি দেখতে দেব কেন? সমনের জন্যেও ব্যস্ত হতে হবে না মা, আদালতের পেয়াদা ঠিক সময়ে এসে জারি করে যাবে। হাতের এ-জিনিসটা তোমাদেরই দিয়ে যাব বলে এসেছি। নিন সরকার মশায়—জানেন সমস্ত, তবু নেড়েচেড়ে দেখুন।

কাগজটা ছুঁড়ে দিল বিশ্বেশ্বরের দিকে। যুগচক্র। দেখে বিশ্বেশ্বর ব্যগ্র হয়ে লুফে নিলেন। বড় মায়া যুগচক্রের উপর। কতকাল ধরে কত লেখা লিখেছেন। ইদানীং এ-জগতের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে, কোন কাগজ পাঠায় না কেউ। লেখার পাট ছেড়ে দিয়েছেন, কোন সুবাদে পাঠাবে? সে হল আর এক জীবন—নতুন নতুন তথ্য খুঁজে বেড়ানো, সাত রাজার ধন মাণিক পাবার মতন ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময় ও উত্তেজনা। সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আজ নিরালা পাড়াগাঁয়ে নিরুত্তাপ দিন কাটাচ্ছেন। কাগজখানা হাতে পেয়ে লাফিয়ে উঠলেন, বিস্মৃত লোক থেকে খবর পাঠিয়েছে কে যেন। অস্থির আঙুলে পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছেন। শেষ হল তো সেখান থেকে উল্টাতে উল্টাতে আবার গোড়ায় আসছেন। গোড়া থেকে আবার শেষে। তার পরে মগ্ন হয়ে গেলেন

'ভারতে ইংরাজ' নামক প্রবন্ধটার মধ্যে। কোটরগত চোখ দুটো চকচক করে ওঠে—চাপা-দেওয়া সত্য পাহাড় কেটে উচ্ছ্বসিত প্রবাহে বেরিয়ে এসেছে রে! অম্বুজাক্ষ ঠেকাতে পারেন নি, বিশ্বেশ্বর নিজেও নয়। সত্যের জোরের সঙ্গে পেরে উঠবে কে? পড়া শেষ করে উল্লাসে কাগজটা ইরাকে দেন: পড়ে দেখ্ মা। সত্যিই খেটে লিখেছে—

সহদেব বক্রদৃষ্টিতে দেখছিল এতক্ষণ। সে বলে উঠল, লিখেছেন আপনি তো মশায়—

লিখবার বড্ড ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হয়ে উঠল কই? গরিব বলেই হল না। আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানিনে।

কে লিখেছে বলুন তবে। ইচ্ছে এখন অনেকের বটে, কিন্তু কলম ধরলেই এসমস্ত লেখা যায় না। খবরাখবর রাখতে হয়। সে সাধ্য আপনি ছাড়া কারো নেই। ডাক্তারবাবুও তাই লিখেছেন। একটা কথা বুঝে দেখুন, প্রবীণ মানুষ বলেই বলছি। মোকদ্দমা চুলোয় যাকগে কিন্তু এই যে কসাড় জঙ্গলের ভিতর এসে আছেন —একা সতীশ ক'দিন কত মাস চোখে চোখে রাখতে পারবে? কিম্বা ঐ সাধন মিস্তিরই কি পাঁচপোতা থেকে রোজ রোজ ঠেকাতে আসবে?

ইরা বলে, সতীশ তো হল কিন্তু সাধন মিস্তিরটি কে, জানি নে তো!

সহদেব চোখ পিটপিট করে বলে, নামই জান না? মিস্তির মশায় ভোটে দাঁড়াচ্ছেন ডাক্তারবাবুর বিপক্ষে। কলকাতায় থেকে এই কাগজ গাদা গাদা আমদানি করে বাড়ি বাড়ি বিলোচ্ছেন। পড়তে পারুক আর না পারুক পাঠাচ্ছেন একখানা করে। আমাদের অবধি পাঠিয়ে দিয়েছেন। পাট আর গুড় বেচে পয়সা হয়েছে,

সে পয়লা রাখবার ঠাঁই হচ্ছে না। তা সে যাই হোক, বাড়ি পাঁচপোতায়—চার ক্রোশ পথ। সেই মানুষের বল পেয়ে অমুক ডাক্তারবাবুর চোদ্দপুরুষ ধরে কুচ্ছো করছেন—মামলা-মোকদ্দমা যবে হয় হোকগে, যদি ধরুন রাত্তিরবেলা কোন বদলোক এসে বেড়ায় ছুটো লাঠির ঘা মারে, তখন তো আমাদেরই এসে সামলাতে হবে। বলুন তাই কিনা ?

ইরাবতী বলে, বদলোক না-ও যদি হয়, আপনারা ভালো লোকেরা এসে বেড়ায় ঘা দেবেন—এই তো ?

বিশ্বেশ্বর ব্যাকুল হয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, না গোমস্তা মশায়, আমি একেবারে কিছু জানিনে। আমি হলে সত্যি খবরগুলো শুধু দিয়ে যেতাম। এত কটূকাটব্য আমার কলমে আসে না। লিখে দেবেন ডাক্তারবাবুকে, এ লেখা আমার নয়। হতে পারে না।

কথার ধারা সহদেব সহসা ঘুরিয়ে নেয় : হয়ই যদি ! ডাক্তারবাবু রেগে টং—আমি তো মশায় তেমন-কিছু দোষ দেখিনে। পয়সা পেয়ে থাকেন তো যা-ইচ্ছে করুন গে। ছুটো পয়সার কারণে ছুনিয়ায় আসা। এই ধরুন, আমি কড়চা-সেহা-দাখলে লিখি—লেখার গুণে করে খাই। সেহা-কড়চার বেশি বিছে নেই—থাকলে আমিও লিখে লিখে ছাপতাম। অধিক পয়সা আসত।

একটু থেমে গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, তবে জাতসাপের দস্তুর জানেন তো মশায়—ছোবল মেরে বিষ ঢালতে যেমন, চুমুক মেরে বিষ তুলে নিতেও তেমনি। বন্দোবস্তের ব্যাপার সমস্ত। যা বলি শুনুন। আশা-সুখে ঘর তুলেছেন, ঘর ভাঙাভাঙিতে কাজ নেই। আমাদের বাবু যদি পুষিয়ে দিতে পারেন, সাধন মিত্তিরের দরজায় যাবার কোন দরকার ?

এমন অবস্থার মধ্যেও ইরাবতী কৌতুক বোধ করে। মানুষ যা-ই কিছু করুক, মূলে রয়েছে টাকা; টাকা-পয়সা ছাড়া কোন-কিছু হয়, এই সব মানুষ ভাবতে পারে না। নিরীহ মুখ করে সে বলে, কি রকম পুষিয়ে দিতে পারবেন, বলুন দিকি শুনি।

আমি গোলাম-নফর—আমি কি বলব? চিঠি লিখে জানতে হয়। সরকার মশায়, রাজি থাকেন তো বলে দিন—ডাক্তারবাবুকে লিখে জানাই। কাগজে যা বেরিয়ে গেছে, ষোল আনা সামলে নিতে হবে কিন্তু। সেই মর্মে বন্দোবস্ত হবে।

এবং সর্বশেষে মোক্ষম টোপ নিক্ষেপ করল: কুটুম্বিতের কথাবার্তা চলছে—সেটাও বিবেচনা করবেন, সরকার মশায়। সেয়ানা মেয়ে কাঁধের উপর থেকে নামাতে হবে। খোদ কর্তারাই এসে যাবতীয় ব্যাপার ঠিকঠাক করুন—সেই ভালো, সেই কথা লিখে দিই গে। ভোট এসে পড়ছে, এসে তো পড়ে থাকতে হবে এইবারে। এত আগে থেকে এসে বসলে ডাক্তারবাবুর রুজি-রোজগার বন্ধ হয়, রোগিরা হামলা করে। তা ডাক্তারবাবু না পারেন—ছোটবাবুর এগজামিন হয়ে যাচ্ছে, তিনি চলে আসুন। কি বলেন মশায়?

বিশ্বেশ্বর কোন-কিছু বলবার আগেই ইরাবতী জবাব দেয়, ঠিক বলেছেন গোমস্তা মশায়। ছোটবাবুই আসুন তবে। তিনি এসে কতটা কি দেবেন না দেবেন, সামনাসামনি বন্দোবস্ত করে যান।

নিজ মুখে বলল মেয়েটা এই কথা। এরই সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ঐ ছোটবাবুর। সহদেব অবাক হয়ে ইরার মুখে তাকায়।

সেই সময়টা সতীশ ছিল না। চাষবাসের গোন, মাঠে গিয়েছিল সে। ফিরে এসে সমস্ত শুনল। চটে আগুন।

বাস ওঠাবার কথা তোলে—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! বেশ, এই একলা সতীশই দেখবে। সাধন মিত্তির-টিত্তির কারো কাছে

যেতে হবে না। একটা কথা বলে যাচ্ছি কর্তা মশায়, সীমানার মধ্যে ঢুকতে দেবেন না এর পরে যদি কখনো আসে। যা বলবার রাস্তা থেকে বলে যাবে। জোর করে ঢুকতে যায় তো ভাইপোদের ডাকবেন, মাথা চৌচির করে দিয়ে যাবে। পাড়াগাঁ জায়গা, শহর-বাজার নয়, বসবাসের জমির অভাবটা কি? যাকে বলব সে-ই সোনামুখ করে ডেকে নেবে। কিন্তু রামনিধির আদি-ভিটে ছেড়ে যেতে দিচ্ছিনে। পাড়ার অপমান। অম্বুজ ডাক্তার ক্ষেপে গেছে—ক্ষেপবারই কথা। যা একখানা ঠুকেছেন, ওকে আর ভোটে জিততে হবে না। অমন ছ্যাঁচড়া গুষ্টি—জেতা উচিতও নয় ওদের। ভালো কাজ করেছেন কর্তা মশায়, সময় থাকতে ফাঁস করে দিয়েছেন।

বিশ্বেশ্বর অসহায়ভাবে বলেন, আমি লিখি নি। আমি কিছু জানিনে সতীশ, তবু সকলে বদনাম দিচ্ছে। কালীতলায় দাঁড়িয়ে বলে আসতে পারি, আমি এর মধ্যে নেই।

এত করে বলার পরেও সতীশ যে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে, তা নয়। বলে, লিখেই থাকেন যদি। অত ভয় কিসের? আইনে যা বলে বলুক গে, দেশের তাবৎ লোকজন আপনার পক্ষে। এই মণিরামপুর বলে নয়, আশপাশের সমস্ত গ্রাম। আসুক না উচ্ছেদ করতে রামনিধির নাতিপুতিদের। চোরাগোপ্তা কিছু নয়, ডাওর গলা করে বলছি—কত ক্ষমতা ধরে, আসুক না। রক্তের নদী বয়ে যাবে তা হলে।

বিশ্বেশ্বর থরহরি কম্পমান। সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ—শেষটা খুনোখুনি বেধে যায় তাঁদের নিয়ে। অবস্থা অতিমাত্রায় সঙ্গিন হয়ে উঠছে। সতীশ নিজে গিয়ে ও-তরফে শুনিয়ে এসেছে, মনে হয় না, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে শোনাবার লোকের অভাব নেই। রক্তের কথায় সহদেব হেসে খুন: অ্যাঁ, বল কি—খাল নয় বিল নয়, নদী বইয়ে

দেবে? কোন নদী—মেঘনা না পদ্মা না দামোদর, ভূগোল হিসেব করে বলতে বলো। কলকাতার কর্তাদের লিখে জানাব। শিক্ষিত মানুষ—আজামৌজা মানবেন না তাঁরা—

মনে মনে খুশি সহদেব। শুধু খাজনা-আদায়ের গোমস্তাগিরিতে সুখ নেই। দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনজখমে ক্ষমতা দেখানো যায়। দু-চার পয়সা আছেও। শেষ অবধি ব্যাপারটা মিইয়ে না যায়, সেইজন্য চতুর্দিক গরম করে বেড়াচ্ছে: হাইকোর্টের টনক নড়ে গেছে, হেঁ-হেঁ, যার উপরে আপিল নেই। খোদ বাবুরা এসে যাচ্ছেন। এস্পার কি ওস্পার। সরকার মশায় যে থুতু মাটিতে ফেলেছেন, চেটেমুছে ষোল আনা তাই তুলে নেবেন। নয়তো পথ দেখতে হবে। মাঝামাঝি কিছু নেই। বুকের উপরে চেপে বসে দাড়ি উপড়ানো চলবে না।

হাটখোলায় হরিভূষণের দোকানে বিশ্বেশ্বর কাজ করছেন, পাশের দোকান থেকে শুনিয়ে শুনিয়ে সহদেব তড়পাচ্ছে: শিখসৈন্য নিয়ে আসছেন বাবুরা। তিনটে টোটার বন্দুক। ছোটবাবু সঙ্গে করে আনছেন। সতীশের নদী যে এখন সমুদ্রে তলিয়ে যায়। মহা সমুদ্দুর—গ্রেট ইণ্ডিয়ান ওসান। খবরটা দিয়ে দিও কেউ সতীশকে।

হাটবাজার জায়গা, রকমারি মানুষের আনাগোনা—দেখতে দেখতে ভিড় জমে যায়। সহদেবের মুখে শুনে সেই কথা আবার এ-দোকানে বিশ্বেশ্বরের কাছে বলতে আসে। যেমনটি শুনেছে সাদামাঠা সেইভাবে বলে যায়; কেউ বা আবার রং ফলিয়ে বাড়িয়ে-গুছিয়ে বলে। তিনটে টোটার বন্দুক তিনশ' হয়ে দাঁড়ায়। শিখসৈন্য কোন বস্তু সাঠিক জানা নেই, মোটের উপর সৈন্যের পুরো এক পল্টনই আন্দাজ করা যাচ্ছে। বিশ্বেশ্বরের দোষ দিচ্ছে অনেকে: কাজটা ভালো করেন নি যাই বলুন। কোন পিতৃপুরুষ কাশীশ্বর

কবে কি করেছিল, তার জন্য এখনকার এরা দায়ী কিসে? বিদ্দি-দোষে মানী লোকের মান নষ্ট—মরীয়া হয়ে তো উঠবেনই।

সতীশের দল নস্যাৎ করেছে ওদিকে: কুছ-পরোয়া নেই। বন্দুক আনছে, কাক-তাড়ানো বন্দুক—মানুষে ভয় পায় না। নীলকরদেরও বন্দুক ছিল, সে আরো সাদা সাহেবের বন্দুক—পাত্তাড়ি গুটাতে দিশা পেলো না তবু। নীলকর সাহেবদের কি দশা হয়েছিল, বললেন না কেন কর্তামশায়, আপনার চেয়ে কে বেশি জানে? হাটে বসে ফুটানি করে, মুখের উপর বলে দিতে হয় তখন।

হায় ভগবান! পাড়াগাঁয়ে এসে সোয়াস্তিতে বসবাস করব, গোড়ায় গোড়ায় ছিলামও তাই—হঠাৎ এর ভিতর কী কুরুক্ষেত্র জমে ওঠে দেখ! যত শুনছেন, নিরীহ বুড়োমানুষ বসে পড়ছেন একেবারে। দোকানের কাজটা পাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়েছেন অনেকটা। পাড়াগাঁয়ে খরচপত্র কম, পড়শিরা দেখাশুনা করে, ক্ষেতের কলাটা-মূলোটা দিয়ে যায়। পৈতৃক ধানজমির কয়েক বিঘা উদ্ধার হয়েছে, বছরের খোরাকি ধানটা বোধ হয় হয়ে যাবে। যাচ্ছে মোটামুটি ভালোই। কিন্তু পায়তারা ভাঁজতে লেগেছে অহরহ উভয় তরফে। সহদেব পথ তাকাচ্ছে—কলকাতা থেকে সৈন্যদল এসে পড়লে হয়; মামলা-মোকদ্দমা নয়, দিনদুপুরে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ভিটে থেকে তাড়াবে। সতীশ বলছে, দিনদুপুরে না পারি, আঁধার রাত্তির আর জলজঙ্গল আছে আমাদের। ডাক্তারবাবু ছোটবাবু যিনি আসতে চান আসুন না—যে দু-পায়ে আসছেন, দুটো না হোক তার একখানা অন্তত রেখে যেতে হবে।

সরমার মুখ শুকনো! শহর ছেড়ে আসা অবধি মেজাজ তো খারাপই, এখন তো ক্ষণে ক্ষণে স্বামীর উপর হুমকি দিয়ে পড়ছেন: তোমারই জন্যে! বাড়া ভাতে ছাই পড়ে যায়, কূলে এসে ভরা ডোবে—

বিশ্বেশ্বর বলেন, যে দিব্যি করতে বলো তাই করছি। ও লেখা আমার নয়, আমি কিছু জানিনে। ইতিহাস কি বস্তু, দেখলে তো এদ্দিন ধরে! যা মনে এলো লিখে গেলেই হয় না—এক লাইন লিখতে একবস্তা কাগজ ঘাঁটতে হয়। আমার কি আছে, আমি তো একেবারে নিঃসম্বল এখানে।

সরমা বলেন, এখন ভালো হয়ে গেলে কি হবে—আগের দোষের জের চলছে। কী যে কুবুদ্ধি হল—সেই চাকরি বজায় থাকলে মাইনে কত বেড়ে যেত, রিটায়ার করবার সময় হত এদ্দিনে। মোটা টাকা হাতে নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসতে। তা হলে কি জঙ্গলপুরীর খোড়ো-চালায় পড়ে পড়ে ভোগান্তি হয়?

স্ত্রীর কথাগুলো নিতান্ত ভুল বলে মনে হচ্ছে না বিশ্বেশ্বরের। নামজাদা অনেক ঐতিহাসিকের কথা মনে খেলে যায়। বড় বড় পণ্ডিত, বিদ্যার মহাসমুদ্র—লেখা তবু তাঁদের তৌল করে নিতে হয়, বিস্তর খাদ মেশানো। বাইরের লোকের বেলা নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন; কিন্তু নবাব-বাদশা যাঁরা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁদের তুলে ধরেছেন আকাশে। সত্য বিকৃত করেছেন, একেবারে গোপনও করেছেন। তা ছাড়া উপায় ছিল না। দু-এক জনে লিখে গেছেন বেমালুম নাম গোপন করে। দরবারে ঘোরাফেরা করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু ইনিই লেখক তা কেউ ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারে না। চিরকাল ধরে এই গতিক—এখনও তাই। ছা-পোষা গরিব মানুষ বিশ্বেশ্বর সরকার—তাঁকে ঘোড়া-রোগে ধরেছিল। তোবা করে আবার পুরানো পথে চলেছেন; কিন্তু মাঝের ক'টা বছর কিছুতে মরতে চায় না। গ্রামের অজ্ঞাতবাসে আছেন, প্রতিহিংসা এই অবধি ধাওয়া করে এসেছে।

ইরাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সরমা বলেন, সাত তাড়াতাড়ি কলকাতা ছাড়বার কি গরজ পড়েছিল? চাল কেটে বসত ওঠাবে—ছাঁচতলায়

কুকুরের মতো এর কাছে তার কাছে ঠাঁই খুঁজে বেড়াতে হবে, তাতে তোমাদের বড্ড মান বাড়বে বুঝি ?

সেই মেয়ে—কাঁধের উপর একদা গোটা সংসার তুলে নিয়েছিল—এত বড় বিপদের কথা তার কানেও ঢোকে না। তখন সোজাসুজি বলতে হয়, শুনলি তো ? ওরা মরীয়া হয়েছে। রক্তারক্তির ব্যাপার—

ইরা হেসে বলে, সেনাপতি তো তোমার আপন লোক মা। আমাদের চেয়ে অনেক আপন সে লোক। এসে পড়লে তার সঙ্গে বুঝসমঝ করে নিও।

সরমা আগুন হয়ে বলেন, কাণ্ড ঘটাবেন ওঁরা বাপে-মেয়ে—হাত-পা ধরে আমি যাবো বুঝসমঝ করতে। বয়ে গেছে। টেনে হিঁচড়ে মণিরামপুর তো নিয়ে এলি, এবারে আবার কোন চুলোয় যেতে হবে সেই কথাটা বল্।

ইরা বলে, তোমার মতলব বুঝেছি মা—দুধ খেতে হবে, এখন এক গেলাস। সে আমি ঠিক ধরেছি। এ-কথা সে-কথা বলে আমায় কায়দার মধ্যে ফেলছ। দাও তাই—সকালবেলাটা আর ঝগড়ার মধ্যে যাব না। পুরো গেলাস দিও না মা, কম করে দিও—আধ গেলাশের বেশি না হয়।

সরমা হতাশ হয়ে বলেন, কি হয়েছে বল্ দিকি, এত বড় ব্যাপার নিয়েও ঠাট্টা-তামাশা ? দেশি লোক নয়, শিখ বরকন্দাজ আসছে কলকাতা থেকে, বন্দুক আনছে। অরুণাক্ষ নিজে নিয়ে আসছে। উপায়টা কি বল্ এখন।

উপায় আবার কি। রেলগাড়ি আছে, মোটরবাস আছে—টাকা দিয়ে টিকিট কেটে যে কেউ আসতে চায়, স্বচ্ছন্দে আসতে পারে। ইচ্ছে হয়ে থাকে তো আসবেই ওরা—উপায় ভাবাভাবির কি

আছে ? তোমার দুধ গরম হয় নি বুঝি মা, আজেবাজে বলে সময় কাটাচ্ছ ?

সরমা বলেন, আজেবাজে কথা আমার। চেলাচামুণ্ডাগুলো ঐ যে তেঁতুলতলায় উদয় হয়েছে। উসখুস করছ—দুধটুকু মুখে দিয়ে পালাতে পারলে হয়। কোন রাজকার্য আছে এখন শুনি ?

দোপাটি-ফুলের চারা পোতা হবে ইস্কুলের ছাঁচতলা ঘিরে। চারা জোগাড় করে এনেছে। রাগ করছ কেন মা, ফুল ফুটলে কেমন শোভা হবে দেখো।

সরমা রাগে দিশা করতে পারেন না : পড়াশুনোর ইস্কুল তো নয়—বাঁদরামির। তা-ও আর ক-দিন আছে। আমরাই কোন মুলুকে ভেসে যাব। উনি এখন ফুলগাছ বসাতে চললেন।

এক আধ-পাগলা বুড়োমানুষ, আর এই এক থুবড়ো বয়সের খুকি। একটা কথা বলবার দোসর নেই। সতীশকে দেখেও সরমা এখন ভরসা পান না, আতঙ্ক লাগে। পাড়াগাঁয়ের মাতব্বর—আইনে পারবে না তো গায়ের জোরে রুখবে। ভিটে তো যাবেই, প্রাণ নিয়ে টানাটানি এখন।

সরমা ব্যাকুল হয়ে পঞ্চাননকে চিঠি দিলেন—এসো, চলে এসো পত্রপাঠ। বিষম বিপদ। সমস্ত ব্যাপার খুলে লিখলেন। পঞ্চানন ছাড়া আপন লোক মনে পড়ে না এ-অবস্থায়। বয়সে কাঁচা হলে কি, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে সে-ই যা-হোক উপায় করতে পারবে।

ঘোড়া ছুটিয়ে এক ছোকরা সকালবেলা তেঁতুলতলায় এসে নামল। কাকে যেন জিজ্ঞাসা করছে, বিশ্বেশ্বর সরকার মশায়ের বাড়ি এটা?

বিশ্বেশ্বর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন, কোত্থেকে আসছ বাবা? কি দরকার?

ছেলেটা বিনয়ী। দাওয়ায় উঠে পায়ের ধুলো নিল। বলে, আমার নাম শ্রীসলিলকুমার মিত্তির। সাধনকুমার মিত্তিরের ছোট ভাই আমি। দাদা এই চিঠি দিয়েছেন আপনাকে। ছোট খোকার অন্নপ্রাশন—মানে, দাদার বড় মেয়ের ছোট ছেলে। অন্নপ্রাশন আমরাই দিয়ে দিচ্ছি। দাদা এখন আবৃত্তিকে বসবেন তাই নিজে আসতে পারলেন না। আমায় পাঠালেন। বিকেলে নিজে এসে আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

চিঠিতেও সেই কথা। অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বিশ্বেশ্বর ও পঞ্চানন উভয়ের পদধূলি দিতে হবে পাঁচপোতার বাড়িতে। রাতে সেখানে দুটি শাকভাতের আয়োজন হয়েছে। ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস থাকলে ঘোড়া পাঠাবেন, নয় তো পালকি। সাধন নিজে এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। ভাইকে আগেভাগে পাঠিয়ে খবরটা জানিয়ে রাখলেন।

অতএব এই খবর পাওয়া গেল, পঞ্চানন আসছে। এঁরা কিছু জানবার আগেই সাধন মিত্তির জেনে এসেছেন কলকাতা থেকে। এসে পৌঁছনোর আগেই নিমন্ত্রণ। সলিল বলে, আসেন নি এখনো? কি আশ্চর্য, ভোরবেলায় পয়লা বাসেই তো এসে পৌঁছনোর কথা।

কলকাতায় দাদার সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে ঠিকঠাক হয়েছে। এক সঙ্গেই আসছেন দু-জনে, তা পঞ্চাননবাবু একটু কাজে আটকে গেছেন। বাসই এসে পৌঁছয় নি বোধ হয়। হয় এক-একদিন—পথের মধ্যে বাস বিগড়ে বসে থাকে।

ছেলেটা ভালো সত্যিই। কথাবার্তা সরল, স্বাস্থ্যটা তাকিয়ে দেখবার মতন। ঘরে পাকা কাঁঠাল ছিল; সরমা তাড়াতাড়ি দুধ দুইয়ে ক্ষীর করে গরম ক্ষীর আর কাঁঠাল দিলেন খেতে। তা কোন সঙ্কোচ নেই ছেলেটার। যে পরিমাণ ক্ষীর-কাঁঠাল খেল, এঁরা কর্তা-গিন্নি আর মেয়ে তিন জনে মিলেও অতটা বোধ হয় পারেন না। এই অঞ্চলের মাতব্বর এরা, ব্যবসা করে বড়লোক। উল্টাডাঙায় পাট কলাই ও খেজুরগুড়ের আড়ত, সাধন থাকে সেখানে। সলিলও ছিল কলকাতায়, পড়াশুনো করত। পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে দেশে এসে থাকতে হয়েছে ব্যবসায়ের খাতিরে। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে ঘুরে চাষীদের দাদন দেওয়া, এবং দাদন অনুযায়ী বুঝসমঝ করে নেওয়া ক্ষেতের ফসল ঘরে উঠলে। লাভের বারো আনাই হল এই কেনাকাটার মুখে। দাদার কি—আড়তে গদিয়ান হয়ে বসে মাল ছেড়ে দিয়ে টাকাকড়ি বুঝে নেন শুধু। দালালে পাইকার জুটিয়ে আনে, সে জন্য তাঁকে নড়ে বসতে হয় না।

কাঁঠাল খেতে খেতে বোধ করি মিনিট দশেক সময়ের ভিতর ছেলেটা সমস্ত বলেকয়ে অবসর। ইলেকশনের শনি ভর করেছে দাদার কাঁধে। বাড়ি এসেছেন পরশু, এ-মাসটা থাকবেন। তার পরে চলবে আসা-যাওয়া। ভোট এসে গেলে তখন কায়েমি হয়ে বসতে হবে। পঞ্চাননের আসার কথাটা সাধন যুগচক্র অফিস থেকে জেনে এসেছেন। যুগচক্রের সঙ্গে আজকাল খুব দহরম-মহরম। যুগচক্র অমুক্তাক্ষ ডাক্তারকে গালাগালি দিচ্ছে, সেটা সাধনের পক্ষে

যাচ্ছে। এর পরে স্পষ্টাস্পষ্টি সাধনের হয়ে লিখবে, চোখে সর্ষে-ফুল দেখিয়ে দেবে অখুজ ডাক্তারের। কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেছে।

কাঁঠাল খেয়ে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে সলিল ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। মিশুক ছেলেটা—ব্যবসায়ে অনেক উন্নতি করবে। স্বাস্থ্য কি অপরূপ—বাঙালির মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায় এমন। সতীশ বলে, বংশ ধরেই ওরা এমনি। বড় ভাইয়েরও দেখবেন কেমন মুখ মিষ্টি। আর রীতপ্রকৃতি দেখুন—পরশু এসেছেন, আজই ভাইকে খবরাখবর নিতে পাঠালেন। আর আমাদের গাঁয়ে বড়লোক রয়েছে, তাঁদের ব্যবহারটা দেখুন। পুরোনো ভিটে জঙ্গল হয়ে পড়েছিল—জঙ্গল কেটে-কুটে দু-খানা চাল তুলেছেন, অমনি তাদের চোখ টাটাচ্ছে। টাকাপয়সা থাকলে কি হবে—দিল চাই। সে আসবে কোথেকে? রক্তের দোষ যে—হারামির বংশ।

সন্ধ্যার একটু আগে সাধন নিজে এলেন। ঘোড়ায় এসেছেন। একটু পরে পালকি এসে যাবে, পালকিতে যাবেন ওঁরা। সাধন বয়স্ক মানুষ—বিশ্বেশ্বরের সমবয়সিই হবেন—গড় হয়ে বিশ্বেশ্বরের পায়ে প্রণাম করলেন। কি করেন, কি করেন—বলতে বলতে বিশ্বেশ্বর পা সরিয়ে নিলেন, তার আগেই পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দেওয়া জিভে ঠেকানো হয়ে গেছে। একগাল হেসে সাধন বললেন, এত বড় ব্রাহ্মণের পদরজ পেলাম, ভাগ্য প্রসন্ন আমার উপর।

পঞ্চানন পৌঁছে গেছে। সলিল যা আন্দাজ করেছিল—বাস বিগড়ে আছে পথের উপর, খানিক পায়ে হেঁটে খানিকটা এক মাল বোঝাই লরিতে বসে অনেক কষ্টে ঠিক দুপুরবেলা এসে পৌঁছেছে। পঞ্চানন বলে, ব্রাহ্মণ কাকে বলছেন সাধনবাবু? কর্তা মশায়কে ব্রাহ্মণ ঠাউরে বসেছেন নাকি?

সাধন ঘাড় নেড়ে জোর দিয়ে বলেন, ব্রাহ্মণই তো। তাতে কোন সন্দেহ আছে? ওঁর চেয়ে বড় ব্রাহ্মণ কে? জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ—দিনরাত লেখাপড়া নিয়ে রয়েছেন—

পঞ্চানন বলে, পড়া আর নেই এখন, সে পাঠ চুকেবুকে গেছে। লেখাটা অবিশ্যি আছে, পেটের দায়ে রাখতে হয়েছে। বই-প্রবন্ধ নয়, দোকানের খাতা লেখা।

সাধন হাসতে লাগলেন: ঠিক, ঠিক—এমনিই তো বলতে হবে। নিরীহ পণ্ডিত মানুষ—কি দরকার ওঁর শত্রু বাড়িয়ে? আপনাদের যুগচক্র দেদার বিলানো হচ্ছে। লোকে জিজ্ঞাসা করে, বিষকুম্ভটা কে হলেন—কাশীশ্বরের কেচ্ছা যিনি লিখছেন? আমি হাসি। খোদ সম্পাদক বলেই ধরে নাও না হে। কিন্তু কেউ তা মানতে চায় না—গালিগালাজটা তাঁর হতে পারে, এত খবরাখবর পাবেন কোথা তিনি? ধারণা দেখ, ইচ্ছে করলে কৃতান্তবাবু পড়াশুনো করে এ সমস্ত জেনে নিতে পারেন না যেন।

পঞ্চানন বলে, লোকে কর্তা মশায়ের উপর সন্দেহ করছে। কিন্তু আমি বলছি, লেখেন নি উনি। ওঁর লেখায় ভারই থাকে, কথার এত ধার থাকে না। ওঁর 'ভারতে ইংরাজ', যে যত্ন করে পড়েছে, কক্ষণো সে অমন কথা বলবে না।

সাধন বলেন, বটেই তো, বটেই তো, ঐ তো বলতে হবে। আমরাও সেই চেঁচামেচি করি। তা গোলমালটা বেশি করছে সহদেব। সে-ই ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে—

অবহেলার ভাবে তারপর বললেন, ছড়াল তো বয়েই গেল। কার ভয়ে চাপতে যাবেন? আমি মশায় অত ঢাক-গুড়গুড় বুঝিনি। পরশু যখন আসছি, বাসের মধ্যে ক-জনে আমায় চেপে ধরেছে। চটেমটে আমি বলে দিলাম, বেশ হল তাই—বিশ্বেশ্বর সরকারই

বিশ্বকুম্ভ। ইতিহাসের খুঁটিনাটি নখের আগায় নিয়ে বসে আছেন, ওঁর লেখায় মিথ্যের খাদ নেই। বাংলা দেশে ঐ মানুষ অদ্বিতীয়।

বিশ্বেশ্বর রাগ করে বলেন, অমন কথা বলতে গেলেন কেন আপনি ?

সাধনও সমান তেজে বললেন, আপনারাই বা ভয় করতে যাবেন কেন ? সকলকে অম্বুজ ডাক্তার ভাববেন না—সত্যসন্ধ মানুষের মর্যাদা দেয়, এমন অনেক আছে দেশে। এই পাড়াগাঁয়েই আছে।

অনতিপরে পালকি এসে পড়ল। সত্যসন্ধ মানুষের মর্যাদা না দিয়ে অতএব ছাড়বেনই না সাধন মিত্তির। পালকি চেপে ভোজ খেতে যেতে হবে। বিশ্বেশ্বর ও পঞ্চানন দু-জনের দুটো পালকি। সাধন মিত্তির ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে পিছন পিছন যাবেন।

সকালবেলা হুমহাম করে জোড়া পালকি আবার ফিরে এলো। খাওয়াদাওয়া ও গল্পগুজবে অনেক রাত্রি হয়ে গেল, রাতটুকু আর আসতে দিলেন না ওঁরা। তোফা খাট-বিছানা—আরাম করে শোওয়া গেল। তিলেক অসুবিধা হয় নি। অতি মহাশয় লোক সাধনবাবুরা।

ইরাবতী শুনছিল। সে ফোঁস করে ওঠে, এই কথাই আরও একবার তুমি বলেছিলে অম্বুজ ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে। এ গাঁয়ে তাঁরাই প্রথম তোমায় নিয়ে এসেছিলেন। সেবারে কত জাঁক করেছিলে, অমন ভালো লোক হয় না।

বিশ্বেশ্বর পঞ্চাননকে সাক্ষি মেনে বলেন, তুমি তো সঙ্গে ছিলে হে ! সত্যি না মিথ্যে জাঁক করেছিলাম, বলো এদের। খালধারে মাঠের উপর প্রকাণ্ড সভা—যেদিকে তাকাই, নরমুণ্ড। কাদার উপরে খড় বিছিয়ে দিয়েও মানুষ বসেছিল। তেঁতুলতলার ওদিকটা গরুর

গাড়িতে গাড়িতে ভরে গিয়েছিল। রাজা-মহারাজার অত খাতির হয় না, কি বলো পঞ্চানন? ডাক্তারবাবু, তাঁর স্ত্রী, অরুণাক্ষ—কী যত্নটাই করলেন সকলে মিলে। গোলামনফরের মতো সবসুদ্ধ একেবারে তটস্থ।

ইরাবতী বলে, এখন এদের কাজ পড়েছে—এরাও আবার সেই রকম। কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজি—

কেমন তার মন-মরা ভাব। সাধন মিত্তিরের প্রশংসা সহজে নিতে পারছে না। বলে, তুমি হলে বাবা শিব-আশুতোষ। দুটো শুকনো বেলপাতা ছুঁড়ে দিলেই মনে কর, কী সোনা-মাণিকই না দিয়েছে।

ব্যাপার ঘোরতর হয়ে উঠছে। সাধন মিত্তির বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে শুধুমাত্র খাওয়ানো নয়, উপযাচক হয়ে বাড়ির গণ্ডগোলেরও সমাধান করে দিয়েছেন। সরমা বলেন, ঠাকুরের দয়া। নাতির অন্নপ্রাশন তাদের নিজের বাড়ি না হয়ে মামার বাড়ি হল, মিত্তিরমশায় কলকাতা থেকে এসে পড়লেন। এলেন বলেই তো কানে গেল, অখুজ ডাক্তার ভিটে থেকে আমাদের উৎখাত করে দিচ্ছে।

ইরাবতী টিপ্পনী কাটে: অন্নপ্রাশন না হলেও আসতে হত মা। না এসে এখন উপায় আছে? সাধনবাবুকে আসতে হবে বলেই তো নাতির অন্নপ্রাশন তাঁর বাড়িতে হল। সাত গ্রামের সমাজ ধরে নেমন্তন্নও হল।

সরমা চটে গিয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, পঞ্চানন হেসে থামিয়ে দেয়। বলে, মিথ্যে নয় মাসিমা, ইরা বলেছেন ঠিকই। যে বিয়ের যে মন্তোর। ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছেন সাধন—এসেম্বলির মেম্বর হয়ে দশের উপর মোড়লি করবেন, পুলিশে সেলাম করবে। এস. ডি. ও. হাত কচলে স্যার স্যার করবে। তাঁর আগে ওঁদেরও একটিবার দেশসুদ্ধ ভোটারের হাত-পা ধরাধরি করতে হবে। টাকা ঢালতে হবে। এই

কটা লোকজন খাওয়ানো শুধু? দিন ঘনিয়ে এলে কত কাণ্ড করবে দেখতে পাবেন।

সরমা বলেন, কিন্তু ভোটের ব্যাপারে আমাদের কি ক্ষমতা বলো। এত খাতির-যত্ন, অমন একটা বাড়ি পাকাপাকি লেখাপড়া করে দিচ্ছেন—

ইরা হেসে বলে, ক্ষমতা নেই কি বলছ? যতই না-না করি, জেনে বসে আছে যুগচক্রের ঐ গালিগালাজ করেছেন বাবাই। ভবিষ্যতের আরও বিস্তর আশা রাখে। বাতিল কাছারি বাড়িটা দিয়ে বিশ্বেশ্বর সরকারের সঙ্গে ভালো করে খাতির জমিয়ে রাখছে।

পঞ্চানন মৃদু ঘাড় নেড়ে বলে, খাতির ঐতিহাসিক সরকারকে কিনা, বলতে পারছিনে। কিন্তু মণিরামপুর তল্লাট থেকে দাঁড়িয়ে শহীদ রামনিধি সরকারের নাতিকে খাতির না করে উপায় নেই।

ইরাবতী হঠাৎ বলে, রামনিধির নাতির কন্যাদায় উদ্ধারের কোন কথা হল না পঞ্চানন-দাদা? ভোটে জেতার জন্য সেটাও তো উচিত। এই যে এক আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা আছে—যার যখন দায় পড়ে, সদয় হয়ে ঘরে তুলে নিতে চায়।

পঞ্চানন হাসতে লাগল: একেবারে হয় নি, বলি কি করে? কি বলেন কর্তা মশায়? ঠারেঠোরে হল—পয়লা দিনে বেশি এগুলে দৃষ্টিকটু লাগে। ওঁর ছোট ভাই সলিল—আমার তো মনে হয়, চাপাচাপি করলে তার সঙ্গেই হয়ে যেতে পারে। ছেলেটা তো এসেছিল এই বাড়ি, সবাই দেখেছেন, বলেন তো এগুনো যায়।

ইরা বলে, যা কিছু করতে হয় পঞ্চানন-দাদা, তাড়াতাড়ি কিন্তু। বাড়ি লিখে-পড়ে নেওয়া মেয়ের বিয়ে দেওয়া সমস্ত। যদি ধরুন—বিষকুম্ভের আসল পরিচয় বেরিয়ে যায়, তখন তারই খাতির হবে। আমাদের আর পুঁছবে না, পায়ে ধরে সাধলেও তাকিয়ে দেখবে না।

সরমা ধমক দিয়ে উঠলেন: বিয়েথাওয়ার কথার মধ্যে তোমায় ফোড়ন কাটতে ডাকা হয় নি তো। যাও তুমি এখান থেকে।

পঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে বাড়িটা ওঁরা দিয়ে দিচ্ছেন—কি রকম বাড়ি, শুনলে সে সম্বন্ধে কিছু?

পঞ্চানন বলে, পাকা বাড়ি। সাধনবাবু পাঁচপোতার তালুক কিনেছিলেন, সেই সময়টা কাছারিবাড়ি হবে বলে বাড়ির পত্তন করেছিলেন। তালুকমুলুক থাকছে না নতুন আইনে, তাই বললেন, চামচিকের বাসা হবে—তার চেয়ে এমন মানুষটি ঘরবসত করুন, আমার পুণ্য হবে। তা চলুন না, নিজেরাই দেখে আসি একদিন।

সরমা বলেন, ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দিন ঠিক কর তবে একটা। কম দুঃখে তোমায় আসতে লিখেছিলাম বাবা। গোমস্তা বাড়ির উপর এসে যখন তখন তড়পে যান। রাত্রে ঘুম নেই আমার, নিশি-পাওয়ার মতন ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াই। বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখি। বাতাসে পাতা নড়লে মনে হয়, ওদের দলবল বুঝি আগুন দিতে এসেছে। এঁদের কি, দিব্যি অসাড় ঘুম ঘুমান—যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে। আর আমার এদিকে মাথা খারাপ হবার জোগাড়।

পঞ্চানন বলে, কথাবার্তা কিছু বলতে হবে না—বাড়ি রয়েছে, দেখে এলেই হল। হাঙ্গামার কিছু নেই, নদীর উপরে বাড়ি, এখানকার ঘাট থেকে একটা ডিঙি নিয়ে একেবারে দালানের কানাচে গিয়ে ওঠা যাবে। পায়ে হাঁটার ব্যাপার নেই।

তাই হল। বাড়ি দেখতে গেলেন সরমা ও পঞ্চানন। বিশ্বেশ্বরের দোকানের কাজ, তাঁর সময় নেই। ইরা ইচ্ছা করেই গেল না। পাকা কুঠুরি একটা মাত্র—তিনদিকে রোয়াক। ইটের পাঁজা অদূরে। অনেক মতলব ছিল সাধন মিত্তিরের—অত বড় পাঁজা পোড়ানো দেখে

বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু জমিদারি থাকছে না দেখে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। সবই ভালো মোটামুটি—দোষের মধ্যে জায়গাটা ফাঁকা, পাড়া থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তা হলেও পাকা দালান তো! দরজায় খিল এঁটে দিলে অনেকখানি নিশ্চিন্ত—জতুগৃহের মতো পুড়িয়ে মারতে পারবে না। পছন্দ হয়েছে সরমার। বললেন, দলিলপত্র আগে হবে, তার পরে এখানে এসে উঠব কিন্তু। কোনদিন মন কষাকষি হলে এদের মতন তাড়িয়ে তুলতে না পারে।

পঞ্চানন বলে, দলিল হবে বই কি। কাঁচা দলিল নয়, নাম মাত্তোর মূল্য ধরে কবলা রেজেস্ট্রি করে দেবেন—সাধনবাবু নিজে থেকেই বললেন। টাকা হয়েছে, এখন ভদ্রলোক নামযশের ধান্দায় আছেন। কতবড় নাম হবে যে রামনিধির নাতিকে বসত করিয়েছেন তৈরি ঘরবাড়ি দিয়ে। অম্বুজ ডাক্তারের উপরও এক হাত নেওয়া হবে—পৈতৃক ভদ্রাসন থেকে ওঁর উৎখাত করছিলেন, সাধনবাবু ডেকে এনে ঠাঁই দিয়েছেন। এক বাড়ির ব্যাপারেই অম্বুজ ডাক্তার বারো আনা কাত।

হেসে উঠে বলে, যে যার তালে ঘুরছে, যা-কিছু করবার ইলেকশনের আগেভাগে হাসিল করে নিতে হবে। ইরা ধরেছেন ঠিকই—কাজ চুকে গেলে পরে তখন চিনতে পারবে না হয় তো।

ইরাবতী বাড়ি দেখতে যায় নি। একলা সে ঘরের মধ্যে। যুগচক্র-খানা নিয়ে নিরিবিলি বসল। আরও বার দুয়েক পড়েছে প্রবন্ধটা। কে এই বিবক্ত? নানান সন্দেহ মনে আসে। যুক্তিতর্ক আছে গোড়ার দিকে, 'ভারতে ইংরাজ'-এর পরিশিষ্ট বিশ্বেশ্বর যে ভাবে তৈরি করছিলেন হুবহু অবিকল তাই। কিন্তু তারপরেই খেধড়ক

গালিগালাজ। গালিই আসল উদ্দেশ্য লেখকের—কলমের ঝাল ছেড়ে দিয়েছে। গালি দিয়েছে কেবল কাশীশ্বরকে নয়, তাঁর নিরপরাধ উত্তরপুরুষদের ধরে ধরে। অম্বুজাক্ষের বংশ ধরে যেন লেখকের জাতক্রোধ। ওরা হীন, কারও বিশ্বাস-ভালোবাসার যোগ্য নয়—মুখ না দেখায় কখনো যেন জনসমাজে। অস্পৃশ্যতা আইন করে তুলে দেওয়া হয়েছে—কিন্তু স্বাধীন দেশে নতুন এক বর্ণাশ্রম হবে, জাতিদ্রোহী এরাই সেখানে অপাংক্তেয় অস্পৃশ্য।

কে লিখেছে? প্রবন্ধ পড়ে অম্বুজাক্ষ রাগ করেছেন, রাগ করে সহদেব গোমস্তাকে হুকুম দিয়েছেন ভিটে থেকে এদের তাড়িয়ে দিতে। সে রাগ অন্যায় নয় একটুও। সত্য উদ্‌ঘাটন করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়, লেখার অন্তরালে গুরুতর আক্রোশ লুকিয়ে আছে। ইরার খুব কষ্ট হচ্ছে—পিতৃপুরুষ পাপ করেছিলেন, তিনি কবে মরে ফৌত হয়ে গেছেন, দায় ঠেকতে হচ্ছে জীবন্ত এঁদের। কষ্ট হচ্ছে অরুণাক্ষের জন্য, তার ক্লিষ্ট মুখের ছবিটা মনের উপর ভেসে বেড়ায়। কার কাজ? কৃতান্ত লিখিয়েছে কাউকে দিয়ে? কিন্তু কাগজপত্র পাবে কোথায়? সে তো অরুণাক্ষ নিয়ে নিয়েছে।

দোকানের কাজ সেরে বিশ্বেশ্বর ফিরে এলে ইরা বলে, বাবা, কৃতান্ত কাকাবাবুকে তোমার কাগজপত্র দিয়েছিলে নাকি?

উহুঁ—

লেখার মধ্যে এইসব তবে পেল কোথায়?

বিশ্বেশ্বর বলেন, আমিও অনেক সময় তাই ভাবি। পরিশিষ্টের খানিকটা আমি কৃতান্তকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। কিছু কিছু টুকেও নিয়েছিল সে। জানতে চাইল কি কি আছে কাগজে। বলেছিলাম মোটামুটি। কিন্তু সে যে এত বড় শ্রুতিধর হয়েছে, শোনা মাত্রই মুখস্থ হয়ে যায়, সেটা তো জানিনে।

বিদ্যুৎ খেলে যায় যেন ইরাবতীর মনে। আবার পড়ল প্রবন্ধটা। আরও একবার। বুঝতে পেরেছে, আগে এটা মাথায় আসে নি তো! সেই লেখকের চেহারা দেখতে পাচ্ছে লেখার উপরে। অনেক দূরের বেদনাহত একটি মানুষ। আক্রোশ এক দাম্ভিক মেয়ের উপর। নিজের সর্বাঙ্গে ছুরি মারছে যেন মেয়েটাকে দেখিয়ে দেখিয়ে। দেখ, খুশি হও। বংশ ধরে কলঙ্ক ছিটিয়েছি। মরা মানুষ তো কাশীশ্বর, তাঁর আর কি হবে—আমার নিজেকে অবধি ডুবিয়েছি কালিতে। তোমার বাবা পারতেন না এ কাজ, কোন ঐতিহাসিক পারে না—বেদনা হত, মায়া লাগত।

জল ভরে এলো ইরাবতীর দু-চোখে।

কেন করবে তুমি এমন? আমার শ্বশুরকুলের লাঞ্ছনা করে আমায় শাস্তি দিচ্ছ? এই এক দজ্জাল মেয়ে—কী চোখে দেখেছ, কেন এত ভালোবাসা আমার উপর? চিরজীবন আমি তো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারব, এতে কি শাস্তি হবে তোমার? সুখী হবে?

কথাটা চাপা ছিল। কিন্তু সকালবেলা ঐ যে ডিঙি করে কাছারিকুঠি দেখতে গেলেন, তাই নিয়ে পাড়াপড়শির কৌতূহল জেগেছে। এত জায়গা থাকতে ওখানে ঘুরে কি দেখছিলেন? গিন্নিবান্নি কেউ কেউ সরমাকে জিজ্ঞাসা করেন। সরমা বলেন, আছি তো এই তেঁতুল-তলায় পড়ে—নদীর ওপারের ওদিকটা দেখা হয় নি। পঞ্চানন এসেছে—সে বলল, চলুন দেখে আসা যাক। একটা ডিঙিও পাওয়া গেল। কিন্তু এমন জবাবে মানুষ ভোলে না—বিশেষ করে পাড়াগাঁয়ের প্রতিবেশী। নৌকা করে অত দূরে স্বভাবের শোভা দেখে বেড়ানো—এসব এরা বুঝতে পারে না। তার পরে হঠাৎ নৌকা বেঁধে কাছারি-কুঠিতে নেমে পড়াই বা কি জন্য? সরমা অবাক হয়ে ভাবছেন, ভোরবেলা ঘুরে এলেন—তাঁদের চোখে তখন একটা মানুষও পড়ে নি। অথচ দেখা যাচ্ছে, তাবৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক দেখে ফেলেছে। লোকে বিশ্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার বলুন তো সরকার মশায়? সাধন মিস্তির নেমন্তন্ন খাওয়াচ্ছেন, তার পরেই ওদিকটার ঘোরাফেরা—কাছারিকুঠি নিয়ে কথাবার্তা চলছে নাকি কিছু? বিশ্বেশ্বর হুঁ-হাঁ করেন, মিথ্যে কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না, আবার আসল কথাও বলবার উপায় নেই। ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে নিষেধ করে দিয়েছে পঞ্চানন আর সরমা।

ক-দিন পরে সহদেব তেঁতুলতলায় এসে দাঁড়াল। সহাস্য মুখ, বরকন্দাজ একটি সঙ্গে। বলে, সরকার মশায় আছেন নাকি? আপোসেই তবে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছেন, কাছারিকুঠি গিয়ে উঠবেন?

ভালো হয়েছে, কানে শুনে খবরটা ঝালিয়ে নিতে এলাম। আপনার মতন লোকের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা—বাঁশদখল হবে, বন্দুক কাঁধে শিখসৈন্য উঠোনে মোতায়েন হবে—লোকে পছন্দ করত না, আমাদেরও খুব খারাপ লাগত। ভালোই হল, সব দিকে সুরাহা হয়ে গেল।

ইন্দ্রাবতী ঘরের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে করকর করে উঠল: কে বলে যাচ্ছি আমরা? মিথ্যে কথা। কি জন্যে যাব?

সহদেব হেসে বলে, সে কি আর আমি বলে দেবো? মুনাফার ব্যাপার, কেন যাবে না? অতটা জায়গাজমি, তার উপরে পাকা দালান মুফতে দিয়ে দিচ্ছে। তাই লিখে দিলাম ডাক্তারবাবুকে—নেমন্তন্নআমন্ত্রণ দানধ্যান এলাহি মচ্ছব—সাধন মিস্তির দাতাকর্ণ হয়ে পড়েছে।

একটু চুপ করে থেকে বলে, এক রকম ভালোই। যান চলে ওপারে। সাধন মিস্তিরের হয়ে কাজ করছেন, ডাক্তারবাবুর গালমন্দ করছেন কাগজে—এক তল্লাটে গিয়ে থাকুনগে সবাই, আমরা জেনে নিই, কে আপন কে পর। সেই মতো বুঝেসমঝে চলা যাবে।

সতীশের বাড়ির দিকটায় কটমট চেয়ে বলে, যে কজন গোলমেলে লোক আছে, সবাইকে একে একে গাঙ-পারে পাঠাব। এ পারে অসৎ লোকের জায়গা হবে না।

আর বলতে বলতেই কোন দিক দিয়ে সতীশ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, তেঁতুলতলায় কি করো গোমস্তা মশায়? ওটা বাড়ির এলাকার মধ্যে—এলাকা ছেড়ে সরকারি রাস্তায় নেমে এসো। এঃ—আবার বরকন্দাজ নিয়ে আসা হয়েছে!

রাগে কাঁপতে কাঁপতে সহদেব বলে, বরকন্দাজ কি দেখছ, আদালতের পেয়াদা আসবে, শিখ-সৈন্য এসে সার দিয়ে দাঁড়াবে—খোল আজা মজা জমবে তখন।

আদালতের পেয়াদা নিয়েই এলো তবে, এসে ঠেলা বুঝো। রামনিধির নাতিকে ভিটেছাড়া করা সোজা হবে না। আইনের বলে এসে এই ঘর যদি ভেঙে দাও, তোমার ডাক্তারবাবুর ঘরবাড়িও থাকবে না, স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিচ্ছি। এমনিই তো বলাবলি হচ্ছে, কাশীশ্বরের পরিচয়ে মাথা হেঁট হয়ে যায়—সেই মানুষের নিশানা থাকতে দেওয়া হবে না গাঁয়ের মধ্যে।

সহদেব বলে, খুব ভালো কথা। লড়ে দেখা যেত, কোনটা থাকে আর কি না থাকে। কিন্তু ভয় পেয়ে এঁরাই যে আগেভাগে সরে পড়ছেন। বোঝাবুঝি হয় কেমন করে?

আজ কদিন সতীশ ভুঁয়ের কাজে ব্যস্ত—বড্ড গোন পড়েছে, নাওয়া-খাওয়ার সময় পায় না। সারাদিন রোদে জলে দাঁড়িয়ে চাষ দেখে, সন্ধ্যার পরে ফিরে এসে মড়ার মতো ঘুমায়। এত ব্যাপারের কিছুই তার কানে যায় নি।

সত্যি?

সহদেব বলে, জিজ্ঞাসা করে দেখ। আমিও তাই বলি—মরদমানুষ হন তো নড়বেন কেন শেষ পর্যন্ত না দেখে? সরকার আইন-আদালত বানিয়ে দিয়েছে, উকিল-মোক্তার সেই আইন শিখে সামলা পরে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। গণ্ডগোল আপোস-নিষ্পত্তি হয়ে গেলে তাদের উপায়টা কি?

এত কথা দাঁড়িয়ে শোনবার ধৈর্য নেই, সতীশ ছুটে ঘরের ছাঁচতলা অবধি চলে যায়।

বলুন কর্তামশাই, বলো পঞ্চাননবাবু, সত্যি?

পঞ্চানন বলে, কথা একটু-আধটু হয়েছে সাধনবাবুর সঙ্গে। কাছারিকুঠিতে চামচিকের বাসা—মিত্তির মশায় তাই বললেন, ওখানে গিয়ে থাকলে কেমনটা হয়? নদীর ধারে অমন সুন্দর

জায়গার উপরে পাকাবাড়ি—তিনি সমস্ত নিঃস্বত্ব হয়ে দিতে চাচ্ছেন। এই অবস্থায় গণ্ডগোলের মধ্যে এখানে পড়ে থাকবার মানে হয় না।

সতীশ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে, গণ্ডগোল কোথায় দেখ তোমরা? মুখের ছুটো কড়কড়ানি—তাই অমনি গণ্ডগোল হয়ে গেল? কোমর বেঁধে আসুক না এগিয়ে কার ঘাড়ে কটা মাথা হিসেব হবে তখন।

ইরা এসে বলে, আমারও সেই কথা সতীশ-দা। বাস্তু ছেড়ে ও-পার পালাব না। তার চেয়ে—মা'র কথাই যদি সত্যি হয়, রাতদুপুরে ঘরে আগুন দিয়ে মারে—মান-ইজ্জত নিয়ে নিজের জায়গার উপর মরে পড়ে থাকব।

সতীশ ভ্রূকুটি করে: আগুন দেবে—মগের মুলুক পেয়ে গেছে! আগুন শুধু যেন ওদের হাতেই জ্বলে! বাজে কথা থাক। যাওয়া হবে না কর্তামশায়, স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিচ্ছি। আমরা এনে বসিয়েছি, বজায় রাখতে না পারলে আমাদের অপমান। পাড়াসুদ্ধ গ্রামসুদ্ধ সকলের অপমান। আমাদের জান থাকতে যেতে পারবেন না পাড়া ছেড়ে। যাওয়ার মতলব করলে তখন আমাদের সঙ্গেই লেগে যাবে, গ্রামসুদ্ধ মানুষের রাগ আপনার উপর পড়বে কর্তামশায়।

সরমা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। সতীশের কথা শুনে আর মেজাজ দেখে হৃৎকম্প লাগে। বিষম ফ্যাসাদ—জলে কুমির ডাঙায় বাঘের অবস্থা। কলকাতা ছেড়ে এসে কী বিপদে যে পড়া গেল—কোন দিকে পরিত্রাণ নেই। পঞ্চানন অবধি হকচকিয়ে যাচ্ছে।

সহদেব বলে, বেশ। ডাক্তারবাবুকে চিঠি দিয়েছিলাম, এঁরা গোলমাল করবেন না—ও-পারে উঠে যাচ্ছেন। আবার লিখে দিই, গোলমাল হবে। পেয়াদা এসে বয়নামা জারি করুক, তেঁতুল-তলায় কাড়া পিটিয়ে যাক ডুমডুম করে, খোদ ছোটবাবু শিখসৈন্য

নিয়ে এসে পড়ুন—যা করতে হয় করুনগে কর্তারা। আমার কি—আমি লিখে দিয়ে খালাস।

সহদেব লিখে পাঠাল সত্যিই, কিন্তু সে চিঠি কলকাতা পৌঁছবার আগেই ঠিক পরের দিন অরুণাক্ষ এসে পড়ল। আদালতের পেয়াদা কিম্বা শিখসৈন্যের দেখা নেই, এসেছে একলা একটি প্রাণী—দেখেশুনে সহদেব দমে গেল। হতে পারে পিছনে আসছে যাবতীয় দলবল। অথবা ভাবগতিক বুঝে দেখবার জন্য অম্বুজাক্ষ ছেলেকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ছোট একটা স্যুটকেশ, অরুণাক্ষ নিজেই সেটা হাতে করে এনেছে। সহদেব জিভ কাটে: কী কাণ্ড, কী কাণ্ড! নিজে বয়ে নিয়ে এলেন?

অরুণাক্ষ অভয় দিয়ে বলে, বাস পৌঁছতে দেরি করেছে—এত রাত্রে কেউ দেখতে পায় নি গোমস্তা মশায়। দেখলেও চিনতে পারে নি। তোমাদের ছোটবাবু স্যুটকেশ কাঁধে করে পথ হাঁটছে, চোখে দেখেও কেউ বিশ্বাস করবে না। ভাববে, ছোটবাবুর মূর্তি ধরে চলেছে অন্য কেউ। তোমাদের মান ষোল আনা ঠিক আছে, নিশ্চিন্ত থাক।

একটু খবর পেলেই আমি বরকন্দাজ নিয়ে হাটখোলায় গিয়ে থাকতাম।

অরুণাক্ষ বলে, যে জরুরি চিঠি দিলে, তার পরে খবরাখবরের সময় হল কই?

সহদেব আশ্চর্য হয়ে বলে, চিঠি তো কালকের ডাকে গেছে, এর মধ্যে পাবেন কি করে?

আগে যেটা দিয়েছিলে—

পর পর অনেক চিঠি লিখেছে সহদেব। ঠিক কোনটার কথা বলছে, বোঝা যায় না। কালকের ঠিক আগে যেখানা লিখেছিল, সেটায় ভালো খবর—আপোসে এঁরা সাধন মিত্তিরের কাছারিকুঠিতে উঠে যাচ্ছেন, সেই কথা। উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, আপনি একলা এলেন ছোটবাবু, আরও যে সব আসবার কথা ডাক্তারবাবু লিখেছিলেন?

অরুণাক্ষ বলে, কাদের আসবার কথা আমি তো জানিনে। বাবাকে বলেও আসি নি। আমি এই এলাম, আর দাদামশায় বোধ-হয় কাল-পরশুর মধ্যে এসে পড়বেন।

দাদামশায় হলেন তো গোবিন্দভূষণ দত্ত। শিখসৈন্যের বদলে বুড়োথুথ্‌ড়ে মানুষটা আসছেন। এখন কিছুই নন, কিন্তু পাকা মাথা নিঃসন্দেহ—সেকালের ডাকসাঁইটে আইনের ধুরন্ধর এই গোবিন্দ দত্ত। বিশ্বেশ্বর সরকারকে জব্দ করার নতুন কোন্ মতলব এঁটেছে কে জানে? যাই হোক, জানা যাবে সমস্ত ধীরে-সুস্থে। এ মণিরামপুর জায়গায় সহদেবকে বাদ দিয়ে কোন-কিছু হবে না।

ঘরের মধ্যে স্যুটকেশটা রেখে অরুণাক্ষ তখনই বেরিয়ে এলো।

বিশ্বেশ্বরবাবুর বাড়িটা কোন দিকে?

সহদেব বলে, ও-পাড়ায়। বাঁশের সাঁকো পার হয়ে যেতে হয়। তা এক্ষুণি কেন ছোটবাবু? হাত-পা ধুয়ে জিরোন, চায়ের জোগাড় করি—

না, এখনই—

এতই চটেছে যে হাত-পা ধোওয়ার সবুরটুকু সয় না। গিয়ে পড়ে হেস্তনেস্ত করবে। মনে মনে ভারি স্ফূর্তি সহদেবের। নারদ, নারদ! আচ্ছা রকম লেগে যাক—

অরুণাক্ষ বলে, এক্ষুণি যাব। কোন পথে যাব, একটু বাতলে দিন। এ জায়গা আমার একেবারে অজানা নয়।

সহদেব বলে, মুখে বলে কি হবে ছোটবাবু, নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে করে।

না, একা যাব আমি, একাই পারব। আপনি নয়, বরকন্দাজ নয়—কেউ সঙ্গে যাবে না।

আশাভঙ্গ হয় সহদেবের। কাণ্ডটা কি ঘটে—হাতে কিছু করতে না হোক, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখার ব্যাপারেও বাদ সাধছে।

অন্ধকার রাত ছোটবাবু, পথ বড্ড খারাপ—

সে তো বটেই। কলকাতার রাজপথ, পথের উপর গ্যাসের আলো কোথা পাওয়া যাবে পাড়াগাঁ জায়গায়?

কিছুতেই সঙ্গে নিল না, একা চলল ধূলি-পায়ে। সহদেব একবার ভাবে, গেলে হয় চুপিচুপি পিছন ধরে। কিন্তু এমন তাড়া দিচ্ছে—সাহসে কুলায় না, দৈবাৎ দেখে ফেললে রক্ষে থাকবে না তখন আর।

অন্ধকারে সাঁকো পার হওয়া যে কি ব্যাপার, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। একখানা বাঁশ ফেলে দিয়েছে এপার-ওপার, বৃষ্টিতে পিছল হয়ে আছে—এক পা রেখেছ সেই বাঁশের উপর, আর এক পা আন্দাজমতো এগিয়ে দিচ্ছ সন্তর্পণে। হাতে ধরবার আর একটা বাঁশ উপর দিকে, সেটা নড়বড় করছে। তার উপর তিলেক ভার না পড়ে—তবে তো ছিঁড়ে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে; অতি-আলগোছে এই বাঁশে হাতে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে যেতে হবে।

অনেক দুঃখে সাঁকো পার হল। শুঁড়িপথ—বর্ষার জলে দু-ধারের গাছপালা বেড়ে প্রায় ঢেকে গেছে পথটুকু। পথ না জঙ্গল সন্দেহ হয়। ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছ পড়বে এমনি এক পথের পাশে, তারই খানিকটা দূরে দোচালা খোড়োঘর। হাঁ, অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে বটে একদিকে, সেই জায়গা। যাবার পথ পাচ্ছে না—জল ভেঙে ম্যাচ-ম্যাচ করে জঙ্গল মাড়িয়ে চলল। ও হরি, কোথায় তেঁতুলগাছ—

বাঁশবন। যে দিকে এগুতে যায়, বাঁশঝাড়ে আটক পড়ে। বিশ-তিরিশটা বাঁশঝাড় জায়গাটা গোলক-ধাঁধার মতন করে রেখেছে। মানুষ দেখেই বুঝি ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বুনো-শুয়োর বেরিয়ে গেল কয়েকটা। চিরকাল শহরে মানুষ—শুয়োর দেখে হৃৎকম্প। বাঁশ বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে হাত-পা কঞ্চিতে ছড়ে গেল। কি জায়গা রে বাবা, সন্ধ্যারাত্রেই এই অবস্থা। এখন মনে হচ্ছে, সহদেবকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল। বিশ্বেশ্বরের বাড়ি অবধি গিয়ে তাকে ফেরত পাঠানো চলত।

বাঁশঝাড় থেকে বেরিয়ে এসে অনেক ঘোরাঘুরির পর এক গৃহস্থের ঘরকানাচে এসে পড়ল। ঘ্যস-ঘ্যস করে আওয়াজ হচ্ছে, টেমি জেলে উঠানে বঁটি পেতে কলার গাছ কুচি কুচি করছে একজন লোক। গরুর খাবার রাত্রিবেলাকার। হাঁফাতে হাঁফাতে অরুণাক্ষ এলো সেখানে।

বিশ্বেশ্বর সরকারের বাড়ি—

লোকটা হাঁ করে তাকায়। চাষী শ্রেণীর লোক, বুঝে উঠতে পারছে না। অরুণাক্ষ আরও পরিষ্কার করে দেয়, তেঁতুলগাছ-ওয়ালা বাড়ি, অল্পদিন এসেছেন তাঁরা।

ও, রামনিধির ভিটেয় যাঁরা এসে আছেন—কর্তামশায় ?

অতএব আর না জানবার কথা। ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বর ও তাঁর কুঁদুলে মেয়েটাকে না জানুক, আশি-নব্বুই বছর আগে রামনিধি নামক তাঁদের আপন লোক একজন ছিলেন, তিনি কারও অজানা নন এই বড় তল্লাটের মধ্যে।

অরুণের চেহারা ও বেশভূষার দিকে তাকিয়ে লোকটা বলে, মশায়ের আসা হল কোথা থেকে ?

কলকাতা থেকে। পাড়াগাঁয়ে চলাফেরা তেমন অভ্যাস নেই, পথের গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

চকিতে লোকটা অরুণের দিকে টেমি তুলে ধরে। নিরিখ করে করে দেখে।

কলকাতা থেকে এসে হাঙ্গামা করবে শুনতে পাচ্ছি, মশায় কি তাই ?

কর্কশ কণ্ঠস্বর—যেন আর এক মানুষ বলছে, আগের সে জন নয়। বলে, ডাক্তারবাবু দাঙ্গার লোক পাঠাচ্ছে, মশায় বুঝি সেই দলের ?

অরুণাক্ষ তাড়াতাড়ি বলে, না না, আমি ভালো মানুষ—আমি উল্টো দলের। হাঙ্গামা করতে এসে কেউ বুঝি রাত্রিবেলা একা একা ঘোরে ? বড্ড দরকার ওখানে, পথটা একটু ভালো করে বাতলে দাও ভাই।

বটেই তো। কথাগুলো লোকটার মনে লেগেছে, সে বিশ্বাস করল। রাস্তা অবধি গিয়ে দেখিয়ে দিয়ে এলো। পাড়ার মধ্যে এসে গেছে অরুণ। সামান্য একটু এগিয়ে ডাইনে মোড় ঘুরবে।

মোড় ঘুরে সেই নিশানা—বড় তেঁতুলগাছ, এবং তেঁতুলতলার অদূরে একটু যেন আলোও। কাছে এসে আলোটা স্পষ্ট হল। অকুল সমুদ্রের মধ্যে লাইট-হাউস দেখে এমনি ফূর্তি হয় বুঝি! আরো আসে এগিয়ে—উঠানে এসে উঠল। খোড়োঘরের দাওয়ায় হেরিকেন জ্বালিয়ে কে এক মানুষ খাতা খুলে কি লিখছেন। মানুষ অপর কে হতে পারেন, ওই প্রকাণ্ড খাতায় এমন মনোযোগে লিখে যান যিনি ? বিশ্বেশ্বর সরকার। তাঁর যা কাজ, তাই করে যাচ্ছেন। এত দূরে পাড়াগাঁয়ের জঙ্গল রাজ্যে এসেও অভ্যাস ছাড়েন নি।

এতক্ষণের এত কষ্ট কোথায় যেন তলিয়ে গেল, হাসি ফুটল অরুণাক্ষর মুখে। আহা, সাধক মানুষ—হাত থেকে কলম কেড়ে নেওয়া মানেই মেরে ফেলার সামিল এই সব মানুষকে।

আস্তে আস্তে অরুণ দাওয়ার প্রান্তে গিয়ে বসেছে। একে অন্ধকার, তায় ঐ স্বভাবের মানুষ। বিশ্বেশ্বরের ঘাড় নিচু করে যেমন ছিলেন, লিখে যাচ্ছেন তেমনি। কতক্ষণ কাটল। কী অন্ধকার চারিধারে—তেঁতুলগাছটা থাকায় যত অন্ধকার জমজমাট হয়েছে এই বাড়িতে। জোনাকি ঝিকমিক করছে তেঁতুল-ডালে, উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে বাড়ির এখানে-ওখানে। গোটা কয়েক দাওয়ার উপর এসে ঘুরতে লাগল।

ছোট্ট রান্নাঘর। কাঠের উনুন দাউদাউ করে জ্বলছে, ঝাঁপের দরজা দিয়ে আগুনের আলো একফালি এসে পড়েছে উঠানে। ছ্যাৎ-ছ্যাৎ করে কি-একটা ভাজাভুজি হচ্ছে যেন। ক্ষণপরে মিষ্টি সুরে—সুরের মধ্যে সুধা ঢেলে দিয়ে—ইরাবতী ছাড়া এমন কণ্ঠে কেউ ডাকতে পারে না—মিষ্টি সুরে ইরা বিশ্বেশ্বরকে ডাকছে, জায়গা হয়েছে বাবা, চলে এসো—

বিশ্বেশ্বর বললেন, যাই—। একই ভাব সেই চিরকালের। বললেন বটে যাই—বলতে হয় তাই বলা, ইরাবতীর কথা মন অবধি পৌঁছায় নি, খসখস করে লিখে চলেছেন। অরুণাক্ষ আরও খানিকটা সরে এলো বিশ্বেশ্বরের দিকে, কাছ ঘেঁষে বসেছে, উঁকি দিয়ে দেখছে কি এমন লেখায় মগ্ন। কিন্তু তাঁর নজরে কিছুতে পড়ে না।

ওদিকে আরও বার দুই তাগিদ হল রান্নাঘরের দিক থেকে। শেষটা রণমূর্তিতে ইরা বেরিয়ে আসে। হাতে চেলা কাঠ—গণ্ডা লেড়েক বিড়াল পালাচ্ছে আগে আগে। বিড়াল তাড়াচ্ছে ইরাবতী। তারপর দাওয়ার দিকে এলো।

যাবে কিনা বলো বাবা। বিড়াল ঠেঙিয়ে পারিনে—অসাবধান হলেই মাছটাছ নিয়ে পালাবে। খাতা লেখা তো সর্বক্ষণ আছে। রাত্রি জেগে এখন আর কাজ নেই, কাল লিখো।

বাপের মতো নয় ইরা। সে দেখতে পেয়েছে পাশে-বসা মানুষটাকে। চেনে নি প্রথমটা। কালিতে আছন্ন হ্যারিকেনের সামান্য আলো—লোকটার মুখ অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। মুখ হয়তো বা ইচ্ছে করেই সরিয়ে নিয়েছে ইরাকে দেখবার পর।

কে ওখানে ?

মেয়ের কথায় বিশ্বেশ্বরও মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করেন, কে তুমি ?

ইরাবতী বলে, কখন এলেন ?

অরুণাক্ষ বিশ্বেশ্বরের পায়ের ধূলা নিল। গলা শুনে সরমা দরজায় দাঁড়িয়েছেন, বাইরে আসছেন না। উঠে তাঁকে প্রণাম করতে গেল তো দু-পা পিছিয়ে গেলেন তিনি। বলে, এক্ষুণি এলাম মাসিমা, দশ মিনিটও হয় নি। আপনারা ভালো আছেন ?

সরমা চুপ করে রইলেন। ইরা বলে, একলা এলেন যে ?

বাড়িতে পা দিতে না দিতে সহদেবও ঠিক এই কথা জিজ্ঞাসা করল। এখানে এক চাষীর কাছে আপনাদের বাড়ির খোঁজ নিচ্ছিলাম। সে-ও ওই বলল। অনেক জনের জুটেপুটে আসবার কথা বুঝি ?

ইরা বলে, হ্যাঁ, শিখ-সৈন্য আসবে, টোটার বন্দুক আসবে, আদালতের পেয়াদা তো আসবেই। ঘর ভেঙে ফেলে চালে আগুন দেওয়া হবে, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে পথে বের করে দেওয়া হবে আমাদের—

উঃ, অনেক কাণ্ড হবে তো। আমি এসব কিছু জানিনে।

ইরাবতী বিস্ময়ের ভান করে বলে, বলেন কি ? ঝগড়া-বচসা, হাঙ্গামা তো বটেই—হয়তো বা খুনোখুনি শেষ পর্যন্ত। আপনিই হলেন সেনাপতি !

অরুণাক্ষ গম্ভীর হয়ে বলে, যে কাণ্ড দেখছি, খুনোখুনি হওয়া বিচিত্র নয়। মেজাজ ঠিক রাখা সত্যি মুশকিল।

সরমা পাথর হয়ে শুনছেন। ইরার ভয়ডর নেই, সে হাসছে। আবেগে অরুণের কণ্ঠ কাঁপতে লাগল। বলে, হ্যাঁ, ঝগড়াই করব। যেশোমশাইকে দিয়ে জমাখরচ নকল করাচ্ছেন। গোড়ায় ভেবেছিলাম ওঁর নিজের কোন লেখা।

ইরাবতী শান্তভাবে সংশোধন করে দেয় : জমাখরচ নয়—ইনকাম-ট্যাক্সের খাতা। হাটখোলার এক দোকানদারের। পনের টাকা দেয় মাসে মাসে। তেল-নুন আর হাটখরচা হয়ে যায়।

অরুণাক্ষ বলে, সহদেবের চিঠিতে অবস্থার কিছু আঁচ পেয়েছিলাম। কিন্তু এ জিনিস স্বপ্নে ভাবা যায় না। শালগ্রাম-শিলা দিয়ে বাটনা বাটার ব্যাপার। দোকানের খাতা লিখছেন অত বড় মানুষটা। জেদ করে গাঁয়ে এসে পড়ে এই হাল করেছেন।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, আমাদের অপরাধের অন্ত নেই। সেই কাশীশ্বর থেকে চলেছে। বাড়িটা কেনা হল—কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনাদের অপমান হবে ভাবি নি কেউ আমরা। অত শত তলিয়ে দেখি নি। আবার এই সামান্য খোড়োঘরখানাও ছেড়ে চলে যাচ্ছেন নাকি কোথায়। কিন্তু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হয় বলতে পারেন? সেই কথাটা শোনবার জন্য চলে এসেছি। দাদামশায়ের কাছে যাচ্ছি বলে সোজা চলে এসেছি এখানে। জবাবটা নিয়ে তারপর যেখানে হয় যাব।

ইরার চোখ ছলছল করে আসে। রাতের বেলা এখন কেউ দেখতে পাচ্ছে না। সামলে নিয়ে হাসির মতো ভাব করে সে বলে, হাঁটুভর কাদা—ঝগড়া করতে সোজা চলে এসেছেন, হাত-পা ধোবারও সবুর সয় নি বোধহয়।

কাদা-মাখা কাপড়চোপড় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে চেয়ে অরুণাক্ষ বেকুব হল। বলে, পুকুরঘাট কোনদিকে যদি দেখিয়ে দেন।

ইরা বলে, ঘাটে গিয়ে সুবিধে হবে না। ধুয়ে-মুছে এতটা পথ আসতে আবার কাদা লেগে যাবে। তার চেয়ে দাওয়ায় বসে গাড়ুর জলে হাত-পা ধোন, কাপড়টাও ছেড়ে ফেলুন।

গাড়ু-গামছা বের করে দিল ইরা। বিশ্বেশ্বরের সাদা ধুতিও এনে দিল একটা। হেসে বলল, শাড়ি দিলে ঠিক হত। মনে আছে, একদিন আমি জলে ভিজে আপনার ঘরে গিয়ে উঠেছিলাম, আপনি ধুতি পরতে দিয়েছিলেন? আপনাকে শাড়ি দিলে সেদিনকার শোধবোধ হত।

ইতিমধ্যে এক-ছুটে গেল একবার রান্নাঘরে। সরমা সেখানে। ফিরে এসে বলে, হল আপনার? উঠুন, উঠুন। ওঠো বাবা—

আলো আর দু-জন বরকন্দাজ নিয়ে এমন সময়ে সহদেব এসে পড়ল।

দেরি হচ্ছে দেখে চলে এলাম ছোটবাবু। ধুলো-পায়ে বেরিয়ে এলেন, এক ঢোক জলও খেলেন না। রান্নাবান্না হয়ে গেছে, চলুন।

খাচ্ছি আমি এখানে।

সহদেব আশ্চর্য হয়ে বলে, কেন—এখানে কেন?

অরুণাক্ষ বলে, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। না খেয়ে এক পা নড়তে পারছিনে। একটু বসুন আপনারা, পাঁচ মিনিটে খেয়ে আসছি।

ইরাবতী বলে ওঠে, ভয় নেই গোমস্তা মশায়। সামান্য ডাল-ভাত—বিষটিষ দেবো না। তা ঘর ভাঙুন, কিম্বা যত শত্রুতা-ই করুন আমাদের সঙ্গে।

সহদেবরা দাওয়ায় অপেক্ষা করছে। রান্নাঘরের মধ্যে অরুণাক্ষ ও বিশ্বেশ্বর পাশাপাশি খেতে বসলেন।

খেতে খেতে অরুণাক্ষ বলে, পঞ্চানন এখানে ছিলেন শুনলাম, তাঁকে দেখতে পাচ্ছিনে—

সরমা বললেন, আজকেই চলে গেল। তার নিজের কাজকর্ম আছে, এখানে পড়ে থাকলে চলবে কেন ?

ইরা মুখ টিপে হেসে বলে, সত্যি, বড্ড আপন হয়ে গেছেন পঞ্চানন-দাদা। কোন-কিছু দায় পড়লে তক্ষুণি ছুটে আসেন। আসা-যাওয়া কতবার যে হল তাঁর—

তিক্ত কণ্ঠে অরুণ বলে, জানি—সমস্ত জানি। সহদেব লিখতে কিছু কসুর করে না। তাঁরই ষড়যন্ত্র। নদী-পারে সাধন মিস্তিরের বাড়িতে নিয়ে তুলছেন, আমাদের সঙ্গে মুখ-দেখাদেখির সম্পর্কটুকুও যাতে না থাকে।

ইরা বলে, জায়গা তো চাই একটা। আপনারা থাকতে দেবেন না, বন্দুক-টন্দুক নিয়ে এসে পড়ছেন, তাই তো পঞ্চানন-দাদা বললেন—

সরমা বাধা দিয়ে বলেন, না বাবা, পঞ্চানন কিছু জানত না। আমিই চিঠি লিখে তাকে এনেছিলাম। এ ভিটেয় তোমরা কিছুতে থাকতে দিচ্ছ না। তুমি না জানতে পার—তোমার বাবা জানেন, তিনিই করাচ্ছেন সব। তোমাদের নামে কে গালিগালাজ ছাপিয়েছে। তোমরা ধরে নিয়েছ ওঁরই লেখা। তাইতে জাতক্রোধ।

বিশ্বেশ্বর মুখ তুলে প্রশ্ন সহসা করেন, আচ্ছা, বিষকুম্ভ লোকটা কে বলতে পার অরুণ? কাগজপত্র সমস্ত তোমার কাছে, সে লোক অত খবর পায় কোথা? কাগজপত্র আর কাউকে দিয়েছ নাকি তুমি?

ইরাবতী ভালোমানুষের মতো বলে, জানা থাকে তো বলে দিন অরুণবাবু, কে ঐ বিষকুম্ভ। ভারি বজ্জাত লোকটা। কাশীশ্বরের দোষে একেবারে আপনাকে অবধি জড়িয়ে গাল পেড়েছে। জানেন কিছু লোকটার সম্বন্ধে ?

অরুণ ঘাড় নিচু করে গ্রাসের পর গ্রাস মুখে তুলছে। শুনতে পায় না যেন কিছু। একটুখানি অপেক্ষা করে ইরা বলে, আপনি জানেন না—আমি তবে বলে দিই।

বিশ্বেশ্বর বলেন, জানিস তুই? কই, আমায় বলিস নি এদ্দিন। কে বল্ তো শুনি, কোথায় থাকে?

মুখ টিপে হেসে ইরাবতী বলে, বেশি দূরে যেতে হবে না বাবা। তোমার পাশে যে শান্ত মানুষটি ঘাড় গুঁজে খেয়ে যাচ্ছেন। আসামি ইনি।

বিশ্বেশ্বর অবাক হয়ে অরুণাক্ষের দিকে তাকালেন: যুগচক্রের লেখাটা অরুণ লিখেছ? হ্যাঃ, তাই কখনো হতে পারে।

সরমা বলেন, ওদেরই বংশ ধরে গালিগালাজ—ও লিখতে যাবে কেন?

বিশ্বেশ্বর বলেন, ইতিহাসে বড় নিষ্ঠা অরুণের। ও লেখে তো ইতিহাসই লিখবে, গালিগালাজ কেন লিখবে?

ইরা বলল, আক্রোশ থাকলে লেখে বাবা, কাউকে জব্দ করতে হলে লিখতে হয়।

কণ্ঠ শুনে অরুণ চমকে তাকায়। সভয়ে দেখে, মেঘ জমে আসছে যেন। তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দেওয়ার ভাবে বলে, ধরুন, লিখেই থাকি যদি আমি—দুনিয়ার আর কাউকে ছুঁয়ে তো কিছু লিখি নি। জব্দ হয়ে থাকি, নিজেই হয়েছি।

ইরা বলে, এ হল ছুরি নিয়ে নিজের আষ্টেপিষ্টে মারা। আক্রোশ যাদের উপর, তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে। কত রক্ত ঝরছে এই দেখ, সাধ মিটিয়ে দেখে নাও সকলে। বলো দিকি মা, এর চেয়ে জব্দ আর কেমন করে করা যায়?

সরমা এসব হেঁয়ালি-কথার মানে বোঝেন না। বললেন, দিন কয়েক আগে তোমার দাদামশায় এসেছিলেন বাবা। পুরানো কথাবার্তা আবার নতুন করে তুললেন। কত আদর করলেন ইরাকে কাছে বসিয়ে। তার পরেই গণ্ডগোল—

ইরা বলে, কাকে কি বলছ মা? দাদামশায় বড় ভালো, তাঁর সঙ্গে অন্য কারো তুলনা? তিনি যা বললেন, সে তো ইচ্ছে নয় কারো! নরকের কীট বলে নিজেদের জাহির করা হয়। মতলব হল, ঘেন্না করে কাছে না আসে যাতে কেউ—

অরুণাক্ষ নিঃশব্দে শুনছিল। ইরার কথা শেষ হয়ে গেলে বলল, কাল দাদামশায় আসছেন। খারাপ লোক সত্যিই আমরা—নিজে কষ্ট পাই, অন্যদের কষ্ট দিই। দাদামশায় সত্যি ভালো। যা বলবার তিনি বলবেন, আপনাদের জবাব তাঁর কাছে দিয়ে দেবেন।

ঘাড় ফিরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বলল, এই যে, আমার হয়ে গেছে সহদেব। এইবারে যাব।

—উনিশ—

গোবিন্দভূষণ এলেন। পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল—রাত্রে কিছু হল না, হবার কথাও নয়, শুধু একটা খবর পাঠানো হল বিশ্বেশ্বরের বাড়ি। সকালবেলা অরুণাক্ষকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হলেন। হাসির দাপটে আধ মাইল থেকে টের পাওয়া যায়, আসছেন মানুষটি। উঠানে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, কুটুম্বরা এসে গেছি। আসুন সরকার মশায়, বসতেটসতে দিন।

বিশ্বেশ্বর মাছের চেষ্টায় জেলেপাড়া গিয়েছিলেন। ফিরে এসে পা ধুচ্ছেন রান্নাঘরের ছাঁচতলায়। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বসবার ব্যবস্থা আগে থেকেই আছে দাওয়ায়—জলচৌকি রয়েছে, সতরঞ্চি ও চাদর পেতে একটু ফরাসের মতনও করা হয়েছে। ইরা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছিল—পলিতকেশ হাসিমুখ সেই সৌম্য মানুষটি—অন্তরটাও বাইরের দেহবর্ণের মতো উজ্জ্বল। বুড়ার নজরে কিছু এড়ায় না, দেখে ফেলেছেন ইরাকে। হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, জোড়া বেঁধে এসেছি দিদিভাই। কাকে পছন্দ করবে, দেখছ বুঝি ঠাহর করে? তাই তো নাতিকে সামাল করছিলাম—আমার পাশাপাশি যেও না ভাই, হেরে যাবে। মালা আমার গলায় পড়বে, তাকিয়েও দেখবে না তোমার দিকে।

অরুণ মৃদুকণ্ঠে বলে, যে গলায় হোক মালাটা তাড়াতাড়ি ফেলতে বলুন দাদু। পঞ্চানন অন্য কোথায় নিয়ে ফেলবার মতলব পাকাচ্ছে, সেইটে বন্ধ হয়ে যাক।

তাকিয়া টেনে নিয়ে গোবিন্দ ফরাসের উপর গদিয়ান হয়ে বসেছেন। বিশ্বেশ্বরকে ডেকে পাশে বসালেন: বসুন মশায়, দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে হয় না। কথাবার্তা শেষ করে একেবারে আশীর্বাদ সেরে যাব। বিয়ের আর মাত্র দুটো তারিখ এ মাসে। তার পরেই অকাল পড়ে যাবে। একটা তারিখ হাতে রেখে দিন স্থির করতে হয়। গেরোর কথা বলা যায় না, যদি ধরুন কোন গতিকে প্রথম তারিখটা ফসকে গেল। আমাদের কথা আমরা সব বললাম, এইবারে আপনাদের মতের অপেক্ষা। 'হাঁ' বলে দিলে সহদেব গিয়ে পুরুত ঠাকুরমশায়কে নিয়ে আসবে। সওয়া-ন'টা থেকে তিনটে-সাতাশ অবধি ভালো সময়। তার মধ্যে কনে-আশীর্বাদ। পাত্র-আশীর্বাদ করতে চান তো তা-ও সেরে নিতে পারবেন এই জায়গা থেকে। এক পা-নড়তে হবে না।

আবার এক-চোট হাসি। কাল রাত্রিবেলা সহদেব এমনি ব্যাপারেরই আঁচ দিয়েছিল। তবু বিশ্বেশ্বর ইতস্তত করেন: এত তাড়াতাড়ি—মানে ধরুন, আমার হলগে মেয়ের বিয়ের ব্যাপার—

অধীর কণ্ঠে গোবিন্দ বলেন, আর 'কিন্তু' শুনব না—বুড়ো-অথর্ব মানুষ, বারম্বার ছুটোছুটি করবার তাগত নেই। টালবাহানা বিস্তর হয়েছে। আমার জামাই দেরি করে করে সমস্ত পণ্ড করে দিচ্ছিল। এই এক বনবাসে এসে রয়েছেন, আবার কোন তেপান্তরে পালাবেন। ওসব চলবে না মশায়। জোর করে আটকাবার এক্তিয়ার নেই—কর-জোড়ে দরবার করতে এসেছি, নিতান্তই যাবেন তো মেয়েটিকে আগে দিয়ে যান আমাদের।

সরমা মৃদুকণ্ঠে এবার বলেন, অরুণের বাপ-মায়ের মত হয়েছে?

গোবিন্দ নিশ্চিন্ত ভাবে বললেন, না হবার কি আছে? জিজ্ঞাসা করে দেখি নি অবশ্য। তারা ছেলে-মেয়ে আমার—আমি আশীর্বাদ করে যাবার পরেও তারা 'না' বলবে, এতদূর সাহস

হবে না। আর হয়ও যদি, আমার শ্বশুরবাড়ি আছে—দিদিভাই সেইখানে রাজরাজেশ্বরী হয়ে উঠবে। একটা মাত্র দায় থাকবে, আমাদের বুড়ো-বুড়িকে দু-বেলা দু-মুঠো করে খেতে দেওয়া।

হাসতে লাগলেন তিনি। বলেন, ওসব কিছু ভাবছিনে। ভাবনার ব্যাপারই নয়। আপনি আর সরকার মশায় যতক্ষণ সদয় হয়ে মত না দেবেন, এই দাওয়া থেকে নামব না। এমনি করে বসে থাকব—তা সে যত দিন যত মাস যত বছরই হোক। নাতি আর আমি সেই যুক্তি করে সাতবেড়ে থেকে এতটা পথ ভেঙে এসেছি।

অরুণাক্ষের দিকে তাকালেন সরমা। মিনতি-ভরা চোখে সে চেয়ে আছে। হাসি চেপে সরমা বললেন, তা হলে থাকুন বসে এমনি। পরশু রাতে অরুণ একেবারে নুন-ভাত খেয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া হোক, তার পরে যা বলবার বলব আমরা। তিনটে-সাতাশ অবধি সময়, ব্যস্ত কি!

খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা যে সহদেব করছে!

মানা করে পাঠান। গোমস্তা মশায়ও এখানে খাবেন। ঝগড়া করতে আসেন, আর আমাদের কাছ থেকে অকথা-কুকথা শুনে যান—অশান্তি-গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। আজকে মিটমাট হয়ে গেল।

গোবিন্দর ইতস্তত ভাব দেখে সরমা আবার বললেন, উপায় নেই বাবা। সেই যুক্তিই তো করে এসেছেন—পাকা-কথা না পাওয়া পর্যন্ত নড়তে পারছেন না।

বলে হাসতে হাসতে তিনি রান্নাঘরের দিকে চললেন।

অম্বুজাক্ষের রোগি দেখে ফিরতে বেলা গড়িয়ে যায়। বাড়ির খাওয়াদাওয়ার পাট ততক্ষণে চুকে যায়, একা সুহাসিনী অপেক্ষা

করেন শুধু। তাঁকেও অম্বুজাক্ষ খেয়ে নিতে বলেন, কিন্তু সুহাসিনী কানে নেন না।—তোমার বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যে খাবার খেয়ে নিই। ন'টায় গুচ্ছেরখানেক গিলে খিদে পায় না না। খেয়ে থাকি বুঝি তোমার জন্য—গলা দিয়ে নামতে চায় না, কি করব?

স্বামীকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সুহাসিনী উপরে চলে যান। বৈঠকখানার পাশের কুঠুরিতে ছোট একটু খাট পাতা আছে, অম্বুজাক্ষ সেখানে গড়িয়ে পড়েন। হরিহর গড়গড়ায় অম্বুরি-তামাক সেজে দেয়, চোখ বুঁজে বুঁজে টানেন তিনি। তারপর এক সময় তামাক টানার কড়কড়ানি বন্ধ হয়ে নাসাধ্বনি আরম্ভ হয়, নল পড়ে যায় হাত থেকে। হরিহর টিপিটিপি আবার এসে গড়গড়া সরিয়ে নিয়ে যায়। বলা আছে, নিতান্ত মুমূর্ষু রোগি ছাড়া ঘণ্টা দুই এ-সময়ে তাঁকে কেউ বিরক্ত না করে।

আজকে সুহাসিনী উপরে না গিয়ে এই ঘরে চলে এলেন। অম্বুজাক্ষ ইতিমধ্যেই চোখ বুঁজেছেন। অভ্যাসমতো নলে টান দিচ্ছেন এক একবার। সুহাসিনী খাটের বাজু ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ডাকাডাকি করে ক্লান্ত মানুষটির ঘুম ভাঙাতে কষ্ট হয়। অথচ এসেছেন এই জন্যে—বলতেই হবে সব কথা। হাত নেড়ে চুড়ি বাজিয়ে শব্দসাড়া দিলেন।

অম্বুজাক্ষ চোখ না খুলে জড়িতস্বরে বললেন, কি?

অরুণের চিঠি এসেছে সাতবেড়ে থেকে।

রেখে যাও—

খবর আছে। পড়ে দেখ তুমি।

অম্বুজাক্ষ চোখ মেললেন এবার: চিঠি যখন এসেছে, খবর তো থাকবেই।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন, সুহাসিনীর মুখের উপরে অগ্নি-কাণ্ড চলেছে যেন। বললেন, কখন এলো চিঠি? খবর খারাপ নাকি?

সুহাসিনী কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, আহ্লাদের খবর। শুভ বিবাহ। অরুণের বিয়ে তিরিশ তারিখে। তুমি বেরিয়ে যাবার পরেই চিঠি এসে পড়ল। আগে বলি নি, তোমার খাওয়া পণ্ড হয়ে যেত।

পণ্ড হবে কেন? সন্দেশ খাওয়া-খায়ি হয় বিয়ের ব্যাপারে। আরও জোর খাওয়া হত।

বিছানার উপরে অম্বুজাক্ষ খাড়া হয়ে বসলেন। বলেন, দাদামশায়ের কাছে যাচ্ছি বলে ভাঁওতা দিয়ে চলে গেল। তা সে যা-ই হোক, মা-বাপকে নেমন্তন্নের চিঠি পাঠিয়েছে ঠিক সময়ে। সেটা ভোলে নি।

সুহাসিনী বলেন, বাবারই উদ্যোগ। জোরজার করে তিনি বিয়ে দিচ্ছেন। সেই কথা লিখেছে।

অম্বুজাক্ষ একটুখানি নরম হয়ে বললেন, তাঁর নাতির বিয়ে তিনি দেবেন, অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু আমাদের বাদ দেবার মানেটা কি? আমরা কি তাঁর উপরে কথা বলতে যেতাম? কোথায় বিয়ে হচ্ছে? চিঠিখানা পড় দিকি শুনি—

সুহাসিনী ছুঁড়ে দিলেন চিঠিখানা। দু-চোখ জলে টলটল করছে। বললেন, আমি পারব না—তুমি পড়গে। পেটের ছেলের বিয়ে—পর-অপরের মতো চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। বিয়ে করছে যে সম্বন্ধটা তুমি বাতিল করে দিয়েছ। যারা তোমার শতেক অপমান করেছে, বংশ ধরে কুচ্ছো করেছে।

অম্বুজাক্ষ চশমা চোখে দিয়ে চিঠির আদ্যোপান্ত পড়লেন। তার পরে আরও একবার। খামখানা উল্টেপাল্টে দেখেন। চিঠি খামে

ভরে রেখে চশমা খুলে বললেন, শ্বশুরমশায় নিজে না লিখে অরুণকে দিয়ে কেন লেখালেন, তাই ভাবছি।

সুহাসিনী বলেন, বয়স হয়ে গেছে—লিখতে হাত কাঁপে। নিজের হাতে লেখা বাবা অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছেন।

এত বড় ব্যাপার—সইটা অন্তত নিজে করতে পারতেন।

সুহাসিনী বলেন, এখন কি করবে?

যেতেই হবে, ছেলের বিয়ে যখন।

সুহাসিনীর দিকে চেয়ে বললেন, তোমারও কিন্তু যাওয়া উচিত। শ্বশুর মশায় রয়েছেন এর মধ্যে, আমরা রাগ করে থাকলে তিনি কি মনে ভাববেন?

সুহাসিনী বলেন, যা ইচ্ছে ভাবুন গে। তাঁর নাতির বিয়ে সকলে মিলেমিশে এখান থেকে কি হতে পারত না? মণিরামপুর ছাড়া আর কোথাও কি পাত্রী মিলত না? অসুবিধা যা-ই হোক, বাবা নিজের হাতে এক ছত্র বুঝিয়েসুজিয়ে লিখতে পারতেন না আমাদের?

অম্বুজাক্ষ বললেন, হয়তো বা মিছামিছি তাঁকে দুষছি। তিনি এর মধ্যে নেই। ডাকের শিলমোহর মণিরামপুরের। তোমাদের সাতবেড়ে গাঁয়েও পোস্টঅফিস আছে, চিঠি সেখান থেকে ছাড়ে নি।

বলতে বলতে জামাটা গায়ে চাপিয়ে অম্বুজাক্ষ উঠে দাঁড়ালেন।

কোথা চললে?

ডাক্তারখানায়। কম্পাউণ্ডারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে জরুরি কেসগুলোর যা হোক কোন ব্যবস্থা করতে হবে। সময় তো নেই—মাঝে তিনটে দিন। কালই রওনা হয়ে পড়ি।

যাচ্ছই তা হলে? পাড়াগাঁ জায়গা—জানাজানি হতে কিছু বাকি নেই। তোমায় দেখে লোকে হাসাহাসি করবে।

অম্বুজাক্ষ হেসে উঠলেন : সেইজন্তে ছেলের বিয়ের বরযাত্রী যাব না ? কী যে বলো তুমি ! আমি অত ভয় করিনে !

দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন তিনি। সুহাসিনীর সর্বাঙ্গে যেন হুল ফোটাচ্ছে। বাবা কিছু জানেন না, একা অরুণাক্ষ নিজের সাহসে এত বড় কাজ করতে যাচ্ছে, এমন কথা ভাবতে পারা যায় না। উপরে নিজের ঘরে গিয়ে বাপকে কড়া করে চিঠি লিখতে বসলেন। অনেকখানি লিখলেন :—নাতির বিয়ে দিচ্ছ সেই মেয়ের সঙ্গে, যার বাপ বংশ ধরে আমাদের অপমান করলেন, লোকের কাছে মুখ দেখাবার উপায় রাখলেন না। সেই জন্মেই বোধ হয় আগেভাগে কোন খবর দাও নি। চিঠি পড়ে তোমার জামাইয়ের যা মুখের চেহারা হল, দেখলে নিশ্চয় তোমার চোখে জল আসত। ঐ মানুষ মাথা হেঁট করে ওখানে যাচ্ছেন—আমার কিন্তু অতদুর সাহস হল না। দেখো বাবা, যেন মুখের উপর কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে…

ইনিয়েবিনিয়ে পাতা তিনেক এমনি লিখে গেলেন। যা মনে আসছে লিখছেন। চিঠি ডাকে ফেলে মন কিছু ঠাণ্ডা হল।

সকালবেলা অম্বুজাক্ষ শোবার ঘরে খাটের উপর বসে দুধের বাটিতে চুমুক দিচ্ছেন। ছাত্রজীবনে পি. সি. রায়ের কাছে খুব যেতেন, তাঁরই মতানুবর্তী—চা খুব খারাপ জিনিস, দুধ-মুড়ির তুল্য খাদ্য নেই, এই সমস্ত বলে থাকেন। রোগি দেখতে বেরুবেন না আজ, কাজের তাড়া নেই, তাড়াতাড়ি দুটি ঝোল-ভাত খেয়ে স্টেশনে যাবেন। জিনিসপত্র বেশি-কিছু যাবে না, অল্পসল্প কাপড়-জামা। সুহাসিনী চুপচাপ স্যুটকেস গুছিয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ কাজ বন্ধ করে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, না গেলেই ভালো হত—

কেন ?

কাটা-কান চুল দিয়ে ঢাকতে হয়। বিয়ের কোন-কিচ্ছু জানিনে, এমনি ভাব নিয়ে থাকা উচিত। পাড়াগাঁয়ের মানুষ মজা দেখবে, নানান কথা বলবে এই নিয়ে—

অম্বুজাক্ষ বাধা দিয়ে বললেন, আমার সামনে কেউ কিছু বলতে আসবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

সুহাসিনী কাতর হয়ে বললেন, একলা ছেড়ে দিতে মন সরছে না। এত বছর দেখে আসছি তোমায়। অথচ সাতবেড়ে গিয়ে দশের মধ্যে মুখ তুলে দাঁড়াব, সে সাহসও পাচ্ছিনে কিছুতে। কি করি বল তো?

এমনি সময় হরিহর বন্দুকের বাক্স এনে রাখল। অম্বুজাক্ষ বললেন, যেমন যেমন দেখিয়ে দিলাম, তেল দেওয়া ঠিকমতো হয়ে গেছে?

হরিহর ঘাড় নাড়ে।

সুহাসিনী শিউরে উঠে বলেন, বিয়েবাড়ি বন্দুক নিয়ে যাচ্ছ কেন?

অম্বুজাক্ষ ম্লান হেসে বললেন, একলা ছেড়ে দিতে পারবে না, তুমিই তো বলছ গো! তা একলা যাচ্ছিনে আমি, এই দেখ। ইনি সঙ্গে যাচ্ছেন।

সুহাসিনী ব্যাকুল হয়ে বলেন, বন্দুক কি হবে? যা তোমার রাগ, কার বুকে গুলি বসাবে, বলো।

কোথাও সুবিধে না হয়, নিজের বুক রয়েছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক সুহাস। বাইরের অপমান সইছি বলেই ছেলের হাতের অপমান সইব, তা ভেবো না।

সুহাস নামে অনেকদিন পরে ডেকে ফেললেন, অরুণ বড় হবার পরে অম্বুজাক্ষ এ নামে আর ডাকেন না। আধ-গোছানো স্যুটকেশ ঠেলে দিয়ে সুহাসিনী তীরের মতো ছিটকে পড়লেন।

যাওয়া হবে না তোমার। কিছুতে না।

অম্বুজাক্ষ লঘুকণ্ঠে বললেন, হল কি? ছেলের বিয়ের নেমন্তন্নে দুটো ভালো জিনিস খেয়ে আসব, তাতে তুমি বাদ সাধছ কেন?

সুহাসিনী আরো ক্ষেপে গিয়ে বললেন, যেতে আমি দেব না। বন্দুকের গুলি আগে আমার বুকে বসাবে, তার পরে যেখানে খুশি যেও।

উত্তেজনা দেখে অম্বুজাক্ষ হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বলেন, সেটা পারব না, তুমি ভালোই জান। তা ছাড়া অন্য কি হতে পারে, ভেবেচিন্তে বল আমায়।

সুহাসিনী বললেন, বন্দুক যেখানে ছিল রেখে এসো হরিহর। আমি যাব ওঁর সঙ্গে।

বন্দুকের চেয়ে বেশি জোরদার হবে বটে! আমি তো গোড়াতেই বলেছিলাম। বাপের বাড়ি অনেকদিন যাও নি, শুভকর্মে গিয়ে খাটাখাটনি করবে—

সুহাসিনী হরিহরকে বললেন, এ বেলা যাওয়া হল না—বলে দাও ড্রাইভারকে। উনি রোগির বিলিব্যবস্থা করেছেন, আমারও সংসারের ব্যবস্থা করে যেতে হবে। বিকালে রওনা হবো।

অম্বুজাক্ষ বললেন, বিকালে বেরুলে পৌঁছতে কত রাত্রি হয়ে যাবে জান? ট্রেন থেকে নামিয়ে দেবে সাড়ে-সাতটায়। বাসে তারপর অতটা পথ—

এবার সুহাসিনী হেসে ফেললেন: তা হলেও তোমার নেমন্তন্ন ফসকে যাচ্ছে না গো! বর-বিদায় আজ নয়, কালকে। স্বচ্ছন্দে বরযাত্রী হতে পারবে।

অম্বুজাক্ষ এদিকে-ওদিকে ঘাড় নেড়ে বলতে লাগলেন, এতক্ষণে বোঝা গেল সুহাস, নেমন্তন্নের লোভ একলা আমার নয়। ছেলের বিয়ে দেখবার মতলব ঠিক করে বাইরে একটুকু মান দেখাচ্ছিলে।

ড্রাইভারকে তা বলোগে হরিহর—এখন নয়, ছুটোর সময় রওনা।
মেয়েছেলের বাপের বাড়ির টান—ও কিছুতে ঠেকানো যাবে না।

ট্রেন ছাড়তে না ছাড়তেই চতুর্দিক অন্ধকার। মেঘ পাকিয়ে বেড়াচ্ছে আকাশ জুড়ে। মেঘ চিরে চিরে বিদ্যুৎ ছুটছে। ঝড় এলো। কামরায় কাচের সার্শি তুলে দেওয়া। গাছপালা পাগল হয়ে মাথা কুটছে কোন অদৃশ্য দেবতার কাছে। ঝরঝর করে জল নামল—জল-ঝড় এক সঙ্গে। সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবার গতিক। ট্রেন ছুটেছে দুরন্ত বেগে—খটাখট খটমট, লোহার পাটি ভেঙেচুরে দিয়ে ছুটে পালাবে বুঝি দুর্যোগের পৃথিবী ছেড়ে। গ্রামের এক ছোট স্টেশনে দাঁড়াল। প্লাটফর্মের পাশে শিরিষগাছের বিশাল ডাল ভেঙে পড়ল মড়মড় করে। ভাগ্যিস গাড়ির উপর পড়ে নি। ঢিল মারছে কোন দিক থেকে হে? টুপটাপ ঢিবঢাব অবিরত ঢিল পড়ছে ছাতের উপর। ঢিল নয়, শিলাবৃষ্টি। ফাল্গুন মাসের দিনে কী প্রলয় কাণ্ড! ঋতু উলটেপালটে যাচ্ছে, বুড়ো বিধাতা গোলমাল করে ফেলছেন। হুইশিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল তো তারপরেও এক কাণ্ড। প্ল্যাটফরমটুকু ছাড়িয়েই ঘড়াং করে থেমে গেল গাড়ি। হুইশিল—ভয়ার্ত চিৎকার যেন ইঞ্জিনের। কি ব্যাপার? কেউ সঠিক বলতে পারে না—শোনা গেল, কোন এক আয়েসি যাত্রী দেহ উষ্ণ করবার মানসে স্টেশনের চাখানায় গিয়েছিলেন—তিনি স্বস্থানে ফিরতে পারেন নি; কামরার স্বজনেরা চেন টেনে দিয়েছে।

গাড়ি বিস্তর লেট। অম্বুজাক্ষ আর সুহাসিনী নেমে দাঁড়ালেন। ঘড়িতে যাই বাজুক, চতুর্দিক থমথম করছে রাত দুপুরের মতো। বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি! আকাশের আগল খুলে দিয়েছে। জলে জলে একাকার। সৃষ্টিসংসার ডুবে গেল। কচুবনে একহাঁটু জল। একটা

ল্যাটামাছ লাফিয়ে ডাঙায় উঠে এলো—পানওয়ালা যেখানটায় বসেছে তার বাক্সের পাশে পিছলে পিছলে বেড়াচ্ছে। উলুর মতন শোনা যায় অঞ্চলটা জুড়ে—এর নাম ব্যাঙের উলু, বাদলার স্ফূর্তিতে ব্যাঙেরা উলু দেয় নাকি। জল ভেঙে এখন যতদূর যাবে, কেবলই উলু। সেই উলু ছাপিয়ে গুরুগম্ভীর পুরুষালি আওয়াজ—গ্যাঙর-গ্যাং গ্যাঙর-গ্যাং। কোলাব্যাঙ ডাকছে। শ্রান্ত হয়ে একদিকের ডাক থামল তো, অন্য দিক থেকে অমনি শুরু হয়ে গেল। রাস্তার উপরে কলকল করে স্রোত বয়ে চলেছে। মাঠ একদিকে—এদিককার লাইনে যত বাস চলে, সমস্ত সারবন্দি ঐ মাঠের উপর থাকে। আজকে মাঠ নয়, সমুদ্র। বাস নেই, মানুষজন কাউকে দেখা যায় না কোন দিকে। এ তো বড় মুশকিল—এতগুলো বাস রাখল কোথায় নিয়ে? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করা যায়?

রান্নাঘরে বাপ-মেয়ের পাশাপাশি ঠাঁই হয়েছে। খেতে বসেও ঝগড়া।

তুমি খাচ্ছ না তো বাবা। হাত কোলে করে বসে রয়েছ।

খাচ্ছিস না তুই তো! উল্টে আমার উপর দোষ চাপিয়ে কোন্দল করছিস।

কাল আর ঝগড়া-কোন্দল করব না বাবা। বজ্জাত মেয়ে চলে যাচ্ছে। কোন দিন আর-কিছু বলতে যাব না।

বলে ফেলেই ইরাবতী বুঝল, সর্বনাশ হয়েছে। আর তখন উপায় নেই! বিশ্বেশ্বর বাচ্চা ছেলের মতো হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। ভাতের থালা ছেড়ে ইরা বাপের গায়ে এসে পড়ে। আঁচল দিয়ে বাঁ-হাতে বাপের চোখ মুছায়।

আর কে ঝগড়াঝাটি করে খাওয়াবে আমায়, কে আর খবরদারি করবে? ছোট্ট বয়সে মা হারিয়েছিলাম, বুড়ো বয়সের মা'টি এবার নিজের সংসারে চলল।

ইরাবতী বলে, বাবা অমন করলে আমিও কাঁদব কিন্তু। একটা ভাতও মুখে তুলব না। এক্ষুণি গিয়ে শুয়ে পড়ব, কেউ আর আমাকে তুলতে পারবে না।

ভয় পেয়ে বিশ্বেশ্বর প্রাণপণে সামলাবার চেষ্টা করেন। দুধের বাটি নিয়ে সরমা এসে পড়লেন। ধমকে উঠলেন, কী ছেলেমানুষি করছ বল তো! আমি তো কই কাঁদছিনে, সুখের দিনে কাঁদতে কেন যাব? বাপ-মা মেয়ের জন্য এর চেয়ে ভালো কি চাইতে

পারে? চুপ করো তোমরা—ছাঁচতলায় অরুণ আঁচাচ্ছে। সে বেচারা হকচকিয়ে যাবে তোমাদের বাপ-মেয়ের কাণ্ড দেখে।

বিয়ের সোরগোল মিটে গেছে। সে এমন-কিছু নয়—গাঁয়ের পঁচিশ-ত্রিশটি মেয়ে-পুরুষ ডেকে রীত-রক্ষার ব্যাপার। বিশ্বেশ্বর সরকারের যেটুকু সঙ্গতি। বাইরের কেউ সাহায্যদানের প্রস্তাব করবে, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে? ইরাবতী তাকে খেয়ে ফেলবে না? তবে গোবিন্দভূষণ দত্ত সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন—তাঁর সঙ্গে পারা যায় নি। গয়না ও কাপড়চোপড়ে প্রায় এক গন্ধমাদন সাজিয়ে দিলেন বাসিবিয়ের সময়। বুড়ো সাংঘাতিক পাত্র—তাঁর উপহার নিয়ে কথা বলতে যাওয়া, অমন রায়বাঘিনী ইরারও সাহসে কুলোয় নি।

কাল বাসিবিয়ের পর গোবিন্দ চলে গেছেন, সহদেব তাঁর সঙ্গে গেছে। ফুলশয্যা-বউভাত সাতবেড়েয়—তাঁর বাড়িতে। গোবিন্দ তারপর নিজে সঙ্গে করে কলকাতা পৌঁছে দিয়ে আসবেন। ঝড়বৃষ্টি এদিকেও খুব, তার জন্য বর-কনের রওনা হতে দেরি পড়ে গেল। দু-খানা পালকি তেঁতুলতলায় এনে রেখেছে। ইরা-অরুণ জোড়ে প্রণাম করল বাপ-মাকে। মায়ের দিকে চেয়ে ইরা বলে, আমোদের দিনে কাঁদতে নেই—তুমি যে বড় বোঝাচ্ছিলে বাবাকে। এবার?

বাচ্চা ছেলেমেয়ে যে ক'টিকে নিয়ে ইস্কুল অথবা আড্ডা জমাত, তারাও চোখ মুছছে এক পাশে দাঁড়িয়ে। পালকিতে উঠতে গিয়ে ইরাবতী ভেঙে পড়ল: চলে যাচ্ছি বাবা তোমাদের বনবাসে ফেলে রেখে।

সতীশও এসেছে। সে বলে ওঠে, ও কেমন কথা গো! আমরা বুঝি বনে থাকি, জন্তুজানোয়ার আমরা? কর্তামশায় নিজের জোরের জায়গায় এসে আছেন—সাতপুরুষের ভিটেমাটি। ভেবেছ কি দিদিমণি, তোমাকেও নিয়ে আসব না? বছরে একবার-দুবার আসবে আমাদের

সকলকে দেখতে। জামাইকেও আসতে হবে, তাঁরও দেশ এটা। কলকাতায় গিয়ে টেনেটুনে সব নিয়ে আসব।

বাস নয়, আলাদা ট্যাক্সির ব্যবস্থা। হাটখোলায় বড়-রাস্তার উপর ট্যাক্সি এসে থাকবে। মফস্বলের ট্যাক্সি, কোন এক বাঁধা লাইন ধরে চলাচল নয়—গরজ পড়লে লোকে ভাড়া করে আনে। আটজন দশজন অবধি বোঝাই দেওয়া চলে—মাডগার্ডে বসে, বনেটের উপরেও। এরা মাত্র দু-জন। দুটি প্রাণী ট্যাক্সি হাঁকিয়ে যাবে, এ তল্লাটে এই বোধ হয় প্রথম ঘটল।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ গড়িয়ে গেছে। জোর বৃষ্টিটা বন্ধ হয়েছে, আকাশ মুখ কালো করে আছে। টিপটাপ দু-চার ফোঁটা পড়ছে মাঝে মাঝে। ছাতা নিয়ে সতীশ জোর পায়ে পালকির আগে আগে চলল। হাটখোলা অবধি গিয়ে ওদের ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে ফিরে আসবে।

হাটখোলায় পালকি নামিয়ে চারিদিক তাকায়। কোথায় ট্যাক্সি? নয়ানজুলির কানায় কানায় জল। পাকারাস্তার উপরেও কোথাও কোথাও জল উঠেছে। কালভার্টের নিচে তীব্র স্রোতে জল পাক দিয়ে ছুটেছে। হাত পেতে বায়নার টাকা নিয়ে নিয়েছে, ট্যাক্সি না আসার হেতু কি? পৌঁছবার দেরি দেখে হয়তো বা ফিরে চলে গেছে, আজকে যাওয়া হল না এই বিবেচনায়। কিন্তু সে রকম তো কথা নয়! দোকানদারের জিজ্ঞাসা করা হল। না, আসে নি কোন ট্যাক্সি।

অরুণাক্ষ বলে, এমন হতে পারে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এসেছিল। ঘরের ভিতর থেকে আপনারা টের পান নি।

এক দোকানি হেসে বলে, ঝড়বৃষ্টির আর কতটুকু আওয়াজ! ট্যাক্সি যখন চলে, আধক্রোশ দূর থেকে মানুষে টের পেয়ে যায়—হাঁ, ট্যাক্সি হাঁকিয়ে চললেন কোন বাবুভেয়েরা!

সতীশ চিন্তিত হয়ে বলে, যত রাতই হোক ট্যাক্সি হাজির থাকবে। ফিরে যাবার কথা নয়। কি গোলমাল হল কে জানে? বৃষ্টি সব মাটি করে দিল।

এই মুখে পাকারাস্তার শেষ—পাঁচপোতার গঞ্জ। ট্যাক্সি সেখান থেকে আসবে। অরুণাক্ষ বলে, পালকি যখন আছে, পাঁচপোতা গিয়েই দেখা যাক। সে ট্যাক্সি না পাই, নতুন একটা করা যাবে। নয় তো পালকিতেই ফিরে চলে আসব।

প্রস্তাব ভালোই। পথ বেশি নয়, সতীশও তবে সেই অবধি সঙ্গে যাবে। অরুণ বলে, কোন দরকার নেই, কেন মিছে কষ্ট করতে যাবেন? হেঁটে যেতে হবে আপনাকে, পালকি তার অনেক আগে চলে যাবে। আপনি সেই অবধি পৌঁছবার আগেই দেখবেন, ট্যাক্সি চেপে আমরা ফিরে আসছি।

সতীশ হাটখোলার এক দোকানে বসে রইল, দুই পালকি চলল পাঁচপোতার গঞ্জে। বৃষ্টিবাদলার জন্যে, অতবড় গঞ্জ, এরই মধ্যে একেবারে নিশুতি। কালীবাড়ির সামনে পালকি রাখল। অরুণাক্ষ বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক দেখছে। বেশিদূর যাবার উপায় নেই ইরাকে একা ফেলে। একটা মানুষ পায় না, যার কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবে ট্যাক্সি কোনদিকটায় থাকে। বেহারাদের বলে, এগিয়ে দেখ না বাপু খোঁজখবর করে।

বেহারারা গেছে তো গেছে। এইটুকু জায়গা সাতবারচক্কোর মেরে আসা যায়—কোন আড্ডায় গিয়ে জমেছে হয়তো, ঠাণ্ডার মধ্যে গাঁজা-টাজা টানছে। ইরাবতীও শেষে বেরিয়ে এলো পালকির ভিতর থেকে। বেরিয়ে উঁকিঝুঁকি দেয়। দু-এক পা এগুচ্ছেও। অরুণের বিরক্তির অবধি নেই। শঙ্কাও হচ্ছে। বলে, চললে কোথা? কোনদিকে

মানুষ দেখিনে, বড্ড খারাপ লাগছে আমার। পালকির খোপে যেমন ছিলে বসে থাকগে। ওরা ফিরে আসুক, তখন বেরিও।

ইরা আবদারের সুরে বলে, এতক্ষণ তো বসে বসে এলাম—আর পারছিনে। আমি কি কাপড়ের বাণ্ডিল যে একটা জায়গায় ফেলে রাখবে, আর সারাক্ষণ চুপচাপ বসে থাকব ?

অরুণ বলে, বাণ্ডিলের একটা গুণ, ফেলে রাখলে ঠিক থাকে। মেয়েরা নিজের বুদ্ধিতে নড়তেচড়তে গিয়ে মুশকিল বাধিয়ে বোসো।

ইরাবতী কলকণ্ঠে বলে ওঠে, মুশকিল বাধাই না গো, মুশকিলের আসান করি। ঐ দেখ ট্যাক্সি—ঐ যে গাছতলায়। কাছেই রয়েছে, এত লোকে তোমরা হার মেনে গেলে। আমি বের করলাম।

ট্যাক্সি না খড়ের গাদা ?

অরুণের তখন অবধি সন্দেহ। দু-জনে চলল সেদিকে। ইরা আগে আগে—ইরার হাতে টর্চ। ডালে পাতায় অন্ধকার বিশাল এক বাদামগাছ। তার নিচে ত্রিপলে ঢাকা এক বস্তু—আবছা আঁধারে দূর থেকে খড় বলেই মনে হয়। ট্যাক্সি ত্রিপলে মুড়ে দিয়েছে—ইরাবতী কেমন করে বুঝে ফেলল, সেইটে আশ্চর্য।

আলো ফেলে ইরা ঠাহর করে দেখে বলে, ড্রাইভার আছে গাড়িতে। ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমোবার জন্যই এত সমস্ত আয়োজন। ক্যানভাসের হুড-দেওয়া সেকেলে গাড়ি—ক্যানভাসে শতছিদ্র। ত্রিপলটা সংগ্রহ করে গাড়ির আগাপাস্তলা চাপা দিয়েছে, যাতে একটি ফোঁটা জল ভিতরে না পড়ে। সামনের সিটের উপর কুণ্ডলী হয়ে পড়ে ড্রাইভার পরম আরামে নিদ্রা দিচ্ছে।

ব্যাপার কি তোমার ? বায়নার টাকা তুমিই তো হাত পেতে নিলে হে! জাগো, উঠে পড়ো—

কিন্তু জাগবার জন্তে সে ঘুমোয় নি—এত ডাকাডাকি, কিছুতে তবু সাড়া নেই।

অরুণ বলে, ঘুম নয় বোধ হয়, লোকটা মরে গেছে।

ইরা হেসে উঠে বলে, তা যদি বলো এমন চেঁচামেচিতে মরা-মানুষেরও নড়ে বসবার কথা।

তারপরে হর্ন বাজানো—হাত ধরে টানাহেঁচড়া ইত্যাদি প্রক্রিয়ার পর ড্রাইভার উঠে পড়ল: আরে, এইখানে এসে পড়েছেন যে বাবু!

এসেছি তাই। না এলে রাতের মধ্যে তোমার ঘুম ভাঙত বলে তো মনে হয় না।

ড্রাইভার অপ্রতিভ হয়ে বলে, কী যে বলেন! কত বড় দায়িত্ব রয়েছে। উঠব-উঠব ভাবছিলাম এইবারে। তা ভালো হয়েছে—এসে গেছেন তো গাড়িতে উঠুন। ভাবনা করবেন না—স্টিয়ারিঙে হাত ছোঁয়ালেই গাড়ি আর দাঁড়াবে না, একছুটে নিয়ে পৌঁছবে। উঠুন।

হাটখোলায় সতীশ বসে আছে—ট্যাক্সির কি গতিক দাঁড়াল, শেষ অবধি না জেনে ফিরবে না। আওয়াজ পেয়ে দোকানের একটা লণ্ঠন নিয়ে সে রাস্তায় এলো। গাড়ি থামিয়ে ইরাবতীকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। এই ক'মাসের মধ্যেই বুঝে ফেলেছে মেয়ের কতখানি উদ্বেগ বাপের জন্য। বলে, কর্তামশায়ের জন্য ভেবো না দিদি। আমরা রইলাম, তা ছাড়া সহদেবও এখন তোমার মাইনে-খাওয়া লোক হয়ে গেল।

ইরা আর্দ্রকণ্ঠে বলে, না সতীশদা, তোমরা সব আছ—ভাবনা করতে যাব কেন? কিন্তু যে কথা বলেছ মনে থাকে যেন। কলকাতায় যাবে। কবে যাবে বলে দাও। গিয়ে আমায় সঙ্গে করে

নিয়ে আসবে। আছেন আমার ওই বুড়ো বাবা—ভাই-টাই কেউ নেই তুমি ছাড়া। তুমি গিয়ে আমায় নিয়ে আসবে।

এমন যে গোঁয়ারগোবিন্দ সতীশ, তারও চোখে জল আসবার মতো। বলে, যাব বই কি! সংসারধর্ম গুছিয়ে নাওগে, হঠাৎ একদিন গিয়ে পড়ব। দেউড়ির দরোয়ানদের বলে রেখো, পাড়াগাঁয়ের জংলি মানুষ দেখে দূর-দূর করে তাড়িয়ে না দেয়।

ড্রাইভার তাড়া দেয়: তেল পুড়ে ছয়লাপ হচ্ছে—কতক্ষণ আর দাঁড়াব? স্টিয়ারিঙে হাত ছোঁয়ালেই গাড়ি নাকি আর থামে না। তা জোরজার করে থামিয়েছে বটে—কিন্তু এমনধারা কাঁপুনি, যাবতীয় লোহালক্কড় খুলে খুলে রাস্তার উপরে পড়ে না যায়!

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। অরুণাক্ষ বলে, নেমন্তন্ন করে এলে কলকাতায় যাবার জন্য। কিন্তু আমাদেরই বাড়ি ঢুকতে দেয় কিনা দেখ।

নিরুদ্বেগ কণ্ঠে ইরা বলে, কে দেবে না শুনি?

বাবা মা—যাঁরা হলেন মালিক। দরোয়ান দিয়ে ফটক বন্ধ করে দেবেন। যাঁদের অগ্রাহ্য করে দাদুর কাছে ধর্না দিয়ে পড়লাম।

ইরা বলল, ঢুকতে তোমায় না দিতে পারেন। আমার শ্বশুর-বংশের এমন কুচ্ছো করেছ, আমি হলে কক্ষণো দিতাম না। কিন্তু আমায় কি জন্য দেবেন না, আমি তো দোষ করি নি।

হেসে উড়িয়ে দিচ্ছ—ব্যাপার অত সোজা নয়। আমায় দেখে ভেবো না, বাবা-ও আমার মতন।

ইরা কৌতুক-চোখে তাকিয়ে বলে, নয়ই তো। এদ্দিন ধরে শুনেছি বাবার গল্প—ডাকাবুকো সরল মানুষ, নাম ভাঁড়িয়ে আঁধারে আবডালে কোন-কিছু করেন না। দেখ, তোমায় জানতে বুঝতে যদি

দু-বছর লেগে থাকে, বাবাকে জানতে দুটো দিনও লাগবে না—এই বলে দিলাম।

সহসা সে গম্ভীর হয়ে বলে, কৈফিয়ৎ দাও। মানুষজনের মধ্যে জিজ্ঞাসা করতে পারিনে। একা পেয়েছি, এবার স্পষ্ট জবাব দাও—কেন অমন কাজ করলে? তোমাদের নিন্দেয় আমি খুশি হব, সত্যি সত্যি এই ভেবেছ আমার সম্বন্ধে?

অরুণ বলে, বাঁকা মন তোমার—বারবার নিজের কথা টেনে আনো। প্রতুল দত্তর মেয়ে তখন ঘাড়ের উপর খাঁড়ার মতন ঝুলছে। এই করে সে ফাঁড়া কাটানো গেল। কাশীশ্বরের বংশে প্রতুল দত্ত মেয়ে দিতে পারে না। আর মেয়ে যখন দিচ্ছে না, কিসের দায়ে বাবার নমিনেশন যোগাড় করতে যাবে? হলও তাই—নমিনেশন শেষ পর্যন্ত সাধন মিত্তির পেয়ে গেল। বাবারও আর ঝোঁক থাকল না প্রতুল দত্তর সম্বন্ধে। তারপরে সহদেবের চিঠিতে পেলাম, সেই সাধন মিত্তির তোমাদের গাঙ-পারে নিয়ে তুলছে। সকল দিক মাটি হয়ে যায়, তখন আর মাথার ঠিক রইল না। সে সব বিপদ কেটে গেছে, এবারে ঘরের ভাবনা। ভেবে ভেবে থই পাচ্ছিনে ইরা।

ইরা চটে উঠল: চুপ করো বলছি। ভাবছি, কতক্ষণে দাদুর কাছে গিয়ে হাত-পা মেলে জিরোব—চারদিকে এই ঝোপজঙ্গল, আর উনি ভয় দেখাতে শুরু করলেন।

তবু অরুণ কি বলতে যাচ্ছিল, ইরাবতী তর্জনী তুলে বলে, চুপ। তোমার হল কি বল তো, সারারাত এমনি বকবক করবে? আমার ঘুম পেয়ে গেছে।

অরুণ বলল, একটা-দুটো চুরুট খাই, তা-ও তুমি কৌটোসুদ্ধ কেড়ে নিয়ে নিলে। চুরুটে মুখ আটকা থাকলে কথা বেরুত না, একা একা মসগুল হয়ে ভাবতাম।

কান্তর অনুনয় করে, দাও না গো একটা—

বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। চুরুট পাবে না—ইরা দেবী খুমুবেন, দুষ্টু মানুষের মুখে চাবি পড়ে গেল এই দেখ।

আবছা অন্ধকারে নিটোল হাতখানা অরুণাক্ষের মুখে চাপা দিয়ে ইরাবতী তার কোলের উপর গড়িয়ে পড়ল।

ট্যাক্সি ছুটেছে। মেঘ কেটে গেছে, চাঁদ দেখা দিয়েছে মাথার উপর। বৃষ্টি-ভেজা গাছপালা জ্যোৎস্নার আলোয় ঝিকমিক করছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। এক সময় অরুণ ড্রাইভারকে বলে উঠল, শুনছ ? অত জোরে চালিও না।

আজ্ঞে ? ড্রাইভার চোখ রগড়াতে রগড়াতে পিছন দিকে তাকায়।

তোমারও ঘুম ধরেছে দেখছি। এই যাচ্ছে-তাই রাস্তার ফুল-স্পীডে চালিয়ে দিয়েছ। নির্ঘাৎ এক কাণ্ড ঘটাবে।

ড্রাইভার একমুখ হেসে বলে, কিচ্ছু হবে না। ঠিক পৌঁছে দেব।

অরুণ বলে, পৌঁছে তো দেবেই। কিন্তু দাদুর বাড়ি কি যমের বাড়ি, সেইটে ভাবছি। তুমি বাপু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গাড়ি চালাও—বছরে কতগুলো ঘায়েল হয়, ঠিক করে বলো দিকি।

ঘাড় নেড়ে লোকটা বলে, ঐ কথাটি বলতে হবে না। বোশেখ মাসে একদিন খেজুরগাছে লেগে গাড়ি চিৎ হয়ে উলটে গেল, যত প্যাসেঞ্জার তক্ষুণি অমনি ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। আর একবার হল কি, আষ্টেপিষ্টে মেলার মানুষ বোঝাই দিইছি—

রক্ষে করো, আর একবারের কাজ নেই, তুমি এদিকে ফিরে গল্প কোরো না। ভালো বিপদ দেখছি, যতক্ষণ জেগে থাকবে পিছন ফিরে গল্প করবে। সামনে ফিরলে তো চোখ বুঁজবে অমনি।

ড্রাইভার সগর্বে বলে, চোখ বুঁজলে কি হয়, রাস্তাঘাট মুখস্থ? চোখ না মেলেই বলে দেব, কোনখান দিয়ে যাচ্ছি।

জোরে ব্রেক কষে সহসা সে গাড়ি থামিয়ে দিল। বলে, নেমে পড়ুন দিকি।

কি হল?

ঝাড়ের বাঁশ রাস্তার উপর নিচু হয়ে পড়েছে। নেমে গিয়ে বাঁশের মাথা একপাশে টেনে ধরুন, গাড়ি বেরিয়ে গেলে ছাড়বেন।

ইরার মাথা কোলের উপর থেকে নামিয়ে অরুণাক্ষ দরজা খুলছে, সেই সময়টা সাড় হল। চোখ বুঁজে বুঁজেই ইরা জিজ্ঞাসা করে, বাড়ি এসে গেল?

আর বাড়ি! গজর-গজর করতে করতে অরুণ নেমে পড়ল।

রাস্তার পাশে পগার ও ঝুপসি জঙ্গল। সেইখানে দাঁড়িয়ে বাঁশের আগা টেনে ধরতে হবে। কপাল গুণে না-ই যদি সাপে ঠুকে দেয়, দু-চার গণ্ডা জোঁক লাগবে নিশ্চয়। ট্যাক্সি খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অরুণাক্ষ আবার গিয়ে উঠল।

ইরার ঘুম পুরোপুরি ভেঙেছে। উঠে বসেছে সে। বলল, আর কতদূর সাতবেড়ে?

অনেক। সিকি পথ হয়তো এসেছি।

ওরে বাবা!

অরুণ একটু চুপ করে থেকে বলে, যত দেরি হয় ততই ভালো। গিয়েই বোধহয় বাবার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

ইরা অবাক হয়ে বলে, ওখান থেকে কলকাতা গিয়ে তবে তো দেখাসাক্ষাৎ। বাবা ওখানে আসবেন, কে তোমায় বলল?

অরুণ বলে, আমি এক কাণ্ড করে বসেছি ইরা। ভালো কি মন্দ করেছি, বুঝতে পারছি না। মাকে চিঠি দিয়েছি—বিয়ের তারিখ চার দিন পিছিয়ে লিখেছি।

ইরা বলে, বাবাকে বাদ দিয়ে মাকে লিখলে কি জন্য ?

মাকে লেখা মানেই বাবাকে জানানো। বাবার কাছে সোজাসুজি মিথ্যে লিখতে সাহস হয় না।

তারিখ মিথ্যে করেই বা লিখলে কেন ?

বাবাকে জানি—বিষম জেদি, বিয়ে বন্ধ করতে তিনি সাতবেড়ে ছুটে যাবেন। গিয়ে পড়েছেন বোধহয় এর মধ্যে, সমস্ত শুনেছেন। আমরাও যচ্ছি। দাদামশায় দিদিমা রয়েছেন, বিশেষ করে আমার দিদিমা—দিদিমা বড্ড রাশভারি মানুষ। তাঁরা ধরে পড়ে মিটিয়ে দেবেন। এত সমস্ত ভেবে ঐ রকম চিঠি ছেড়েছি।

ইরাবতী গম্ভীর হয়ে বলে, অন্যায় কাজ করেছ। আমি জানলে মানা করতাম। কলকাতায় গেলে তারপরে মারুন কাটুন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বের করে দিন, তবু সে হল নিজের জায়গা। এখানে যা-ই কিছু হোক—শুধুমাত্র দাদু-দিদিমার সামনে হলেও বড় লজ্জা, বড্ড অপমান।

অরুণ সায় দিয়ে বলে, তাই মনে হচ্ছে এখন। যত কাছাকাছি হচ্ছি, ভাবনায় বুক শুকিয়ে উঠছে। কী যে হবে ইরা।

তার কণ্ঠস্বর ও বলার ভঙ্গিতে ইরা হেসে ওঠে। এত গম্ভীর ছিল, লহমার মধ্যে আর এক মানুষ। বলে, অত ভাবতে হবে না বীরপুরুষ মশায়। আমি না হয় এগিয়ে দাঁড়াব, কথাবার্তা ঝগড়াঝাটি আমার সঙ্গে—চুপটি করে তুমি পিছনে থেকো।

অনেকক্ষণ কাটল, কথাবার্তা নেই। আওয়াজ করে গাড়ি চলেছে। কোন এক গ্রাম—রাস্তার পাশে সারবন্দি খোড়োঘর

ক'খানা। ছেলে কাঁদছে ঘরের মধ্যে। টেমি হাতে কে-একজন বেরিয়ে এলো। বেগুনক্ষেত, আমবাগান। গ্রাম ছাড়িয়ে গাড়ি মাঠের ভিতর এসে গেল। জোলো হাওয়া বইছে হুহু করে। মাঠের জলে ঢেউ উঠেছে, রাস্তার গায়ে ছলাৎ-ছলাৎ ঢেউ এসে লাগছে।

ইরাবতী খিলখিল করে হেসে ওঠে: তাই তো বলি, এমন ভালোমানুষ হয়ে চুপচাপ রয়েছ তুমি।

অরুণাক্ষ বলে ওঠে, উঁহু, ঘুমোই নি আমি।

তবে মাথা ঝুঁকে পড়ছে কেন? কি জন্যে শুনি? ভাবনার ভারে?

কেন ঝুঁকে পড়ে, শুনবে? শুনতে চাও? উঃ, কী হাওয়া! মুখটা আনো ইদিকে, কাছে নিয়ে এসো, তবে তো শুনবে।

ইরা বলে, ইস—মাথা তুলবার জো নেই, দুষ্টুমিটুকু আছে বেশ!

কত রাত হল কে জানে! পশ্চিমে চাঁদ নিচু হয়ে এসেছে। তারপর অনেক দূরে ঝাপসা জঙ্গলের আড়ালে চাঁদ ডুবে গেল। রহস্য-মধুর অন্ধকার।

এক সময়ে অরুণাক্ষ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। কী কাণ্ড, অ্যাঁ! জল কেন গাড়ির মধ্যে? থইথই করছে জল। ইরা, ইরাবতী!

ড্রাইভার আগেই নেমে পড়ে এক-হাঁটু জলে দাঁড়িয়েছে, টর্চ জ্বেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। তারপরে রায় দিল, গাড়ি আর চলবে না। আপনারা নেমে পড়ুন।

অরুণাক্ষ রাগ করে বলে, মাঝ-সমুদ্রে নিয়ে এসে বলে নেমে পড়ুন। গাড়ি চলবে না, বলে দিলেই হল?

ড্রাইভারও সমান তেজে জবাব দেয়, ইঞ্জিনে জল ঢুকে গেছে, চলবে কেমন করে?

পাকারাস্তা ছেড়ে বিলের ভিতর নামলে কেন?

ইচ্ছে করে নামি নি। আঁধারে দেখা যায় না, কি করব?

হেডলাইট আছে তবে কি করতে?

ড্রাইভার বিষম রাগে অরুণের হাত ধরে সামনে টেনে এনে বলল, কোথায় আছে দেখুন না। টর্চের আলো ফেলে বলে, মিছে কথা বলছি? সে ঘোড়ার ডিম জখম হয়ে আছে আজ তিন বছর।

ভিতর থেকে ইরা বলে, ঠাণ্ডায় কাঁপুনি লেগেছে। আর সওয়াল কোরো না। ডাঙায় উঠে পড়ি আগে।

অরুণ বিপন্নভাবে বলে, আমরা না হয় উঠলাম। কিন্তু জিনিসপত্রের কি হবে, জলের ভিতর ফেলে রেখে চলে যাব?

ড্রাইভার এমনি খারাপ মানুষ নয়। সে বলল, জিনিসপত্রের ভাবনা নেই। যান আপনারা। বাক্স-বিছানা আমিই বয়ে রাস্তার উপর তুলে দিচ্ছি।

আবার বলে, রাস্তাতেই বা হা-পিত্যেশ বসতে ,যাবেন কেন? ছ'কদম গিয়ে সিরাজকাটি—থানা আছে, থানার পাশে ডাকবাংলো। তোফা খাট-গদি রয়েছে, রাতটুকু আরাম করে ঘুমন গে। সকালে উঠে তিনটে টাকা ফেলে দেবেন ডাকবাংলোর চৌকিদারকে, খুশি হয়ে সে তিন বার সেলাম দেবে।

ইরা পরমোৎসাহে বলে, সেই ভাল। আমার মজা লাগছে। নেমে পড়, আর দেরি কোরো না। এই ব্যাগট্যাগগুলো আমি নিয়ে নিচ্ছি।

খুচরা দু-একটা জিনিস ছিল, তাড়াতাড়ি সে হাতে টেনে নিল।

বোঝা মাথায় নিয়ে জল ছপছপ করে ড্রাইভার আগে আগে চলেছে। অরুণাক্ষ ডাকে, কই, বসে রইলে কেন? চলে এসো—

ইরা বলে, পায়ে জুতো—যাই কি করে?

জুতো হাতে নাও। এই যেমন আমি নিয়েছি।

তবু ইরাবতী ঘাড় নাড়ে : আলতা পরিয়ে দিয়েছে আমার ইস্কুলের মেয়েরা—কত যত্ন করে পরিয়েছে, কাদা লেগে সব বিচ্ছিরি হয়ে যাবে।

হাসছে মিটিমিটি। বলে, আমি এত জিনিস নিয়েছি তুমি কিছু নিলে না। তুমি তবে নাও আমাকে।

অরুণাক্ষ বলে, এ তো বিচার ভালো! তোমার ভার, আর তোমার হাতের ঐ সব জিনিসের ভার—সমস্ত পড়বে যে আমার উপর।

অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে ইরা বলে, ও, আমি বুঝি ভারবোঝা তোমার কাছে?

অরুণ ততক্ষণে টপ করে কোলের মধ্যে তুলে নিয়েছে ইরাবতীকে। এক বিচিত্র অনুভূতি, সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ক'টা দিন আগে কত দূরে ছিল একেবারে আপন এই মেয়েটি।

ইরা ফিসফিসয়ে বলে, ধেৎ—তুমি যেন কী! ড্রাইভারটা পিছন ফিরে দেখল একবার যেন। কি ভাবছে বল দিকি! আর চলেছও তেমনি ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে—

গভীর স্নেহে অরুণ বুকের মধ্যে বেঁধে ফেলেছে। খোঁপা খুলে বিনুনি জল ছুঁয়ে যাচ্ছে। ইরা বলে, দেখ কাণ্ড! না, তোমার জ্বালায়···এ কি, সিঁদুর-টিঁদুর দিলে তো সারা কপালে লেপটে?

অরুণাক্ষ ভয় দেখায় : ঝগড়া করবে তো দিলাম ফেলে জলের মাঝখানে। দেবো? দিই?

ডাকবাংলোয় চৌকিদার আছে বটে—ড্রাইভার বলে, হাটে হাটে মনোহারীর দোকান দেয়, এখনও ফিরেছে কি না কে জানে। পুকুর-পাড়ের ঐ চালাঘরে বাসা। সকালবেলা ঠিক হাজিরা দেবে।

ইঁদুরে-কাটা পাগড়ি আছে, ভদ্রলোক দেখতে পেলে একছুটে মাথায় পরে এসে দাঁড়াবে।

কামরা একটিমাত্র, তা-ও ভিতর থেকে বন্ধ। প্রায়ই তো খালি পড়ে থাকে—আজকে দায়ে পড়ে এরা এসে উঠল তো আগেই অন্য কারা ঘর দখল করে ঘুমিয়ে আছে। ড্রাইভারের টর্চটা নিয়ে অরুণ এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখছে। পিছনে বারান্দায় খানিকটা ঘেরা মতো জায়গা। বেঞ্চি চার-পাঁচখানা ও হাতভাঙা চেয়ার—অর্থাৎ দিনমানে এখানে পাঠশালা বসে।

একটা বেঞ্চির উপর ইরাবতী ধপাস করে বসে পড়ল। অরুণকে অন্য একটা দেখিয়ে দেয়ঃ ঐটে হল তোমার। খাসা জায়গা পাওয়া গেছে। আর কি, শুয়ে পড়ো এবারে।

এবং তিলার্ধ দেরি নয়, টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

অরুণাক্ষ বলে, শুয়ে পড়লে—কাপড় ভিজে জবজবে, ও সমস্ত ছাড়তে হবে না?

ঝনাৎ করে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে ইরাবতী নিশ্চিন্ত আলস্যে চোখ বুজল।

ট্রাঙ্ক খুলে উলটেপালটে দেখে অরুণাক্ষ বলে, কি হয়েছে দেখ। ভিতর অবধি জল ঢুকে গেছে। শাড়ি একটাও শুকনো নেই, কি হবে?

ঝিকিমিকি হাসি হেসে ইরাবতী বলে, হবে আবার ছাই। শুয়ে পড়ো দিকি।

অরুণাক্ষ বিরক্ত হয়ে বলে, তুমি মানুষ নও।

নই-ই তো! ঐ যে সেকালের নবেলে লিখত প্রাণপ্রতিমা, হৃৎপিণ্ডেশ্বরী, সোনার পরী—ওগো বলো না শুনি, ঐ সমস্ত ভালো ভালো কথা—

দেখুন দিকি, অজানা জায়গায় এমন দুঃসময়ে কবিত্ব শুরু করে দিয়েছে। অরুণ রাগ করে বলে, পরী না আরো-কিছু! এক নম্বর হাঁদা-রাম—ভিজে কাপড়ে থাকলে নিউমোনিয়ায় ধরে, এই বুদ্ধিটুকু নেই।

তবু হাসছে ইরা। উচ্ছল জলতরঙ্গের হাসি—বকাবকি গালিগালাজ হাসির তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

অরুণের মাথায় এক মতলব এসেছে ইতিমধ্যে। ওদিক থেকে ঘুরে কাপড় নিয়ে এসে বলে, ওঠা হোক। ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড়টা পরে কৃতার্থ করা হোক আমাকে।

চোখ মেলে ইরাবতী বলে, এই যে বললে সমস্ত কাপড়চোপড় ভিজে গেছে। কী মিথ্যুক তুমি গো!

ওধারের বারান্দায় খানকয়েক কাপড় মেলে দেওয়া। কামরায় যাঁরা আছেন, তাঁরা শুকোতে দিয়েছেন।

ইরা বলে, তাই অমনি নিয়ে এলে? না না, ও হবে না। পরের কাপড় পরতে আমার ঘেন্না করে।

অরুণাক্ষ রাগ করে বলে, জলকাদা-মাখা নোংরা কাপড় পরে আছ—তাতে ঘেন্না নেই? এ তো দিব্যি মটকার শাড়ি। আসল কথা, উঠতেই আলসেমি। যা-ই তুমি বলো, সারারাত ভিজে কাপড়ে থেকে একখানা কাণ্ড ঘটাবে সে আমি কিছুতে হতে দেবো না।

ইরা উঠে বসে বলে, বাপরে বাপ! এত শাসন শুরু করলে যাই কোথায় আমি!

উঠে গিয়ে সে কাপড় বদলে এলো। বলে, কোন লোক কি বৃত্তান্ত কিচ্ছু জানিনে। যাঁদের কাপড়, সকালে উঠে তাঁরা কি ভাববেন বলো দিকি!

উঠবার আগেই যেমনকার কাপড় মেলে রেখে দিও। তোমার শাড়িও শুকোতে দিয়ে এলাম, শুকিয়ে যাবে ততক্ষণে।

সবে ফরসা দিয়েছে পুবে, ভাল করে ভোর হয় নি। ড্রাইভার ডাকাডাকি করছে, শুনছেন ?

অরুণাক্ষ ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে ইরাবতী মুড়িসুড়ি দিয়ে বিভোর হয়ে ঘুমোচ্ছে। দেখলে মায়া হয়। এত প্রতাপ, অথচ একেবারে ছেলেমানুষটি। ঘুমন্ত অবস্থায় অসহায় একটি শিশুর মতন মনে হচ্ছে ইরাবতীকে। অজানা জায়গা, তা বলে এতটুকু হুঁশ নেই—নিশ্চিন্ত আত্মসমর্পণের মতো ঘুমোচ্ছে কেমন দেখ। আহা, ঘুমোক।

ড্রাইভার বলছে, ভাড়ার টাকাটা মিটিয়ে দিন বাবু। সদরে রওনা হয়ে পড়ি। পায়ে হেঁটে যাব, সকাল সকাল না বেরুলে কষ্ট হবে।

তোমার গাড়ি ?

সে ঘোড়ার ডিম থাকবে পড়ে জলের মধ্যে। উঠোনে এসে রাস্তার গতিক দেখে যান না।

মাঠের জল ছাপিয়ে রাস্তার উপর দিয়ে পড়ছে, জলের তোড়ে ভেঙেও গেছে বেশ খানিকটা। বাঁয়ের ঢালু মাঠে গাড়ি ভাগ্যিস নেমে গেছে, নয় তো রাস্তার ঐ ভাঙা-জায়গায় হুমড়ি খেয়ে পড়লে সবসুদ্ধ চুরমার হয়ে যেত।

ড্রাইভার বলে, হেঁ-হেঁ, কায়দাটা দেখুন আমার। কেমন আবেশে গড়িয়ে নামলাম, আপনাদের গায়ে ঝাঁকুনিটুকুও লাগল না। আর এই নিয়ে খামোকা বকাবকি করলেন। অবিশ্যি, আমিও তখন যে

ভালো ঠাহর পেয়েছিলাম, তা নয়। ঘুমুই বলে দোষ দিচ্ছিলেন, ঘুমের মধ্যেও কি রকম হুঁশ থাকে দেখতে পেলেন তো? গোটা রাস্তা ধরে আমার মুখস্থ। ভাড়ার টাকাটা পুরোপুরি চাই কিন্তু বাবু।

বাড়ি পৌঁছলাম না, পুরো ভাড়া কি রকম?

মনিব শুনবে না, তা ছাড়া আমার কি দোষ বলুন?

বটেই তো! রাস্তা ভেঙেছে, সে দোষ আমার। এখন লোকজন ডেকে গাড়ি জল থেকে তুলে অন্য কোন পথে যাবার জোগাড় দেখ। শুনেছি, ঝাঁপার বাঁওড়ের পাশ দিয়ে ঘুরপথ আছে একটা।

ড্রাইভার বলে, গাড়িই নড়বে না তার ঘুরপথ আর সোজা পথ! পেট্রোল-ট্যাঙ্কে জল ঢুকেছে। কারবুরেটার খুলে পড়ে গেছে কোথায়। খোঁজাখুজি করলাম, জল কমে গেলে আবার দেখা যাবে। সদরে যাচ্ছি মিস্ত্রি আর মালমশলা আনতে। গাড়ি কদ্দিন অচল হয়ে থাকবে ঠিক নেই, ডাকবাংলোয় আপনারাই বা কতদিন পড়ে থাকবেন? আমার টাকাকড়ি চুকিয়ে দিয়ে পালকি-টালকি করে চলে যান।

ডাকবাংলোরই এলাকার মধ্যে পুকুরের ওধারে দোচালা ঘর, পালকি দেখা যায় সেখানে। অরুণাক্ষ বলে, ঐ তো পালকি। দুটোই রয়েছে। ঠিক করে দাও না তুমি।

ভাড়া-করা পালকি। বেহারাদের সঙ্গে তামাক খেয়ে এলাম, জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। কাল রাত্রে ভদ্রলোকেরা পালকি করে যাচ্ছিলেন, জলঝড়ের গতিক দেখে ডাকবাংলোয় উঠেছেন। এখনই আবার রওনা হয়ে পড়বেন।

ভরসা দিয়ে বলে, ঘাবড়ান কেন? গাঁয়ের ভিতর বেহারাপাড়া। টুকটুক করে চলে যান সেখানে। পালকি দু-খানা কেন, দশখানা পেয়ে যাবেন। চলুন না হয় আমার সঙ্গে। পাড়াটা দেখিয়ে দিয়ে যাব ঐ পথে।

কামরার লোকেরা জেগে উঠেছেন। ঘুম পাতলা হয়েছে ইরাবতীর —চোখ বুঁজে বুঁজেই শুনছে ভিতরে দু-তরফের কথা। পুরুষটি বিরক্ত স্বরে বলছেন, গড়গড়া সঙ্গে আনা যায় না, তা দশ-বিশটা চুরুট তো নিয়ে আসা যেত। হরিহরের কখনো এমন ভুল হয় না।

স্ত্রীকণ্ঠের জবাব : আমি কি তোমার হরিহর—যে চুরুট-গড়গড়া নিয়ে পিছু পিছু ছুটব ?

চুরুট আনলেই অমনি বুঝি হরিহর হতে হয়! আমি তোমার জন্য কী না করেছি! তুমি পানে দোক্তা খেতে, আমি পানই খেতাম না। শেষটা তোমার খাতিরে দোক্তা অবধি অভ্যাস করে ফেললাম। মনে আছে সে সমস্ত কথা ?

আমাকেও চুরুট অভ্যাস করতে বলো নাকি ?

নিরালা এই ডাকবাংলোয় আজকে এঁরা সুবিখ্যাত অম্বুজ ডাক্তার ও প্রৌঢ়া গৃহিণী সুহাসিনী নন। অনেক কালের হারানো বয়সগুলো ঐ গাছপালা আর পদ্মভরা বিলের আপপাশে বুঝি লুকিয়ে ছিল, উড়ে এসে পড়েছে এঁদের দেখতে পেয়ে। সেকালের লঘু চাপল্য কণ্ঠস্বরে ; কথাবার্তায় একটু যেন প্রলাপের ঘোর।

অম্বুজাক্ষ বলেন, তবেই হয়েছে! পথে বেরিয়েছি, নিদেনপক্ষে এক বাণ্ডিল বিড়ি সম্বল করে নিতেও যার হুঁশ থাকে না, আমার খাতিরে চুরুটের অভ্যাস করবেন তিনি! জান তো, সকালবেলা ধোঁয়া না হলে আমার মন খিঁচড়ে যায়, কোন-কিছু ভালো লাগে না।'

সুহাসিনী বলেন, পথের উপর এমনধারা পড়ে থাকবার কথা তো নয়— রাত দশটার ভিতর পৌঁছে যেতাম। আগে জানব কি করে, গাছ পড়ে গিয়ে পথ বন্ধ—গাড়ি চলবে না ?

হাসি পাচ্ছে ইরাবতর। কথাবার্তায় মনে হচ্ছে, সর্বনাশ হয়ে গেছে ধোঁয়ার বস্তু ভাণ্ডারে না থাকায়। সব পুরুষই কি একরকমের ?

ইঞ্জিন ধোঁয়া ছাড়ে, পুরুষেরাও তাই—নইলে বোধকরি নড়াচড়া ওঁদের বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্বেশ্বর ঋষিতপস্বী মানুষ—তাঁর কথা অবশ্য আলাদা। ধোঁয়া টানবার উপায়ও ছিল না তাঁর, কাপড়পত্রে পাছে আগুনের ফুলকি গিয়ে পড়ে।···আবার ঘুম একটু গাঢ় হয়েছে, ধড়মড় করে সে উঠে বসল। কথা কাটাকাটি নয় এবারে, রীতিমত সোরগোল। দু-জনে ওঁরা বাইরের বারান্দায়। গিন্নি উত্তেজিত স্বরে বলছেন, কাপড় চুরি হয়ে গেছে। বললাম, ঘরের মধ্যে যদ্দূর শুকোয় শুকোক, চোর-ছ্যাঁচোড়ের দেশ—তুমি আমল দিলে না। মটকার এমন শাড়িখানা আমার!

ইরাবতী উঠে পড়েছে। সর্বনাশ, ওঁরা এইদিকেই আসছেন যে! মটকার শাড়ি এখনো তার পরনে। এমনি রাগ হয় অরুণাক্ষর উপর! আচ্ছা মানুষ—ঘোর থাকতে উঠে নিজে কোন দিকে বেরিয়েছে, যাবার আগে তাকে ভালো করে ডেকে তুলে দিয়ে যায় না কেন?

ইরাবতীর সামনে এসে সুহাসিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

তুমি কে বাছা?

ইরাবতী হাসবার মতো ভাব করল। বলে, এক জায়গায় যাচ্ছিলাম আমরা। পথঘাট ভেসে গেছে, এইখানে আশ্রয় নিয়েছি। আপনাদেরই মতো।

সুহাসিনী বললেন, সে তো বুঝলাম। কিন্তু ঐ কাপড় পরে আমি ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করি। তোমায় চিনিনে জানিনে, কোন জাত কি বৃত্তান্ত ঠিক-ঠিকানা নেই—মটকা পরে দুর্গাঠাকরুন হয়ে বসেছ কোন বিবেচনায় শুনি?

কথার ধরনে এমন অবস্থার মধ্যেও হাসি পেয়ে যায়। প্রগল্ভ কণ্ঠে ইরা বলে, জাতে আমরা মুচি। চেহারায় ঠিক ধরে ফেলেছেন। কিন্তু মটকা-গরদ ছোঁয়াছুঁয়িতে মরে না বলেই তো শুনেছি—

কাপড় পেয়ে গেছ? কার সঙ্গে কথা হচ্ছে?

বলতে বলতে অম্বুজাক্ষও চলে এলেন এদিকে। বলছেন, তাই তো বলি, পুরানো কাপড় কে আবার চুরি করতে আসবে? মিথ্যে খানিক চেঁচামেচি—বয়স হয়ে চেঁচানো তোমার স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সুহাসিনী বললেন, ও কাপড় ছুঁতে আমার বয়ে গেছে, উঠোনের কাদায় ছুঁড়ে ফেলে দেব না? চুরি আর কাকে বলে?

এইবার, বোধকরি পুরুষের সামনে হচ্ছে বলেই, ইরাবতীর চোখে-মুখে যেন আগুন ধরে গেল। পুরানো-দিনের অভিমানী ইরা। বলে, কাপড় আপনার ফেলতে হবে না, আমিই ফেলে দিচ্ছি।

ছুটে আড়ালে গিয়ে তাড়াতাড়ি সে আগের দিনের কাপড়টা পরল, বাক্স খুলে এক মুঠো টাকা নিয়ে ঝনঝন করে ফেলে দিল ওঁদের সামনে। বলে, ক'টাকা দাম, নিয়ে নিন। আর লাগবে? কত লাগবে বলুন—

গতিক দেখে ওঁরা হতভম্ব। শেষে অম্বুজাক্ষ বিরক্ত স্বরে বললেন, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি। অন্যায় করবে আবার চোখ রাঙাবে, দুটো কখনো এক সঙ্গে চলে না।

অধীর কণ্ঠে ইরাবতী বলে, অন্যায় করিনি আমি। কক্ষণো না।

না বলে পরের জিনিস নিয়েছ, এটা খুব ন্যায়সঙ্গত কাজ বুঝি?

ইরা বলে, দরজায় খিল এঁটে আপনারা অঘোর ঘুম ঘুমোচ্ছেন, বলি কেমন করে? রাত দুপুরে জলে ভিজে এদিকে হি-হি করে মরছি।

বলতে বলতে দু-চোখ জলে ভরে গেল। বলে, ঐ রকম ভিজে কাপড়ে থাকলে নিউমোনিয়া ধরত, তাই থাকা আমার উচিত ছিল। বুঝতে পারি নি।

চোখের জল এবং এই রকম রোগের কথাবার্তায় ডাক্তার অম্বুজাক্ষ মনে মনে বিচলিত হলেন। সুহাসিনীকে বললেন, যা-ই বলো, না জেনে-শুনে তোমার কিন্তু অমন করা ঠিক হয় নি।

সুহাসিনী ভয়ে ভয়ে তাকালেন একবার ইরার দিকে। বললেন, তুমি তো আমারই দোষ দেখবে। জিজ্ঞাসা করো দিকি, আমায় কিছু খুলে বলেছে ও-মেয়ে? আমি বেকুব হব, গালি খাব—এই সকলে চায়।

এদিকেও আবার কণ্ঠ ভিজে আসে। অম্বুজাক্ষ বিব্রত হয়ে বলেন, এই দেখ, গালি আবার কে দিল তোমায়? ঐ যে বললাম, সকালবেলাতেই মন খিঁচড়ে আছে—কোন দিকে আজ সুবিধা হবে না। যে জায়গায় চলেছি, সেখানেও খণ্ডপ্রলয় বেধে না যায়!

ইরাবতী গটগট করে গিয়ে ট্রাঙ্ক খুলল। চুরুটের কৌটা নিয়ে এসে বলে, এই নিন। প্রলয়ে কাজ নেই, মন ঠাণ্ডা করুন গে বসে বসে।

চুরুট দেখে অম্বুজাক্ষের মুখ হাসিতে ভরে গেল।

বাঃ বাঃ, বাঁচালে মা। এই এক বেয়াড়া অভ্যাস, গড়গড়া-হুঁকো, নিদেনপক্ষে চুরুট-সিগারেট—একটা কিছু চাই-ই সর্বক্ষণ। যারা সর্বদা কাছেপিঠে থাকে, তারা ভুলে মেরে দেয়। কিন্তু তুমি এ খবর জানলে কেমন করে? এমন খাঁটি জিনিস পেলেই বা কোথায় হঠাৎ?

মহানন্দে চুরুট ধরিয়ে হাতল-ভাঙা এক চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে সুহাসিনীকে উদ্দেশ করে বললেন, তিরিশ বছর ঘরবসত করেও তোমার হুঁশ থাকে না, আর এক ফোঁটা মেয়ের বিবেচনাটা দেখ। দেখে শিখে নাও।

ইরাবতী খর কণ্ঠে বলে, ঝগড়ায় দরকার নেই। তার চেয়ে ঠাণ্ডা মনে ভেবে বলুন, মটকার শাড়ি পরার জন্যে কি খেসারত আমায় দিতে হবে।

বলে সে উঠানে নেমে গেল। ডাকবাংলোর চৌকিদার অদূরে দাঁড়িয়েছিল, হাত-মুখ নেড়ে কি বলছে তাকে। চেয়ারে বসে অম্বুজাক্ষ চুপচাপ ধোঁয়া ছাড়লেন খানিকক্ষণ। তারপরে একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার প্রান্তে এসে বেহারাদের উদ্দেশে হাঁকডাক শুরু করেন: ওহে সর্দার, কী ব্যাপার তোমাদের? পালকি নিয়ে এসো এদিকে, রওনা হওয়া যাক। দেরি করছ কেন তোমরা?

সর্দার-বেহারা এসে বলল, চার জন মাত্তোর আছি হুজুর। গাঁয়ে আমাদের স্বজাতি রয়েছে—সবাই বলল, সেখানে গিয়ে আরাম করে শুই গে। চার জনে আমরা পালকি পাহারায় এখানে থেকে গেলাম। রাত পোহালেই এসে পড়বার কথা, এখনো কারো দেখা নেই। ব্যোম-ভোলানাথ হয়ে পড়ে রইল কিনা সন্দ হচ্ছে। আমি না হয় ছুটে ওদের তাড়িয়েতুড়িয়ে নিয়ে আসি।

দলে পড়ে তুমি আবার ব্যোম-ভোলানাথ হবে না তো? বুঝে দেখ সর্দার।

ঘাড় নেড়ে সর্দার-বেহারা ছুটে বেরুল। একটা চুরুট শেষ করে অম্বুজাক্ষ দু-নম্বর ধরালেন। প্রসন্ন কণ্ঠে ডাক দিলেন, এদিকে, আসবে একটু মা-লক্ষ্মী?

ইরাবতী এসে দাঁড়াল।

তোমার সঙ্গে কে যাচ্ছেন? মানে, আর কাউকে দেখছি না কিনা?

তিনি পালকির জন্যে বেরিয়েছেন। আমি ঘুমুচ্ছিলাম, এখানকার চৌকিদারকে বলেকয়ে গেছেন। ঐ যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল,

আমি কথা বলছিলাম—সে হল চৌকিদার। আমাদের ট্যাক্সি, ঐ যে দেখুন মা, ঐ মাঠের ধারে জল খাচ্ছে।

খিলখিল করে ছেলেমানুষের মতো সে উচ্ছল হাসি হেসে উঠল।

অম্বুজাক্ষ মুগ্ধ চোখে চেয়ে বললেন, এমনি তো খাসা মানুষ। বুদ্ধি-বিবেচনাও খাসা। কেবল ঐ পলকে পলকে মেজাজ বিগড়ায়। রাগটা কম কোরো মা, সুখে থাকবে।

দরজার ওধারে সুহাসিনী ফোঁস করে ওঠেন: তুমি আর উপদেশ দিও না। যত হেনস্তা তোমারই জন্যে। নিজের পেটের মেয়ের মতো—সে কি না মুখের উপর টাকা ছড়িয়ে দেয়, শাড়ি টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে।

অম্বুজাক্ষ বলেন, কিন্তু আমার দোষটা কি হল?

দোষ তোমার নয়? ছেলের বিয়ে—তা বন্দুক নিয়ে কোন লজ্জায় বিয়ে-বাড়ি ছুটলে শুনি? মেয়েওয়ালার জাতকুল মজাবে? আমি তখন আর কি করব—

ইরার দিকে এক ঝলক অগ্নিদৃষ্টি হেনে কথা শেষ করলেন: নইলে বয়ে গেছে পথে বেরিয়ে এমনি শতেক অপমান সইতে!

ইরাবতী চমকে যায়। একবার অম্বুজাক্ষের দিকে একবার সুহাসিনীর দিকে তাকিয়ে ভালোমানুষের ভাবে প্রশ্ন করে, ছেলের বিয়েয় অমত বুঝি আপনাদের? মেয়ে খুব খারাপ?

সুহাসিনী বলেন সত্যিকার ভালো মেয়ে ক'টা আর পাওয়া যায়—তোমার মতন মেয়ে ক'জন? খারাপ মেয়ে তা বলে পড়ে থাকে না তো। খারাপ কি ভালো, কোন কথাই ওঠে নি—মেয়ে আমরা চোখে দেখি নি আজও।

অম্বুজাক্ষ তাড়াতাড়ি কৈফিয়তের ভাবে বলে ওঠেন, টাকা-কড়ির খাঁইও নেই আমার। কিন্তু যারা আমায় বংশ ধরে গালি-

গালাজ করে—তা-ও দু-দশজনের কাছে নয়, কাগজে ছাপিয়ে দেশের দশের মাঝে ঢাক পিটিয়ে—

সুহাসিনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, তার জন্য তুমি বন্দুক নিয়ে ছুটবে?

অম্বুজাক্ষের দিকে চেয়ে লঘুকণ্ঠে ইরা প্রশ্ন করে, গুলি করতে যাচ্ছিলেন? কাকে করতেন—মেয়েটাকে বোধ হয়। পরের মেয়ে, সেইটেই সুবিধা—নিজেদের কেউ নয়।

সুহাসিনী বলেন, রাগ হলে উনি সব পারেন মা। সে চেহারা তো দেখ নি! আমিই কেবল সারাজন্ম ভয়ে ভয়ে কাটিয়ে গেলাম। তোমার মতো একটি রণরঙ্গিণী ঘরে আনতে পারতাম, সে-ই ওঁকে জব্দ রাখতে পারত। দেখলে না, চুরুট নিয়ে কী রকম সুড়সুড় করে গিয়ে বসলেন!

সর্দার-বেহারা দলবল নিয়ে এতক্ষণে ফিরে এলো। পালকি দুটো বারান্দার সামনে এনে রেখেছে। এইবারে রওনা হবেন এঁরা। ইরাবতী কোন দিকে গিয়েছিল, চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। এক হাতে দুটো বাটি, আর হাতে কেটলি। কেটলির নল দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। চৌকিদার ঝাড়ন দিয়ে বারাণ্ডার টেবিলটা ঝেড়ে পুঁছে দিচ্ছে।

অম্বুজাক্ষ বললেন, আমি চা খাইনে। তুমি হয়তো ভাববে, হাতে খেতে চাচ্ছিনে। ওসব বায়নাক্কা ওদিকের, আমি কিছু মানিনে। সত্যি বলছি, চা খাওয়া আমি ভালো বলে মনে করিনে। বিশেষ এই আমাদের গরম দেশে।

ইরা বলে, চা নয়, দুধ। পাশে গোয়ালাবাড়ি—চৌকিদারের কাছে শুনে তাকে দিয়ে দুধ আনিয়ে নিয়েছি। কেটলি-বাটি খুব ভালো করে ধুয়েছি।

অম্বুজাক্ষ এক-গাল হেসে হাত বাড়ালেন: দাও, দাও—আর বলতে হবে না, অমৃতে আবার অরুচি! আচ্ছা মা, কি করে টের

পেলে এখানে এক বুড়ো পেটুকদাস আছে, সকালে পেটে কিছু না পড়া পর্যন্ত খালি ছটফট করে বেড়ায়।

ইরাবতী হাসতে লাগল। আর এক বাটিতে দুধ ঢেলে সুহাসিনীকে বলল, আপনি খাবেন না? অজাত-কুজাত নই আমি, সত্যি কথা বলছি।

সুহাসিনী গম্ভীরমুখে বললেন, রোসো, ইষ্টমন্ত্রটা আউড়ে আসি তাড়াতাড়ি। এত সকালে আমি কিছু খাইনে। কিন্তু সেকথা বললে এক্ষুণি তো বাটিসুদ্ধ ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তার কাজ নেই। খাব আমি, একটু দেরি কর—

পালকিতে উঠতে যাবেন, এমন সময় সহদেবকে দেখা গেল। হনহন করে সে রাস্তা দিয়ে চলেছে। অম্বুজাক্ষ ডাকেন, শোন শোন, ওদিকে কোথা যাচ্ছ?

সহদেব উঠানে এসে পায়ের ধূলো নিল।

কোথায় চলেছ এত ব্যস্ত হয়ে?

সহদেব আমতা-আমতা করে বলে, দত্তমশায় আমায় সাতবেড়ে টেনেটুনে নিয়ে এলেন। তাঁর হুকুম হেলা করি কেমন করে? ভোর থাকতে তিনিই আবার রওনা করে দিলেন, বর-বউয়ের পাত্তা নেই—দেখে এসো, বৃষ্টিজলে হয়তো বা রওনাই হতে পারে নি।

বর-বউ? বিয়ে হয়ে গেছে তাহলে?

সহদেব দাঁত মেলে হাসতে হাসতে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, নির্বিঘ্নে শুভকর্ম হয়ে গেল মঙ্গলবারের দিন।

অম্বুজাক্ষ বোমার মতো ফেটে পড়লেন: আমাদের চিঠিতে তারিখ লিখেছে শুক্রবার। ভাঁওতা দিয়েছে! কুকুর-বিড়ালের সামিল ভেবেছে আমাদের, মজা করেছে!

সুহাসিনীর দিকে চেয়ে বললেন, তোমার বাপের বাড়ি যাওয়া হবে না। কক্ষণো না। সমস্ত চুকে-বুকে গেছে। স্টেশনে পালকি ফিরিয়ে নিয়ে যাক।

সহদেব বলে, আজকে ফুলশয্যা। দত্তমশায় তাই ব্যস্ত হয়ে আমায় পাঠালেন।

অম্বুজাক্ষ বললেন, ছেলে আমার বাড়িমুখো কখনো যেন না হয়। ভালো করে সমঝে দিও সহদেব। বাড়ি গেলে জুতো মেরে তাড়াব ওই বউসুদ্ধ—

সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ, ইরাবতী যে! বারান্দায় গিয়েছিল, এই সময়টা এসে পড়ল।—বউ যে ওই? সহদেব জিভ কাটে। কথা ঠিক সমস্ত কানে গিয়েছে। সামলে নেবার ভাবে তবু তাড়াতাড়ি সে বলে, এই যে—এখানে তোমরা? দত্তমশায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ছোটবাবু কোথায়?

ইরা কিন্তু হাসছে। সহদেবকে আমল না দিয়ে অম্বুজাক্ষের দিকে চেয়ে বলল, বউকে জুতো মারবেন কেন বাবা, বউ তো কিছু করে নি। বউয়ের বাবাও কিছু করে নি, আপনারা ভুল জেনে বসে আছেন।

স্তম্ভিত হয়ে আছেন এঁরা, কথা বলার শক্তি নেই। ইরাবতী বলতে লাগল, আমার বাবা ঐতিহাসিক—তথ্য খোঁজা তাঁর কাজ। বংশ ধরে বংশের মানুষদের ধরে ধরে গালি দেবার লোক তিনি নন। যুগচক্রের গালি অন্য লোকের। আমি ধরিয়ে দেব—যা-কিছু করতে হয়, তখন সেই মানুষকে করবেন।

যুগচক্রের নামে সহদেবের জরুরি কথাটা মনে পড়ে যায়। বলে, ইলেকশনে নাম দেবার সময় এসে গেছে কিন্তু। আসছে শনিবারের মধ্যে। সাধন মিত্তিরের লোক আমায় বলল। সাধনবাবু কাগজপত্তোর নিয়ে সদরে চলে গেছেন।

অম্বুজাক্ষ ম্লানকণ্ঠে বললেন, আমি দাঁড়াচ্ছি না—সাধন এমনিই হয়ে যাবে।

ইরা বলে, দাঁড়াবেন না কেন বাবা?

কাশীশ্বরের নাতিকে ও-তল্লাটের কে ভোট দেবে? রামনিধির ফাঁসির মূলে যে কাশীশ্বর।

ইরা জ্বলে উঠল: রামনিধির নাতি হলেন আমার বাবা। তাঁর সবচেয়ে বড় আপন জনকে ও-তল্লাটের কোন লোক ভোট না দেয় দেখে নেব।

সুহাসিনীর কাছে গিয়ে ইরা বলল, মুশড়ে পড়লে হবে না, বুঝিয়ে বলুন। নইলে আমার বাবার নামে দোষ থেকে যাবে। কাশীশ্বর সেকালে কি করেছিলেন, তা নিয়ে ঐতিহাসিকরা মাথা ফাটাফাটি করুন গে। কিন্তু মণিরামপুরের লোক কানা নয় মা—একালে তারা দেখছে, হতকুচ্ছিৎ মেয়েটার দায় উদ্ধার করে আমার মা-বাপের কত বড় দুর্ভাবনা ঘুচালেন আপনারা।

গলা ধরে আসে। সুহাসিনী তাড়া দিয়ে উঠলেন: তুমি হতকুচ্ছিৎ? খবরদার বলছি, আমার বাড়ির বউয়ের মিথ্যে নিন্দে করবে না। রক্ষে রাখব না।

বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। বললেন, ও সমস্ত পরের কথা মা—পরে ভাবা যাবে।

কামরার ভিতর নিয়ে চললেন সুহাসিনী। একটিমাত্র ছেলে, তার এই বউ। দেখবেন মুখখানা তুলে ধরে। শাশুড়ি-বউয়ের নিরালা কথাবার্তা দু-দশটা, সবুর সইছে না।

অম্বুজাক্ষ নতুন একটা চুরুট ধরিয়ে নিলেন। ধোঁয়া ছাড়ছেন পথের দিকে তাকিয়ে। একবার বলে উঠলেন, অরুণটা গিয়েছে তো গিয়েছে! হতভাগা ছেলে কোনও একটা কাজ যদি চটপট সেরে

আসতে পারে। এক কাজ কর সহদেব। বেলা চড়ে যাচ্ছে—দুটো পালকি তো রয়েছে, শাশুড়ি-বউকে পৌঁছে দাও সাতবেড়েয়। শ্বশুর মশাইকে বল গিয়ে অরুণ পালকির জোগাড়ে গেছে—এসে পড়লে আমরা সেই পালকিতে যাব।

সঙ্গে সঙ্গেই অরুণাক্ষকে দেখা গেল। বাপকে দেখে হকচকিয়ে গেছে, সরে পড়বার চেষ্টায় ছিল। অম্বুজাক্ষ ডাকলেন, পেয়েছিস পালকি?

এবেলা ক্ষেতের কাজে যাচ্ছে বেহারারা। ওবেলায় হবে।

অত দেরি চলবে না। চুলোয় যাকগে। পায়ে হেঁটেই যাব সাতবেড়ে। এই তো সহদেব চলে এলো। আড়াই ক্রোশ মোটে এখান থেকে। আমি বুড়োমানুষ যাচ্ছি, আর নবাবনন্দন তোমার পালকি লাগবে? চলে এসো মেয়েদের পালকির পিছু পিছু।

শেষ